প্রথম খণ্ড "বীণাপাণি"র সূচী।

[গদ্য]

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
অবস্থা ও মানুষ	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৯
আমাদের কষ্ট কেন ?	... ...	২১, ৫০
আর্য্য রমণীর সতীত্ব-গৌরব	শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ	১৪
কর্ম্ম-[illegible]	শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়	৬০
কালের প্রতি	শ্রীশ্যামলাল মজুমদার	৮৭, ১০১
"কি ?"	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ	১২০
কি শিখিব ?	... ...	২০১
গৌরচন্দ্রের স্মৃতি	শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়	১১৭
জল-বিহারী নিকোলাস	... ...	২৫০
ঠগী-জীবনী	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার	৮০, ১০৭, ১২৭, ১৫৩, ১৮৫, ২১১
দরিদ্রের নিবেদন	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪১
দুঃখিনী (গল্প)	...	৭৬, ৯৯, ১৩১, ১৬৬, ২৫৬
দুর্গোৎসব—বিজয়া	শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র	২৪৯
ধর্ম্ম ও মনুষ্যজীবন	... ...	৩
ধর্ম্ম কি ?	শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ	১৯৪
নবীন ভাবুক	শ্রীমান্ সহচর শর্ম্মা	১৯, ২৯
পলাশীর রণক্ষেত্রের স্মরণ-চিহ্ন কি আছে ?	... ...	১০৫
পঞ্চ"ম"কার	শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়	১২৭
প্রতিহিংসা (গল্প)	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২১২
বঙ্গেশ্বর	শ্রীহরিলাল বন্দ্যো বি-এল্	১৯২, ২০৮
বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা কেন ?	শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়	২০৭
"বিকাশে"—রসময় (সমালোচনা)	... ...	৯০
বিশ্বনাথ বাবু	শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	২৪১

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
বৈজ্ঞানিক গল্প	শ্রীহেমলাল দত্ত	১, ২৪, ৫[illegible]
ভালবাসা	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২[illegible]
৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়	... ...	১৭[illegible]
মনুষ্য ও বিভিন্ন ধর্ম্ম	... ...	৭[illegible]
মনুষ্যকৃত আশ্চর্য্য রচনা	... ...	১৯৭
মুখবন্ধ	... ...	১
যোধবাই (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু	২২৮
রমণীর [illegible]	শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়	৯৪
[illegible]জপুত রমণী	ঐ ঐ	৬৯
রুচিভেদ	ঐ ঐ	২০৩
লেখক ও পাঠক	দৈনিক সম্পাদক	৪৬
সমালোচনা ও প্রাপ্তি-স্বীকার		৪৪, ৬৮, ৯২, ১১৬, ১৪০, ১৭৬, ২০০, ২৬৪
সংগ্রহ ও সঙ্কলন	... ...	৪০, ৬৪
সংক্ষিপ্ত জীবনী (সক্রেটিস্)	... ...	৩৬
সুখ ও দুঃখ	শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ	১১১
হিন্দুর আতিথ্য	শ্রীহঃ—	৩৩
হিন্দু ও মুসলমান	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু	১৫৯
হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্ব	শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়	২২৫

[পদ্য]

অবসান	শ্রীমতী কিরণশশী বসু	১৩৪
অসাধ ক'রোনা	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫
অস্তগামী তারা	শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৩
আশা	... ...	৫২
ঊষামঙ্গল	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	১১৫
একটী উপায়	শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়	১২৪

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
একটী কবিতা	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৭
কলিকাতার চিত্র	শ্রীউমেশচন্দ্র বৈতালিক	১৩৮
কোথা' দয়াময়!	শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়	৯০
ছিন্ন-তার-বীণা	শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯১
জলধর	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৩
জাগ মা!	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৩৯
জীবন-সঙ্গীত	শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ	৪২
নির্ব্বাসিতের স্বপ্ন	শ্রীশ্যামলাল মজুমদার	৫৮, ৭৩
প্রবাসে প্রথম রাতি	ঐ	২০৭
পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তা	শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ	৮৬
বন্দনা	... ...	৪৫
মনের আগুন	শ্রীভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়	৩২
যমুনার প্রতি	শ্রীবটকৃষ্ণ রায়	১৫৮
লতার বিয়ে	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার	২৫৫
শেষ কথা	শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী	২৬২
শুকনো ফুল	শ্রীহরিগোপাল গুপ্ত	১৪৫
শোক-পত্র [রাজকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র]	... ...	১০৯
সভ্যতা ও সমাজ	শ্রীকুঞ্জলাল কাবাশী	১৩৪
সাধনা	... ...	১৩

[গান]

কি করিলি?	[প্রাপ্ত]	২৯
দেহ-ক্ষেত্র	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	১৯৯
বাঁশরী	শ্রীভূতনাথ মিত্র	২৬২
যমের দরবার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	৬৭

প্রথমবর্ষের লেখকগণের সূচী।

[বর্ণমালানুসারে]

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ঘোষ।
[দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকার সহঃ ও সারস্বতপ্রসূনাঞ্জলি সম্পাদক।]

,, উমেশচন্দ্র বৈতালিক।
[বিবিধ পত্র-পত্রিকার সুযোগ্য লেখক।]

,, কুমারকৃষ্ণ মিত্র।

,, কুশীলাল কাবাসী।

শ্রীমতী কিরণশশী বসু।

শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়।

,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
[সাহিত্য, নব্য-ভারত, জন্মভূমি, পূর্ণিমা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার লেখক।]

,, ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ।
[কলিকাতা, সেন্ট্রাল ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রধান পণ্ডিত।]

,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

,, নিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

,, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

,, বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
[পুরোহিত প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সুযোগ্য লেখক]

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ রায়।

,, বেণোয়ারীলাল গোস্বামী।
[নব-জীবন, সাহিত্য, নব্য-ভারত, অনুসন্ধান প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার লেখক।]

,, ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

,, ভূতনাথ মিত্র।

,, যতীন্দ্রনাথ বসু।
[স্থুলভদৈনিক, বিকাশ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার ও চৈতন্য লাইব্রেরীর পদকপ্রাপ্ত লেখক]

,, শ্যামলাল মজুমদার।
[সুবোধিনী, বিকাশ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার লেখক]

,, শরচ্চন্দ্র সরকার।
[অনুসন্ধান, পুরোহিত প্রভৃতি মাসিকপত্রিকার লেখক]

,, সুরেন্দ্রনাথ সেন।

,, হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্,
[তান্তিয়াভীল, আড়কাটী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।]

,, হেমলাল দত্ত।

,, হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ও সম্পাদক।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } অগ্রহায়ণ, ১৩০০ সাল। { ১ম সংখ্যা।

মুখবন্ধ।

পরম-করুণাময়ী, জগজ্জননী, গণেশ-প্রসূতির পবিত্র নাম উচ্চারণ করতঃ তদ্বিভবরূপা,—অজ্ঞান-তিমির-নাশিনী বীণাপাণির পূত পদচ্ছায়া গ্রহণ করিয়া, অদ্য আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

আজকাল, বঙ্গসাহিত্য-সংসার, বিবিধ প্রকার পত্র-পত্রিকা-রূপ উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাসিত। অনেকেই এই কথায় আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারেন,—'তবে এ ক্ষুদ্র পত্রিকার আবির্ভাবের প্রয়োজন কি?'—আমরা সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিব,—"যদিও বঙ্গসাহিত্য-সংসার পত্র-পত্রিকা-রূপ আলোকমালায় আলোকিত রহিয়াছে,—তত্রচ যেমন,—ক্ষুদ্র বৃহৎ যেরূপই হউক না কেন, আলোকের সংখ্যা যতই অধিক হয়, ততই ঘরের অন্ধকার-তম প্রদেশও আলোকিত হইয়া উঠে;—সেই প্রকার আমাদের "বীণাপাণি" যদ্যপি সেই সাহিত্য-সংসারালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ঔজ্জ্বল্য-বৃদ্ধি করিতে পারে, তবেই—আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

উদ্দেশ্য।

এই বিশাল জগতে উদ্দেশ্যবিহীন কোনও কার্য্যই হইতে পারে না। আমরা যাহাই করি না কেন,—প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে। সর্ব্ব উদ্দেশ্যের স্রষ্টা, পরমপিতা পরমেশ্বরের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীট হইতে বৃহত্তর মাতঙ্গের সৃজন কি উদ্দেশ্যবিহীন? কখনই না। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। আমরাও যে তাহা বুঝাইতে পারিব—এরূপ কদাচ সম্ভবপর বোধ হয় না এবং এই সার্ব্বজনিক নিয়মের, যে আমাদের পক্ষে ব্যতিক্রম ঘটিবে, এমত নহে। আমাদের অবশ্যই কোনও উদ্দেশ্য আছে—সে উদ্দেশ্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নহে—একটী সাধারণ উদ্দেশ্যমাত্র। সেই উদ্দেশ্য—"বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি।"

এই উদ্দেশ্য-সাধন বিষয়ে, কতিপয় বঙ্গ-সাহিত্য-সেবক, কৃতবিদ্য মহোদয় আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইবে, বলিতে পারি না। কিন্তু, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে, যেমন শ্রীরামচন্দ্রের রাবণ-নিধন-হেতু সেতু-নির্ম্মাণ বিষয়ে, কাষ্ঠ-বিড়ালের সামান্য সাহায্যও নিষ্ফল হয় নাই, সেইরূপ আমাদের এই সামান্য চেষ্টাও যে নিতান্ত নিষ্ফলা হইবে, এরূপ বোধ হয় না।

প্রার্থনা।

যাহার জীবন সাধারণের সাহায্যপ্রেক্ষী, সেই আমাদের "বীণাপাণি"র জীবনরক্ষা বিষয়ে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই চেষ্টিত থাকিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এইরূপ সামান্য মূল্যের মাসিকপত্রিকার জীবন, গ্রাহক-সংখ্যার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

যাঁহারা আমাদের এই বিষয়ে উৎসাহ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এই পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখেন। এতদ্ভিন্ন যিনি, যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিব।

ধর্ম্ম ও মনুষ্য-জীবন।

পরমকারুণিক, পরাৎপর, পরমেশ্বরের অচিন্তনীয় মহিমা-প্রভাবে, বিবিধ জন্ম পরিগ্রহের পর, আমরা এই অতি দুর্ল্লভ মানব-জন্ম পাইয়াছি। মানব আছি, কার্য্যফলে আবার ঘৃণিত কৃমি-কীট-জন্ম, পরে আমাদের ভাগ্যে থাকিতে পারে! কে বলিবে, মানব কখন আর নীচ-যোনিতে ভ্রমণ করিবে না?—কর্ম্মফলে মানবকে সকলই হইতে হইবে; সকলই সহিতে হইবে! কিন্তু, তা' বলিয়া কি আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? কপালে যাহা লিখিত আছে, তাহাই ঘটিবে বলিয়া কি আমাদের কোনও কার্য্য করা উচিত নহে? যাহাতে পুনরায় সেই অতিঘৃণিত, অতিজঘন্য, জন্মে আর না ফিরিয়া যাইতে হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা আমাদের স্বতই উচিত।—সেই জঘন্যতম জন্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য,—যে ধর্ম্ম আমাদিগকে পশু হইতে বিভিন্ন করে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে মনুষ্য-পদ-বাচ্য করে—সেই "ধর্ম্ম" পালন করা উচিত।

পরমেশ্বর আমাদিগকে পশুর সমান—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তবে মনুষ্য, পশু নহে কেন? বরং পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! ইহার কারণ কি?—এই বিভিন্নতার একমাত্র কারণ ধর্ম্ম।

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎপশুভির্নরাণাম্।

ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।" *

যদি কোনও মনুষ্য, ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হয়েন, তিনি কদাচ মনুষ্য-পদ-বাচ্য হইবার উপযুক্ত হইতে পারেন না—তিনি নরাকার পশু। ধর্ম্মভীরু জন-গণদ্বারা সমাজের কখনও অনিষ্ট হয়ও না, হইবে না, ইহা নিশ্চিত। সমাজের অনিষ্ট ঘটনার মূল যত অধর্ম্মা—পশু। যত দুষ্ক্রিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহার মধ্যে কদাচ কোন ধার্ম্মিক লোককে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে হে ভ্রাতৃগণ! যাহাতে আমাদিগকে মনুষ্যাকার পশু হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের সবিশেষ চেষ্টান্বিত থাকা অবশ্যকর্ত্তব্য।

পরমেশ্বর আমাদের চক্ষু প্রদান করিয়াছেন, কি কেবল সুন্দরী রমণীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার জন্য? না পার্থিব-পদার্থে-নয়ন বিক্ষেপের জন্য? না, তাহা কখনই নহে—তিনি এই দৃশ্যমান পৃথিবীর নশ্বরত্ব অবলোকন করিয়া, 'তাঁহাতে' মনোনিবেশ করিবার জন্য আমাদিগকে চক্ষুর্দ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদের কর্ণ কি পার্থিব মোহমন্ত্রমুগ্ধ স্বর শ্রবণ-জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? কখনই নহে, তিনি তাহার নামকীর্ত্তন-শব্দ-শ্রবণান্তর 'তাঁহাতে' জীবন অর্পণ করিবার জন্য কর্ণদ্বয় সৃজন করিয়াছেন। হস্তদ্বয়? কেবল কি স্পর্শ সুখ অনুভব করিবার জন্য তাঁহার সৃজন? না, উত্তমোত্তম দ্রব্য সকল বদনে তুলিয়া দিবার জন্য? না, হইতেই পারে না—তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করিবার জন্য, 'তাঁহার' কার্য্য সাধনের জন্য—হস্তদ্বয় সৃষ্ট হইয়াছে। পদদ্বয় কি কেবল পৃথিবী পর্য্যটনের জন্য?—না। 'তাঁহার' সেই পবিত্র পথে অগ্রসর হইবার জন্য। ভ্রান্তমানব! এই সমুদয় বুঝিয়া দেখ! আমরা কি করিতেছি? ইহাই কি আমাদের

* অর্থঃ—আহার, নিদ্রা, ভয়, সন্তান-উৎপাদন শক্তি, এই সমুদয় মনুষ্য ও পশুমধ্যে বিরাজিত আছে। ধর্ম্মই মনুষ্যকে পশু হইতে বিভিন্ন করে। ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুর সমান।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম? এস, আমরা সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পবিত্র-পদে মন-প্রাণ অর্পণ করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করি।

পরপারে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, পারের যেমন কড়ি প্রদান করিতে হয়, সেইরূপ এই ভব সমুদ্র পার হইবার একমাত্র সম্বল "ধর্ম্ম"। এস তাহার আমরা পূর্ব্বাহ্নে সংগ্রহ করিয়া রাখি। নতুবা এইপারে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে হইবে। নির্দ্দয় কাণ্ডারী আমাদের কথায় কর্ণপাতও করিবেন না। এস, দিন ফুরাইয়া যায়। দেরী করা উচিত নহে। পলকে প্রলয় হইতে পারে।

"কাল করো সো আজ করো।
আজ করো সো আব্।
পরলেং পরমে হয়ে গো
বহুরি করেগা কব্?" †

পার্থিব সমুদয় দ্রব্যই এইখানে পড়িয়া থাকিবে; কিছুই তোমার সঙ্গের সাথী হইবে না! ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র সাথী—তাহাকে কদাচ পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশঃ সর্ব্ব মন্যত্তু গচ্ছতি॥" *

ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, করিয়া, 'ইস্‌লাম' প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্ম যুদ্ধে মত্ত হইও না। আত্মার সহিত যুদ্ধ কর, রিপু সমুদয় বশে আন। পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিও না। সব যাইবে কিছুই থাকিবে না। "ধর্ম্ম"—থাকিবে।

তাই পুনরায় বলি,—ধর্ম্মকে কদাচ পরিত্যাগ করিও না, বা বিস্মৃত হইও না।

---

† অর্থঃ—যাহা কল্য করিতে হইবে, তাহা অদ্যই কর। অদ্যকার কার্য্য এক্ষণেই কর। পলকে প্রলয় হইতে পারে। কবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে?

* অর্থঃ—শরীরের সহিত সমুদয়ই নষ্ট হয়। একমাত্র ধর্ম্মই সুহৃদ, সেই মৃত্যুর পর আমাদের অনুগামী হয়।

বৈজ্ঞানিক গল্প।

বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায় কাহারও বিজ্ঞানে আস্থা নাই। অনেকেই বলেন, "আমি কেরাণি হইয়াছি, চিরকাল কেরাণিগিরি করিয়া মরিব, বিজ্ঞান পড়িয়া আমার কি হইবে?" অনর্থক নীরস বিজ্ঞানতত্ত্বে মস্তক বিঘূর্ণিত করিব কেন? এটী তাঁহাদের বিষম ভ্রম! সকল বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা ভাল। একদা বিজ্ঞান আমাকে, অজ্ঞান বাঙ্গালী পাইয়া, কিরূপ দুর্গতি করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শুনিয়া আপনাকে কাঁদিতে হইবে।——

ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিব এবং বড়লোক হইব, এই আশয়ে কলেজ ছাড়িয়া আমি বিলাতে গিয়াছিলাম। পাঁচ ছয়মাস লণ্ডনে থাকিতে থাকিতে আমার বিস্তর সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল। আমিও সাহেবদের সঙ্গে থাকিয়া এক রকম সাহেব হইয়া পড়িলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার সাহেব হইবার ইচ্ছা ছিল। কলিকাতায় একবার সাহেব সাজিয়া কয়েকজন বন্ধুকে এরূপ ভয় দেখাইয়াছিলাম যে, সে কথা মনে পড়িলে হাসি পায়। তাহারা আমাকে সে বেশে চিনিতে পারে নাই। তবু তখন পরচুলের দাড়ি গোঁফ করিয়াছিলাম!! এখন আমার বেশ গোঁফ দাড়ি উঠিয়াছে এবং বাঙ্গালী ধরণে দাড়ি না রাখিয়া 'হুইস্কার' রাখিয়াছি। রংটা কিছু কাল, তা প্রত্যহ যেরূপ 'সোপ' ব্যবহার করি, তাহাতে এরূপ ভরসা আছে যে, দেশে ফিরিয়া যাইলে,—নগেন্দ্রনাথ সরকার বলিয়া কেহ চিনিতে পারিবে না!

পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে, বিস্তর সাহেব ও ভাল ভাল বিবির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে; কিন্তু তন্মধ্যে হার্বি নামক একজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল। হার্বিসাহেব খুব ভাল ইঞ্জিনিয়ার ও বড় ভদ্রলোক; হার্বির রাজসরকারে চাকরি; মাসিক বেতন একশত পাউণ্ড। আমাদের পরস্পরে এরূপ ভাব জন্মিল যে, বাঙ্গালী ও ইংরাজে তদ্রূপ হইতে পারে না; দুই

ইংরাজেই সম্ভবে। এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন সংবাদ আসিল যে, 'হার্বি সাহেবের খুড়ির কাল হইয়াছে;' তিনি নিঃসন্তান হেতু মৃত্যুকালে হার্বির নামে সমস্ত বিষয় উইল করিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, আমার বন্ধুর আনন্দের সীমা থাকিল না। আর চাকরি করিতে হইবে না; টেবিলের উপর পা তুলিয়া চিরকাল বড়মানুষি করিতে পারিবেন; এই আনন্দে বন্ধু উন্মত্ত হইলেন। একেবারে চাকরিতে জবাব দিয়া পরদিনেই হার্বি লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন,—"দেখ নগেন্দ্র! বোধ হয় তোমার পরীক্ষা শেষ না হইলে তুমি আমার বাটী দেখিতে যাইতে পারিবে না। তার এখনও আট মাস বিলম্ব আছে। যাহা হউক, এই সময়ের মধ্যে আমিও একরকম বাড়ীটী সাজাইতে পারিব। কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বল পরীক্ষার শেষে আমার বাটীতে গিয়া দশ পনর দিন থাকিবে ত?" আমি বলিলাম,—"তার আর আপত্তি কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার নিত্য এত পরিশ্রম করা অভ্যাস; এখনত আর কোন কাজই রহিল না; কিরূপে দিন কাটাইবে?" উত্তর—"কেন, কাজের ভাবনা কি? পরের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে না বলিয়া কি আর কর্ম্ম নাই? আমি এখন হইতে নিজের বাটীতে কল-বল প্রস্তুত করিব; যাওত দেখিতে পাইবে। আর ভাই! বসিতে পারি না, শীঘ্রই ট্রেণ ছাড়িবে।"

এই বলিয়া হার্বি সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া গেলেন।

এক মাস, দুই মাস করিয়া ক্রমে জলের মত আট মাস কাটিয়া গেল। পরীক্ষার সময় আসিল, ক্রমে তাহাও শেষ হইল। এই কয় মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে হার্বির পত্র পাইতাম। প্রতি পত্রে তাহার সহিত দেখা করিবার অনুরোধ আসিত; প্রতি প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবার মানস জানাইতাম। শেষ পত্রে হার্বি লিখিল, "সোমবার বৈকালে ৪টার ট্রেণে এখানে আসিবে, আমি গাড়ি লইয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিব। এখানে তোমাকে পনরদিন থাকিতে হইবে, ইহার কম ছাড়িয়া দিব না।"

সোমবার বৈকালে একটী পোর্টমেণ্টো গুছাইয়া গাড়িতে উঠিলাম। হার্বির বাড়ী যাইতে যে ষ্টেশনে নামিতে হয়, তাহা লণ্ডন হইতে প্রায় পনর ক্রোশ দূরে। যথাসময়ে সেই ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। হার্বি সেইখানে অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া বিস্তর আহ্লাদ প্রকাশ করিল। দুইজনে তাহার গাড়িতে চড়িয়া চলিলাম।

কিছুদুর হইতে নিজের বাটী দেখিতে পাইয়া, হাবি বলিল, "ঐ আমার বাড়ী দেখা যাইতেছে, ঐ যে বাগানের চতুর্দ্দিকে বাটীগুলি দেখিতেছ, ও সব আমার বন্ধুদের বাটী। আমার বাড়ী থেকে সকলকার বাড়ীতে টেলিগ্রাফের তার বসাইয়াছি। যেদিন আমার কোন বিশেষ কাজ থাকে না, একজনকে টেলিগ্রাফ করি, "আমার সহিত দাবা খেলিবে ত শীঘ্র আইস"—না হয় ত অপরকে বলি—"সময় থাকে ত চল শিকার করিতে যাই।"

কথা কহিতে কহিতে ফটকের কাছে আসিয়া পৌঁহুছিলাম। হার্বি গাড়ি থামাইল। ফটক বন্দ ছিল, কিন্তু খুলিবার জন্য গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করাতে, হার্বি আমাকে স্থির হইয়া বসিতে বলিল।

ফটক আপনি খুলিয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "বাঃ! ভারি মজা ত! গেট আপনি খুলিয়া যায়?"

হাসিয়া হার্বি বলিল, "কেন? বুঝিতে পারিলে না? গেটের দশ হাত এদিকে রাস্তায় একখানি লোহার পাত আছে, গাড়ি তাহার উপরে আসিতেই সেটা একটু নামিয়া গেল; এই লোহার পাতের আর ফটকের আংটার সঙ্গে মাটির নিচে দিয়া একটী লোহার শিক আছে। লোহার পাত নামিয়া যাওয়াতে ঐ শিক ফটকের আংটাকে ছাড়িয়া দিল; ফটকে স্প্রীং আছে, তাই আপনি খুলিয়া গেল। ভিতরদিকে ঠিক্ এই রকম আর একটা লোহার পাত আছে, তাহার উপর দিয়া যখন গাড়ি যাইবে, ঠিক এইরূপে ফটক আপনি বন্ধ হইবে।"

আমি। "এরূপ কলের ফটক কই আর কোথাও দেখি নাই। ইহাতে তোমার ভারি সুবিধা হইয়াছে।"

হার্বি। "সুবিধা নয়! আমাকে দরওয়ান রাখিতে হয় না।"

গাড়ি-বারাণ্ডার নীচে গাড়ি আসিল। দেখি, একজন সহিস দাঁড়াইয়া আছে; একজন চাকর ভিতরের দরজা খুলিতেছে। আমি কিছু না বলিবার পূর্ব্বেই হার্বি বলিল,—"দেখ, আমি কাহাকেও ডাকি নাই, তথাপি, আমরা আসিয়াছি, ইহারা জানিতে পারিয়াছে। ফটক খুলিবার লোহার পাত দেখিয়াছ, সেই পাতের সঙ্গে দুইটী ইলেক্‌ট্রিক্ তার আছে। আস্তাবলের ও চাকরদের ঘরের ঘণ্টার সহিত ঐ তারের যোগ আছে। লোহার পাতটী নামিয়া যাওয়াতে ঐ তারের দুইটী ঘণ্টা বাজিয়াছে। ঘণ্টার শব্দে ইহারা জানিতে পারিল যে, কেহ বাড়ীতে আসিতেছে।"

আমি। "এটাও বড় মন্দ নয়। কোন ভদ্রলোককে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না।"

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। হার্বির ভগিনী পাশের ঘরে বসিয়াছিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিলেন, হার্বি পরস্পরের পরিচয় দিয়া দিল। মিস্ হার্বিকে দেখিয়া, হার্বির ভগিনী বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার বয়স অনুমান ৫০ বৎসর। তাঁহাতে স্ত্রীজাতির মাধুর্য্য কিছুমাত্র নাই। তাঁহাকে "ইষ্টলিনের" "বর্ণীলিয়াকে" মনে পড়ে। তিনি যথাসাধ্য মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন মহাশয়, আসিতে কোন কষ্ট হয় নাই ত?" এইরূপ আরও দুই একটী কথার পর, তাঁহার কোন গৃহকার্য্য মনে পড়াতে চলিয়া গেলেন।

উঠিবার সিঁড়ীর বামদিকে দেখিলাম, একটা মোটা লোহার শিকের গায়ে কতকগুলি বাঁকান লোহার কাটি আছে; এক একটী কাটিতে এক একখানি ক্রুস লাগান আছে। কলটি দেখিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "হার্বি, ওটা কি হে?"

হার্বি। "কোন্‌টা? ওঃ! ওটী আমার ক্রুসের কল। দাঁড়াও,

তোমাকে বুঝাইয়া দিই। এই যে জমি হইতে এক ফুট উঁচুতে একখানি চৌকি দেখিতেছ, উহার উপর দাঁড়াইতে হয়; উহার উপর উঠিলেই তোমার ভরে আস্তে আস্তে চৌকিখানি নামিতে থাকে; আর নামিবার সময় তাহার মধ্যস্থিত কতকগুলি ঘড়ীর কলের মতন চাকাকে চালাইয়া দেয়, আর এই সকল বাঁকান ব্রুস লাগান সিকগুলি ঘূরিয়া ঘূরিয়া তোমার কোট, পেণ্টুলেন ও জুতা ব্রুস করিতে থাকে। কিন্তু সকল অপেক্ষা উপরের হ্যাট ব্রুসটীই মজার। এটি দেখিতে ঠিক যেন একটী হ্যাট বাক্স দুই ভাগ করা। এখন ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ—"

আমি। "চমৎকার! চমৎকার! একবার ওঠ না দেখি কেমন চলে।"

হার্ব্বি। "তার আর আটক কি?"

এই বলিয়া হার্ব্বি চৌকির উপর উঠিয়া দাঁড়াইল; উঠিবামাত্র ব্রুসগুলি সুন্দররূপে ঘূরিয়া কাপড় ঝাড়িতে লাগিল; কিন্তু উপরকার টুপির ব্রুসটী যেমন তেমনি রহিল। যখন নিচের ব্রুসগুলির কার্য্য অর্দ্ধেক হইল, উপরের ব্রুসটী নামিয়া টুপির চতুর্দ্দিকে বেগে বার দশ পনর ঘূরিয়া তফাৎ হইয়া পড়িল।

হার্ব্বি নামিয়া আসিয়া বলিল, "কেমন মজার কল? উঠে একবার ব্রুস হয়ে এস।"

আমি। "না, না, এখন থাক্। আর এক সময় তখন দেখা যাবে।"

হার্ব্বি। "তবে ভাই! তুমি একটু বস; আহারের উদ্যোগ কতদূর হইল, একবার দেখিয়া আসি।"

হার্ব্বি চলিয়া গেলে, কলটী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ইচ্ছা হইল—একবার উঠিয়া দেখি কি রকম চলে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঘরে কেহই নাই। চৌকির উপর উঠিলাম, ব্রুসগুলি পরিষ্কাররূপে কোট, পেণ্টুলেন ঝাড়িতে লাগিল। আর টুপির ব্রুস! ও বাবা! একি বিপদ! প্রাণ যায় যে!

আমার যে মাথায় টুপি ছিল না, তা মনেই নাই। ফলে এরূপ যন্ত্রণা কখন ভোগ করি নাই। উঃ! টুপির ব্রুস দুটী মুখের

উপর যোড়া লাগিয়া গেল। ভিতরের দুটী আংটাদ্বারা কাণদুটীকে উত্তমরূপে চিম্‌টাইয়া মুখের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। নাকে যে চামড়া রহিল, এরূপ বোধ হইল না। আমি যেন "ছাঁওনা তলায়" বর দাঁড়াইয়া রহিলাম। দুঃখের মধ্যে নাককাণ মলা খাইলাম, কিন্তু কন্যারত্ন লাভ হইল না। মনে করিলাম, নীচু হইয়া পলাই। বাবারে! যেমন নীচু হইব, পশ্চাৎ হইতে কাপড় ঝাড়া ব্রুস দুটী গুঁতা মারিয়া খাড়া করিয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই যন্ত্রণার শেষ হইল। নামিয়া দেখি,—হার্ব্বি এককোণে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে; হার্ব্বির আর হাসি থামে না। আমি কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া, সম্মুখের আর্‌সিতে চেহারা দেখিলাম। প্রথমে হাসিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এখন নিজের চেহারা দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মাথার চুলগুলি পাকাইয়া মন্দিরের চূড়ার মতন হইয়াছে। আর আমার সখের 'হুইস্কারের' একভাগ কলের সাহায্যে গিয়াছে, অপরাংশ নাসিকা রক্ষা করিতে ব্যস্ত।

হার্ব্বি কথঞ্চিৎ হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল, "কি বিপদ! কলটা যে ঠিক আমার মাপের মতন; তা' বুঝি ঠাওর নাই? আবার টুপি রাখিয়া উঠিতে গেলে কেন?"

আমি বলিলাম, "যাক্, বেশ ব্রুস হওয়া গেল, আর ও কথায় কাজ নাই।"

"এখন কাপড় ছাড়িবে এস, আহার প্রস্তুত।" এই বলিয়া হার্ব্বি আমাকে উপরের একটী ঘরে লইয়া গেল।

হার্ব্বি। "যে কয়দিন এখানে থাকিবে, এই ঘরটী তোমার।"

আমি। "বাঃ! ঘরটী ত বেশ বড়!"

হার্ব্বি। "হাঁ, ঘরটী বড় বটে। যদি রাত্রিতে একলা এত বড় ঘরে থাকতে ভয় হয়, আমি না হয় এই ছোট বিছানায় শোব।"

আমি। "না, না, এখন আর আমার বড় ঘরে শুয়ে ভয় হয় না।"

হার্ব্বি। (হাসিয়া) "তবে ভাল। এই ঘরে অনেক রকম কল আছে, তোমাকে দেখাইতেছি। অন্ধকার হয়ে এল, আগে গ্যাসটা

জ্বালা যাক্। আমার বাড়ীতে গ্যাস আপনি জ্বলে, কাহাকেও জ্বালাইতে হয় না। নীচে কতকগুলি ব্যাটারি আছে। ব্যাটারির তার সমস্ত গ্যাসের সঙ্গে যোগ আছে। এই হাড়ের হাতোলটী টিপিলেই ব্যাটারি চলিবে; একটী তার সমস্ত গ্যাসের চাবি খুলিয়া দিবে, আর এইটীতে ইলেক্‌ট্রিসিটি দ্বারা গ্যাস জ্বালিয়া দিবে।"

এই বলিয়া হার্বি হাতোলটী টিপিল। দেখিতে দেখিতে ঘরের গ্যাসগুলি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম।

আমি। "আচ্ছা, অত উঁচুতে একটা গ্যাস কেন?"

হার্বি। "ঐ গ্যাসের উপর যে একটী পিতলের মোটা শিক দেখিতেছ, উহা কেবল পিতলের নয়; অন্য অন্য ধাতুমিশ্রিত ও এরূপভাবে তৈয়ারি যে, অল্প উত্তাপেই বাঁকিয়া যায়; শিকটী বাঁকিয়া,—"

হার্বির কথার শেষ না হইতেই একেবারে ঘরের সমস্ত খড়-খড়ি গুলি বন্ধ হইয়া গেল। জানালার পর্দ্দা আপনি পড়িয়া গেল। আমি যেন ভৌতিক ক্রীড়া দেখিতেছি, অবাক হইয়া হার্বির দিকে চাহিলাম। হার্বি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল,—"ঐ শিকটী উত্তাপে বাঁকিয়া ছাতে ঠেকিয়া থাকে। ছাতে একটী টিপ্‌কল্ আছে, সেইটীকে টিপিয়া ধরে। খড়খড়ি খোলা থাকিলে এক রকম স্প্রীং দ্বারা আট্‌কান থাকে; টিপ্‌কল টিপিলে সেই স্প্রীং আল্‌গা হইয়া যায়; আর অপর স্প্রীং দ্বারা খড়খড়ি বন্ধ হইয়া পড়ে। আবার দেখ, খড়খড়ি বন্ধ হইলেই পর্দ্দার দড়ি আল্‌গা হইয়া আপনি পড়িয়া যায়।"

আমি। "ঐ যে আর একটী হ্যাণ্ডেল রহিয়াছে, ওটীও ঠিক্ গ্যাস জ্বালিবার হ্যাণ্ডেলের মতন। উহাতে আবার **A** লেখা আছে। ওটী কিসের?"

ক্রমশঃ—

সাধনা।

(১)

মানবের মন-সাধ একে একে আ'সে যায়,—
একটী একটী করি'—কেমন সুন্দর!
অতীত-কালের জলে, ক্রমে পুনঃ ডুবে যায়;
তরঙ্গিণী-বক্ষে যথা তরঙ্গ-নিকর।

(২)

আশায় মানব প্রাণ, কি যেন কি ভাবি' মনে—
পার্থিব কার্য্যেতে করে শরীর যাপন।
নিত্য নব-ভাবে কবি, ভাসায় আপন মনে;
প্রকৃতির পদ-সেবা করি' অনুক্ষণ।

(৩)

সাহিত্য-সেবক-জন ধীরে ধীরে চলি' যায়,
উজলিয়া সাহিত্যের মোহন ভাণ্ডার।
যদিও জীবন-তরি কাল-বশে ডুবে যায়;—
এ মর্ত্ত্যে অক্ষয়-কীর্ত্তি থাকে সে সবার।

(৪)

যাঁ'র কৃপা-দৃষ্টি পেয়ে মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্য-জন-গণে,—
শক্তি-বলে অমরত্ব লভে অনুক্ষণ—
সেই দেবী-পদে এস হ'য়ে ভক্তি-আর্দ্রমনে,
যথাশক্তি করি' তাঁর মহিমা কীর্ত্তন।

(৫)

সে দেবী পদের লাগি' সাহিত্য-সেবকচয়,
আশীর্ব্বাদ আশে হের যুড়ি দুটী কর—
আশ্বাসিত করা কি গো! উচিত কি তব নয়?
তোমা বিনা কেবা আছে, দিতে সেই বর।

(৬)

ধরি' তব-প্রভা-দীপ্ত-সত্য-পথে ভক্ত তোর—
চলি'ছে ভাবিয়া সেই পদ কোকনদে,
পূরাও কামনা মাগো! নাশি মায়া ঘোর,
সাধু-জন-পথ মাগো, দেখাও জ্ঞানদে!

আর্য্য-রমণীর সতীত্ব-গৌরব।

পতিই আর্য্য-রমণীগণের একমাত্র আরাধ্য। তাঁহারা পতিব্রতা হইয়া, জীবনযাপন করিতে পারিলে, আপনাদের জন্ম সার্থক মনে করেন। আর বাল্যে পিতামাতার নিকট শাস্ত্র-সম্মত পাতিব্রত্যের উপদেশ ও উদাহরণ-রূপে পৌরাণিক আখ্যান শুনিতে পান বলিয়াই তাঁহারা পাতিব্রত্য-পালনে একান্ত অনুরক্তা হন।

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"

তাঁহারা মনুর এই শাসন-বচন না জানিলেও, কিন্তু ইহার ভাব তাঁহারা বিশিষ্টরূপ অবগত আছেন। তাঁহারা জানেন, পতির সুখে সুখিনী, পতির দুঃখে দুঃখিনী, পতির বিদেশ-গমনে মলিনা ও কৃশা এবং পতির মৃত্যুতে আপনাকে জীবন্মৃতা জ্ঞান করিয়া, যে স্ত্রী পতির উদ্দেশে, আত্মদেহ ও আপনার সমস্ত সুখের বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই স্ত্রীই যথার্থ পতিব্রতা। আরও তাঁহারা জানেন, পাতিব্রত্য-পালন করিতে পারিলে, চরমে সল্লোক-লাভ হইবে।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে,—

"পতিং যা নাভিচরতি মনোবাক্‌কায়সংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকমাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥"

যে স্ত্রী মনোবাক্‌কায়সংযতা হইয়া, আভিচারিক মন্ত্রাদিদ্বারা পতিকে বশীভূত করিতে চেষ্টা না করেন, সেই স্ত্রীকেই, সাধু-ব্যক্তিরা সাধ্বী বলিয়া, অভিহিত করেন; এবং সেই স্ত্রীই স্ব-কর্ম্ম-ফলে দুর্গত ভর্ত্তার উদ্ধার করিয়া,—ভর্ত্তৃসহচারিণী হইয়া,—পরকালে সল্লোকে বাস করিতে পারেন। আর ভারতীয় হিন্দু-রমণীগণ, অনন্তপুণ্য পাতিব্রত্যের বিষয় অবগত হইয়া, তৎসম্বন্ধে স্থিরসংস্কারা হন বলিয়াই, পাতিব্রত্য-পালন করিতে—নিঃস্বার্থভাবে পতিতে আত্মোৎসর্গ করিতে—তাঁহারা দৃঢ়সংকল্পা। তা'ই আর্য্য-প্রসবিনী ভারত-ভূমি, সতী-প্রসবিনী বলিয়া, জগতে বিখ্যাতা। আর সেই সতীপুত্র—ভারত-সন্তানই সতীত্বের মহিমা বুঝিতে সমর্থ!

সতীত্বের সাদৃশ্য জগতে কোথায়? শারদীয় বিমল নভোমণ্ডলে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র, তারকাবলী পরিবেষ্টিত হইয়া, যে সুধাময়ী জ্যোৎস্নায় জগতের জীবগণকে মুগ্ধ করেন, তাহাও সতীত্বের প্রভার নিকট অতি হেয়। বাসন্তী ঊষায় মলয়-সমীর, কুসুম-পরিমলে আমোদিত হইয়া, মৃদুহিল্লোলে জগতের জীব-সংহতির যেরূপ মনোমোহন করিতে না পারে, সতীত্বের গৌরব তদপেক্ষাও জন-মনোমোহনে সমর্থ। তাই সতীত্বরত্নে বিভূষিতা হইয়া, সামান্য-মানবী, মর্ত্ত্যেই স্বর্গীয় সুষমাময়ী দেবী।

সতী মহাশক্তিরূপিণী! সতী, পতিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার অনন্ত-শক্তির সংযমন হয়; তা'ই তাঁহাতে জগতের অনন্ত কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু অসদভিপ্রায়ে, সতীর সমক্ষে, আরাধ্য-পতি-বিরুদ্ধাচরণ বা পতিতে উৎসৃষ্ট তাঁহার আত্মার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলে, সেই মহাশক্তির অনন্ত-শক্তির তেজে সকলকেই তৃণবৎ ভস্ম হইয়া যাইতে হয়। যে সতী, পূতচরিত সাধুর নিকট মাতৃবৎ শান্তিপ্রদা, যে নরপিশাচ, সেই সতীর সতীত্বের বিনাশ-সাধন করিতে চায়,—তিনি দৃষ্টি-সন্তাপক আলোকের বিকীরণ-কারিণী সৌদামিনীর ন্যায় তেজোধারণ করিয়া, তাহার পক্ষে অসহনীয়া হন। ইহার উদাহরণ দর্শাইবার জন্য, যুগান্তর সংঘটিত, সতীর অপহরণ-কারী লঙ্কেশ্বর দশাননের সবংশ নিধনপ্রাপ্তি, বা সতীর মর্য্যাদাহারী হস্তিনাপতি দুর্য্যোধনের সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিব না;

এই যুগের—এই চারিশত বর্ষ পূর্ব্বের আর্য্য-বীরাঙ্গনার সতীত্ব-মহিমার উল্লেখ করিলেই, ভারতীয় আর্য্য-রমণীর সতীত্ব-বলের পরিচয় বিশিষ্ট-রূপেই প্রদর্শিত হইবে।

বীরাঙ্গনার সতীত্ব-বল।

ভারতে আর্য্য-রাজগণের গৌরব-সূর্য্য, যখন যবন-রাহুর করাল-কবলে নিপতিত; মিবারের রাণা প্রতাপসিংহ, যখন উপপ্লুত চন্দ্রমার ন্যায় পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে প্রাপ্ত তেজের বিকীরণে অসমর্থ হইয়া, কাননচারী; অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণ যখন মোগল সম্রাট আক্‌বরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধস্থাপনে উৎসুক; ভারতের চতুঃসীমাতেই যখন মোগলের বিজয়-পতাকা বায়ুভরে প্রকম্পিত—যেন বিপক্ষ-পক্ষের তর্জ্জনে রত; আর্য্যাবর্ত্তের শ্যামলক্ষেত্রে, দাক্ষিণাত্যের প্রশস্ত প্রান্তরে ও আফগানস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে, যখন মোগল-গৌরব উদ্‌ঘোষিত; তখন—সেই আর্য্য-রাজগণের অবনতির ও বিধর্ম্মী মুসলমান মোগল বাদশাহদিগের উন্নতির সময়—ভারতের রমণীরা সতীত্ববলে, ক্ষমতার ও গুণগরিমার একমাত্র আধার—ভারত সম্রাটকেও পরাজিত করিতে সমর্থা ছিলেন।

আকবরশাহ ভারতের একচ্ছত্রী সম্রাট হইলে, প্রতি মাসের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের নবম দিবসে একটী রমণীর বাজার বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নবম দিবসের অনুষ্ঠিত বাজার বলিয়া, ইহার নাম "নওরোজা" হইয়াছিল; কিন্তু সম্রাট আদর করিয়া, ইহাকে "খোষরোজ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আকবরশাহের বিশাল রাজ-পুরীতে, সুন্দর "খোষরোজ" বাজার-বাগুরায়—অনেক কমনীয়া কামিনী-কুরঙ্গিণী আসিয়া পড়িত। "খোষরোজের" সুষমাখ্যাতিরূপ বংশীনাদ শ্রবণে, অনেক রাজপুত-বংশজা কামিনী-কুরঙ্গিণীও আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, যবনমহিষীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন।

সম্রাটের বিশাল পুরীমধ্যে "খোষরোজ"—লাবণ্যময়ী ললনাগণের

রূপ-প্রভায় উদ্দীপ্ত হইলে, কামিনীর কমনীয়কান্তিতে—অশেষকৌশলী শিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্যে—বাজারের শ্রীসৌন্দর্য্য মনোমোহন হইলে, সম্রাট আকবরশাহ ছদ্মবেশে রূপবতীকুলের রূপের হাটে, ভ্রমণ করিতেন এবং চঞ্চলনয়নে কামিনীগণের সৌন্দর্য্যগরিমা ও ব্যবসায়-বৃত্তি দেখিয়া বেড়াইতেন, ও তাঁহাদিগের আপন শ্রেণীর প্রত্যেকটীতে কোন না কোন দ্রব্য-ক্রয় করিতে গিয়া, হাস্যপরিহাস করিতেন।

একবার এই "খোষরোজের" রমণী-হাটে একটী রূপবতী যুবতী আসিয়া, রমণীগণের বাণিজ্য-ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার কমনীয়কান্তিতে, স্থির গম্ভীরভাবে—বাজারের কামিনী-কুল তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, স্বতই মলিনা হইতেছে। যুবতীর অঙ্গ হইতে দৃষ্টি-সন্তাপিকা তাড়িৎপ্রভা স্থিরভাবে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে, বাজার উদ্ভাসিত হইতেছে। যুবতী, ধীরে ধীরে কামিনী-সজ্জিত আপণ-গুলির একটী হইতে অপরটীতে যাইতেছেন, ও ক্রয় বিক্রয়কারিণী রমণীদিগের হাস্যপরিহাসময়ী কথায় শীলতার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় না পাইয়া, আর শীলতার বিপর্য্যয় ঘটিতেছে বলিয়া, প্রকৃত পতিব্রতার একমাত্র আশ্রয় ও অলঙ্কাররূপা লজ্জাও তাঁহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছে দেখিয়া, তত্রগতা কোনও ললনার মুখেই সুতরাং—প্রকৃত সৌন্দর্য্য—দেখিতে পাইলেন না; তাই এ দৃশ্যে, তিনি হৃদয়ে আমোদের সুখানুভব করিতে পারিলেন না; বরং বিরক্তাই হইলেন!

সম্রাট কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ-নয়নে, ঐ শীলতাময়ী যুবতীকে দেখিলেন। সেই লাবণ্যময়ীর অচঞ্চলা সৌদামিনী-সদৃশী কান্তি দেখিয়া, সম্রাট মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। এ দিকে সেই তেজস্বিনী রমণী সেই বাজারের পরিদর্শনে বিরতা হইয়া, নিরামোদে তথা হইতে প্রস্থান করিতেছেন—তদ্দর্শনে সম্রাট স্বীয় অনুষ্ঠিত 'খোষরোজ' বাজাররূপ বাগুরায় উক্ত বীরাঙ্গনা-কুরঙ্গিণীকে আবদ্ধা করিয়া রাখিবার জন্য, সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা দিতে, উদ্যত হইলেন। রমণী, কামান্ধ সম্রাটকে ব্যাধ-বৃত্তির অবলম্বন করিতে দেখিয়া, অত্যন্ত

রোষান্বিতা হইলেন। তখন তাঁহার চক্ষু হইতে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিসন্তাপক আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল,—তখন সেই ক্রুদ্ধা অধীরা রমণী, অঙ্গাবরণ হইতে তীক্ষ্ণধার অসি নিষ্কাশিত করিয়া, সম্রাটের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া, দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন বোধ হইল, যেন মহাশক্তি অসুরের বিনাশের জন্য, শস্ত্রহস্তা হইয়া দণ্ডায়মানা। পরে সেই মহা-শক্তিস্বরূপিণী, সম্রাটকে সুগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"যে পাপ, ক্ষত্রললনার অমর্য্যাদা করিতে—নিষ্কলঙ্ক ক্ষত্র-কুলে কালী দিতে—চায়, এই অস্ত্রই তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধানে সমর্থ।"

সম্রাট সেই বীরাঙ্গনার এই তেজস্বিনী কথা শ্রবণ করিয়া, স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; তাঁহার অন্তরে আর সেই পূর্ব্বের সঙ্কল্প—পূর্ব্বের উদ্যম—স্থান পাইল না। তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। রমণীও নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পাঠক! এই রমণী, ভারতের গৌরব-মেখলার মধ্যমণি। মিবারের যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পদ্মিনী, অনলাশ্রয়ে নিজের সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন, যে বংশের বীরত্ব-কাহিনী আজও ভারতে উদ্ঘোষিত, ইনি সেই রাণাবংশের দুহিতা; এবং রাঠোর-কুল-ধুরন্ধর অসম সাহস পৃথ্বীরাজের বনিতা। ইহাঁর এই সতীত্ব-বলের কথা শুনিয়া, জগতের অনার্য্য রমণীরা, তাঁহার কার্য্য-কলাপ মনে করিয়া, সবিস্ময়ে মোহিতা হইতে পারেন, কিন্তু আর্য্য-রমণীদিগের নিকট, ইহাতে গৌরবের কিছুই নাই; তাঁহারা ইহা কর্ত্তব্যসাধন বলিয়াই মনে করেন! এইরূপ সতীত্ব-বলে বলীয়সী রমণী, এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে বিরাজমানা। সুতরাং হিন্দুরাই হিন্দুরমণীর সতীত্ব নিত্য ও সত্য জানিয়া, সম্মান করিতেন।

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

নবীন ভাবুক।

"নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ,
ভারতের নানাদেশ করি পর্য্যটন,
অবশেষে উপনীত রাজ-পুতানায়,
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়।"

পদ্মিনীর উপাখ্যান।

লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ হইয়া বাবুরাম খুড়ো এক প্রকার মাতব্বর হইয়া উঠিলেন। বাল্যকাল হইতেই বাবুরাম খুড়ো অন্তরে অন্তরে একটী সংকল্প পুষিয়া আসিতেছিলেন। যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বাবুরাম, আর সেটী পুষিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না;—সাধারণ্যে প্রকাশের সংকল্প করিলেন; মধ্যে, মধ্যে, দুই এক স্থানে কতক কতক প্রকাশও করিয়াছিলেন। কিন্তু সংকল্প যদি শীঘ্রই সম্যক্ কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? আমি রাজা হইব, আর রাজা হইলাম,—আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম,—এই করিলেই যদি কার্য্যসিদ্ধি হইত, তবে—এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, কাটাকাটী মারামারি কেন? এত মাথা ঘামান, রাতজাগা, শিক্ষকের গালিগালাজ খাওয়া কেন?—ঘরে ব'সে পায়ের উপর পা দিয়া সংকল্প কর—আর সিদ্ধি!!! যাহা হউক, বাবুরামের সে আশা সিদ্ধির পক্ষে কিছু "বখেড়া" হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তিনি দরিদ্রের সন্তান যদিও নহেন, তত্রাচ তাহাকে দরিদ্র বলিতে হইবে, কারণ তাহার পিতা বড় কৃপণ—তাহার হাতে একটীও পয়সা পড়ে না! সময়ে সময়ে অর্থহেতু, এই সংকল্পের "দুষ্‌মন্"—পিতার মৃত্যু কামনা, বাবুরাম কর্ত্তৃক হইত না, একথা কে বলিল? যাহা হউক, এইরূপ নানাকারণ বশতঃ, বাবুরামের সেই সংকল্প সিদ্ধিপক্ষে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল!!

দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত যাইতে লাগিল, কিছুতেই

তাহার সংকল্প সিদ্ধির সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। উত্তরোত্তর মন উচাটন হইতে লাগিল মাত্র।

লোকের সকল দিন সমান যায় না। দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ অবশ্যম্ভাবি। সুতরাং বাবুরাম খুড়োর জীবন-স্রোত কেন একভাবে প্রবাহিত হইবে? তিনি একদিবস একখানি সংবাদ পত্র পড়িতে পড়িতে দেখিলেন,—রাজ-পুতানায় একটী কর্ম্মখালি আছে। তাহার মন সরোবর আনন্দ বাতাসে তরঙ্গায়িত হইল।—আশা-সম্পূর্ণের সম্পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ ফুলিস্কেপ্ (Foolscap) কাগজে দরখাস্ত লিখিতে বসিলেন। দুইখানা কাগজ নষ্ট করিয়া, তৃতীয় খানাকে ডাকে পাঠাইয়া দিলেন। কাগজ পাঠানর পর হইতে তাহার মন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও চঞ্চল হইতে লাগিল; তাহার কাণে আশা মায়াবিনী মৃদু মৃদু কত কথাই কহিল!!—দুই—তিন দিন কাটিল। চতুর্থদিনে পত্রের (দরখাস্তের) উত্তর আসিল;—"চাকরী হইয়াছে।" "মার দিয়া কেল্লা!" পিতৃসমীপে, চাকরী করিতে যাইব—বলিয়া, বাবুরাম কিছু পাথেয় প্রার্থনা করিলেন। পিতা মহাশয় পুত্র "বয়াটে" হইয়া যাইতেছে, দূরদেশে গেলে, শুধরাইবে—ভাবিয়া তাহাকে উপযুক্ত পাথেয় প্রদান দ্বারা রাজপুতানায় পাঠাইয়া দিলেন।

চারিদিবস রেলওয়ে থাকিয়া, বিবিধ দেশ-বিদেশ দেখিয়া, বাবুরামের মন আনন্দে নাচিতে লাগিল। সঙ্গে কাগজ পেন্সিল ছিল, স্থান বিশেষের উপর লক্ষ্য করিয়া, বিবিধ কবিতা, গান ইত্যাদি রচনা করিতে লাগিলেন। কোনও স্থানের,—দূরস্থ মন্দিরচূড়া—দেখিয়া, কোথাও তালগাছ দেখিয়া, কোথাও চাষা দেখিয়া, কোথাও বক দেখিয়া তাহার কল্পনা, নানা কবিতা ও গানের অবতারণা করিল। আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ, নতুবা তাহার কতক কতক পাঠক মহাশয়-দিগকে উপহার দিতাম।

ক্রমশঃ—

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-রঞ্জিত-পুস্তক হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } পৌষ, ১৩০০ সাল। { ২য় সংখ্যা।

আমাদের কষ্ট কেন?

(পৌরাণিক-কথা)

প্রথম প্রস্তাব।

প্রতিনিয়ত দারুণ দুঃখ-যন্ত্রণার স্রোত আমাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে,—ঘাড় পাতিয়া সহ্য করিতেছি;—মনে করিতেছি, "কি করিব? অদৃষ্ট যাহা করে, তাহাই হইতেছে।" দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের দারুণ হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ, আমাদের কর্ণে নিয়তই প্রবেশ করিতেছে—কিন্তু আমরা হতভাগ্য, তাহাদের কোনও উপকার করিতে পারিতেছি না। আমাদেরই কষ্টের ইয়ত্তা নাই,—আমরা আবার পরের কষ্ট দূর করিব কেমন করিয়া?

এই দুঃখ যন্ত্রণার কি কোনও হেতু নাই? এই প্রশ্নের উত্তর, রাজনীতিজ্ঞ মহা মহা পণ্ডিতগণ,—দেশের অবস্থা অবলোকন-কারী মহাত্মাগণ, সহজেই দিতে পারেন; কিন্তু আমরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিব না বলিয়া, সেই জন্যই, আজ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি:—

যদি বলি,—আমাদের দেশের সকল লোককে ‘অলক্ষ্মীতে’ পাইয়াছে, তাহা হইলে, পাঠক মহাশয় আমাকে হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন। বলিবেন,—বোধ হয় লোকটা “মেয়েলী শ্লোকের” আবৃত্তি করিতেছে। হাস্যই করুন, আর যাহাই বলুন, আমি তবুও বলিব,—আমাদের সত্য সত্যই অলক্ষ্মীতে পাইয়াছে। যদি বলেন,—কিরূপে? আমি ক্রমে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ঃ——

অলক্ষ্মীতে পাইয়াছে—একথা বলিবার পূর্ব্বে, অলক্ষ্মী কে?—এটী জানা আবশ্যক। লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে,—অলক্ষ্মী লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা। সমুদ্র-মন্থনকালে ইনি লক্ষ্মীর অগ্রে উদ্ভূতা হন। তাঁহার রূপলাবণ্য অবলোকনে, সুরাসুর কেহই তাঁহাকে লইতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি তৎকালে কিছুকাল একাকিনী ছিলেন। পরে, দুঃসহ নামক জনৈক মহাতপা ব্রাহ্মণ আসিয়া, তাঁহার পাণি-গ্রহণ করতঃ লইয়া যান। দুঃসহ, পত্নীর সহিত ধর্ম্মোপার্জ্জন মানসে, অলক্ষ্মীকে, দেবালয় প্রভৃতিতে লইয়া যাইতে চাহিলে, তিনি কদাচ তাঁহার অনুগামিনী হইতেন না। ইহাতে দুঃসহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদা মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের সমীপাগত হইয়া, বিবিধ স্তুতি-মিনতির পর জিজ্ঞাসা করিলেন—“প্রভো! আমার সহধর্ম্মিণী কেন আমার সর্ব্বত্র অনুগামিনী হন না?” মার্কণ্ডেয় হাস্য করিয়া কহিলেন,—“মহাশয়! আপনি ইঁহার বিষয় সম্পূর্ণ না জানিয়াই, ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইনি লক্ষ্মীর অগ্রজা, নাম অলক্ষ্মী, ইনি সর্ব্বত্র গমন করেন না—ইহাই ইঁহার স্বভাব। যে স্থানে, বিষ্ণু-ভক্ত বা রুদ্র-ভক্ত ব্যক্তি অবস্থান করেন, যথায় শক্তিনাম উচ্চারিত হয়, বেদগান, জপ, তপ, হোম, যজ্ঞ, পূজাদি পূতকার্য্য সকল সম্পন্ন হয়, এবং যে গৃহে গো, ব্রাহ্মণ ও অতিথির সমাগম, তথায় ইনি কদাচ যাইবেন না। যে গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ, যে গৃহে সতত স্ত্রীপুরুষে কলহ, বিবর্ণা কন্যা, দেব-দ্বিজের নিন্দা, সৎকার্য্যে ঘৃণা, যে গৃহ গো-শূন্য, ভগ্নদশাপন্ন—এবম্প্রকার গৃহ-সমূহে আপনি ও আপনার স্ত্রী নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারিবেন। আরও, যে গৃহে প্রেতাসনে বিকটাকার উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, সন্ন্যাসী, জোনাকীর

সমাগম, শয্যাতে ভোজন, দিবসে, পর্ব্বে ও সন্ধ্যাকালে বিহার, দিবসে শয়ন, গমন করিতে করিতে ভক্ষণ, মলিনবেশ ধারণ, দেহের সংস্কার নাই, অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ না রাখিয়া সমস্তই ভক্ষণ, অধৌত-চরণে শয়ন, সন্ধ্যাকালে শয়ন, নিরন্তর দ্যূত-ক্রীড়া, সেই সকল গৃহে আপনি স্বচ্ছন্দে সস্ত্রীক প্রবেশ করুন। অধিক কি, যে স্থানে সৎকার্য্য মাত্রই অনুষ্ঠিত হয় না, কেবল অসৎকার্য্য, সেই গৃহই আপনাদের আবাস।” এই বলিয়া, মার্কণ্ডেয় অন্তর্হিত হইলেন। এই কথা শ্রবণান্তর দুঃসহ, সেই সর্ব্ব-সন্তাপকারিণী, অধর্ম্ম-সহচরী—অলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করতঃ প্রস্থান করিলেন। অলক্ষ্মীও দুঃখিত মনে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ! এখন বুঝিয়া দেখুন, বাস্তবিকই আমাদিগকে ‘অলক্ষ্মীতে’ আশ্রয় করিয়াছে কি না?

প্রথমতঃ—আজ কালিকার ‘আলোক-প্রাপ্ত’ মহাশয়গণের গৃহে সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার যো টী কি?—তাহাতে বিস্তর অর্থব্যয় হয়—ইহাই তাঁহাদের ধারণা। দ্বিতীয়তঃ—অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিবার অনেক কার্য্য হয় বটে।—অতিথির সমাগম সম্পূর্ণ নিষেধ (Strictly Prohibited.)। ব্রাহ্মণ কে? সেটা চালকলা ও অর্থ লোলুপ ভণ্ড বৈত নয়, তা’কে আবার ভক্তি কি? Damn সকল নিয়ম। স্ত্রী-পুরুষে কোন্দল, সেটা প্রত্যহই সদাসর্ব্বদা হইতেছে; কোনও দিন গহনা, কোনও দিন কাপড়, এই লইয়া যে গোলোযোগ! বাঃ বাঃ! বাড়ীতে কাক, চিল বসিতে পায় না!! কন্যা ত বিবর্ণা হইবেনই। তাহার পাউডার, গালে আল্‌তা, এ সব না হইলে কি চলে? দেবদ্বিজের নিন্দা, এটা কোনও দিন বাদ যায় কি না, সন্দেহ। সৎকার্য্যে ঘৃণা বরাবরই আছে। ওতে অর্থশ্রাদ্ধ ও মূর্খের পেট পোরাণ বৈত নয়? গরু থাকিলে বাড়ী ময়লা হয়। গোবর, চোণার দুর্গন্ধ, ছ্যা! ছ্যা! এমন জানোয়ারকে কি বাড়ীতে স্থান দিতে আছে? দূর, দূর! বাড়ী সারাইয়া কি হইবে? ভাইকে বখরা দিতে হইবে না কি? শয্যাতে ভোজন না করিলে কি আয়েস, না আরাম হয়? বেড়াইতে

বেড়াইতে খাইলে শীঘ্র ত হজম হয়, তাহাতে আবার দোষ কি? পা ধুইয়া শোব? বাঃ! বা! শীতে পা যে ঠাণ্ডা হয়ে বরফ হয়ে যাবে, তা'র হিসেব কে দেবে বলত? সমস্তদিন খেটে খুটে সন্ধ্যা বেলা একটু না গড়ালে কি ভাল লাগে? বাঃ! আমি দিনরাত ব'সে আছি, পাশা খেল্‌ব না? একটুও ত Exercise চাই; নয় দিনরাত খেলেই সে কাজটা কল্লুম, তা'তে আবার কি?

যে গৃহে প্রতিনিয়ত এই গর্হিত কার্য্য সমুদয় অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে অলক্ষ্মীর বাস হইবে না, কষ্ট হইবে না, ত আর কোথায় হইবে? দেবালয়ে? না সদাচারী লোকের গৃহে?

আগামীতে অন্যান্য পুরাণে অলক্ষ্মী সংক্রান্ত যাহা আছে, তাহার কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। এবার এই পর্য্যন্ত।—

বৈজ্ঞানিক গল্প।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

হার্বি। "A মানে এলার্ম। প্রত্যেক ঘরে ঐরূপ এক একটী আছে। ছাদের উপর একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে। নীচে একটী ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারির সহিত ঐ ঘণ্টার যোগ আছে। হ্যাণ্ডেল টিপিলেই ব্যাটারি চলে, আর ঘণ্টা ভয়ানক শব্দ করিয়া বাজিতে থাকে। ঘণ্টার শব্দ শুনিলেই প্রতিবাসীরা জানিতে পারে যে, কোনরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ও ঘণ্টার ব্যবহার হয় নাই। এই ঘরে আর দুইটী কল আছে। ঐ যে কোণে পর্দ্দা ফেলা রহিয়াছে, উহা স্নান করিবার স্থান। উহার ভিতর, মাথার উপর খুব বড় "শাওয়ারবাথ্" আছে, প্রবেশ করিলেই জল পড়িবে, কোনরূপ কল টিপিতে হইবে না। প্রাতঃকালে না হয় ঐ খানে স্নান করিও।"

আমি। "তা' হবে এখন। আমার বোধ হয়, তোমার যাহা কিছু কলবল, এই ঘরেই শেষ করিয়াছ?"

হার্বি। "না ভাই! প্রত্যেক ঘরেই কিছু না কিছু আছে। আচ্ছা একবার দেখে এস দেখি, কলে জল আছে কি না?"

আমি। "আছে, এইমাত্র জল আসিতেছে।"

হার্বি। "এইমাত্র আসে নাই। তুমি দেখিতে যাইবার সময় একটী টিপকল তোমার ডান পা দিয়ে মাড়াইয়াছ, তাহাতেই জল আসিয়াছে; আবার আসিবার সময় আর একটী মাড়াইবে, তাহা হইলেই কল বন্ধ হইবে।"

আমি। "আচ্ছাবুদ্ধি যাহ'ক। ভাবিয়া ভাবিয়া এত কাণ্ড করিয়াছ?"

হার্বি। "আর একটী জিনিস এ ঘরে আছে। বিছানার কাছে এই যে তিনটী টিউব দেখিতেছ, ইহাদ্বারা কথা কহা যায়। যাহাতে ১ লেখা আছে উহা আমার ঘর পর্য্যন্ত গিয়াছে, অপর দুইটীর, একটী আমার ভগিনীর ঘরে ও অপরটী লিডির ঘরের সহিত যোগ আছে। শেষের দুইটী বোধ হয়, তোমার কোন আবশ্যক হইবে না, তবে যদি লিডিকে সকালে চা আন্‌তে বল——"

আমি। "লিডি কে? দাসী নাকি; দেখিতে বেশ সুন্দর ত?"

হার্বি। "কেন দাসী হইলে কি সুন্দর হইতে নাই? কিন্তু এরি মধ্যে তোমার সেদিকে নজর পড়িয়াছে যে? দেখো, যেন কোন তামাসা করিও না, সে তামাসা বুঝে না।"

আমি। "ওকথা বল্লে যে? তুমি কি আমার চরিত্র জান না?"

হার্বি। "তোমার চরিত্র আমি বেশ জানি। তামাসা করিতেছিলাম মাত্র। এখন কাপড় ছাড়, আহার প্রস্তুত। আমিও কাপড় ছাড়িগে।"

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মনে করিলাম,—একবার নল দিয়া কথা কহিয়া দেখি। ১ নম্বর নলে ফুঁ দিলাম, অপরদিক হইতে উত্তর আসিল,—"ব্যাপার কি?" আমি বলিলাম,—"আমার হইয়াছে, তোমার কি বিলম্ব হবে?" উত্তর,—"আমারও হইয়াছে, আইস।"

নীচে একটী বড় ঘরে আমরা তিনজনে আহার করিতে বসিলাম। আহারের পর মিস্ হার্বি উঠিয়া গেলেন।

হার্বি, আমাকে তাহার কল-কৌশল দেখাইতেছে, এমন সময়ে ঘরে একটী ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

হার্বি। 'এ নিশ্চয় ডব সাহেব টেলিগ্রাফ করিতেছে।' দেখি কি বলে।

কট্ কট্ কট্ কট্—ও বলিতেছে কাল বৈকালে উহার বাড়ীতে আহার করিতে হইবে। আমি বলি আমার এক বন্ধু আসিয়াছে। কট্ কট্ কট্ কট্। ওহে তোমাকেও নিয়ে যেতে বলে; কি বল?

আমি। "তা' হানি কি।"

হার্বি। কট্ কট্কট্ কট্—তবে তাই ঠিক হইল।

ঘরে একটী পিয়েনো ছিল, হার্বি সেইটী বাজাইয়া গান গাইতে লাগিল। গান শেষ হইলে, হার্বি বলিল, "এ পিয়েনোটী আপনি বাজে তা জান?"

আমি। "আপনি বাজে কি রকম, দম্ দিতে হয় বুঝি?"

হার্বি। "কিছু না। এই দেখ বাজিতে আরম্ভ হইল।"

বাস্তবিক পিয়েনো বাজিয়া উঠিল, চাবিগুলি উঠিতেছে পড়িতেছে, যেন কেহ বাজাইতেছে, অথচ নিকটে কেহই নাই। শেষে হার্বি ইহার রহস্য ভাঙ্গিয়া দিল। হার্বির বাড়ীর পাশে এক বন্ধু আছে, তাহারও ঠিক এই রকম একটী পিয়েনো আছে। সরু সরু তার দ্বারা একটী চাবির সহিত অপরটীর চাবির যোগ আছে। তারগুলি মাটির নীচে বসান আছে। একটীতে কোন গৎ বাজাইলে অপরটীতেও সেই গৎ বাজিতে থাকে।

বুঝিলাম, এতক্ষণ হার্বি বাজাইতে ছিল, এখন তাহার বন্ধু বাজাইতেছেন।

হার্বি। "দেখ, আমি একটী বড় মজার চোরকল করিয়াছি, যে দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, উহাতে দুইটী পিতলের হ্যাণ্ডেল আছে। উহার সহিত একটী গ্যাল্‌ভানিক ব্যাটারির যোগ আছে। যখন শয়ন করিতে যাই, একটী টিপ্‌কল দিয়া ব্যাটারি চালাইয়া দিই। যদি কোন চোর আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তা' হইলেই তাহার সর্ব্বনাশ। হ্যাণ্ডেল

ধরিবামাত্র, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিবে; হাতের শিরগুলি এত অবশ হইবে যে, হাত তুলিয়া লইবার ক্ষমতা থাকিবে না; হ্যাণ্ডেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। শেষে আমি আসিয়া ব্যাটারি বন্ধ করিয়া দিই এবং তাহাকে ধরি।"

আমি। "মন্দ নয়! কিন্তু যদি তুমি টের না পাও, বোধ হয়, তাহাকে সমস্ত রাত্রি ঐরূপ যন্ত্রণা পাইতে হয়?"

হার্বি। "হ্যাণ্ডেল ধরিলেই আমার ঘরে একটী ঘণ্টা বাজিবে, তা' হইলেই আমি টের পাই।"

রাত্রি অধিক হইল। আমরা শয়ন করিতে গেলাম। হার্বি আমার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া গুড্‌নাইট বলিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"যদি কিছু আবশ্যক হয়, টিউব দিয়া বলিয়া পাঠাইও।"

শয়ন করিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে বোধ হইল, যেন রেলের গাড়ি চড়িয়া কোথায় যাইতেছি। ইঞ্জিনের বাঁশী বাজিতেছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম হার্বি নল দিয়া শিস্ দিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"খবর কি?" উত্তর আসিল "বিশেষ কিছু নয়, কোন অসুখ হয় নাই ত? আর বলিতেছিলাম যে, প্রাতে নয়টার সময় আমরা আহার করিব।" আমি কতকটা রেগে বলিলাম—"এতক্ষণ কোন অসুখ ছিল না, তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়াছ, এই যা' অসুখ; এরূপ আর জাগাইও না।"

"এরূপ আর জাগাইও না"——বলিলাম বটে, কিন্তু ঘুমাইলে ত জাগাইবে; ঘুম আর হয় না; অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিলাম, নিদ্রা আসিল না। ভাবিয়া স্থির করিলাম, হার্বি যেমন আমাকে জব্দ করিয়াছে, আমিও উহাকে জব্দ করি। টিউব ধরিয়া হুইসল্ বাজাইলাম; কতকটা ঘুমন্ত-স্বরে উত্তর আসিল,—"কেন?" আমি বলিলাম,—"আমার আর ঘুম হইতেছে না, হয় তুমি আমার ঘরে আইস, নতুবা আমি তোমার নিকটে যাই, তুমি আসিলেই ভাল হয়। যেমন বলিয়াছিলে, আসিয়া ছোট বিছানায় শোও।"

উত্তর। "আমি! আমি তোমাকে কি বলিয়াছিলাম? পাজি,

নচ্ছার, হতভাগা ! তোর চরিত্র এত খারাপ ! সকালে উঠিয়া হার্বিকে এ বিষয় বলিয়া তোকে উচিত শাস্তি দেওয়াইব।”

ও বাবা ! কি সর্ব্বনাশ ! ভুলে দুয়ের নম্বর টিউব দিয়া হার্বিকে ডাকিতে তাহার ভগিনীকে আসিতে বলিয়াছি ! এখন উপায় ! পুনরায় টিউব দিয়া বলিলাম,—মেমসাহেব, আমার ভুল হইয়াছে, আমি তোমার ভ্রাতাকে ডাকিতে তোমাকে ডাকিয়া ফেলিয়াছি।” কোনও উত্তর নাই। আবার বলিলাম,—“মেমসাহেব শুনিতেছ কি ?” কই, উত্তর নাই। নিশ্চয় ভয়ানক রাগ করিয়াছে, আমার আর কোন কথা শুনিবে না। চেষ্টা বিফল দেখিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। মনে মনে এত ঘৃণা হইল যে, তাহা আর বলিবার নয়। কি লজ্জা! একটা ৫০ বৎসরের বুড়িকে কি না আমার কাছে শুতে ডাকিয়াছি! ইহা অপেক্ষা আমার কেন মৃত্যু হইল না ? আমি যেন মনে জানিলাম যে, ভ্রমক্রমে এরূপ হইয়াছে ! মিস্ হার্বির ত তাহা বিশ্বাস হইল না। সকালে মুখ দেখাই কি ক'রে ! স্থির হইতে পারিলাম না ; হার্বিকে জাগাইয়া এ বিষয় বলিব মনে করিয়া পুনরায় হুইসেল দিলাম। বলিলাম, “দেখ, নামে ভয়ানক ভুল হইয়াছে, দুইজনে একত্রে শয়ন করিব মনে করিয়া তোমাকে ডাকিতে মিস্ হার্বিকে ডাকিয়া বসিয়াছি ; তিনি কি মনে করিলেন ! যাহা হউক, তার আর চারা নাই, এখন তুমি শীঘ্র আমার নিকটে আইস, নতুবা আমি তোমার ঘরে যাইব।”

উত্তর শুনিয়া, আমার চক্ষু স্থির ; আমাতে আর আমি রহিলাম না। এতো হার্বির হেঁড়ে গলা নয়, এ যে জিলের আওয়াজ ! আরে সুন্দরী লিডি চাকরাণীকে ডাকিয়াছি ! সে বলিতেছে,—“আ মরণ তোমার, আমার ঘরে আসিবে কেন ? যমের বাড়ী যাও না।” আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম,—“ছি ! ছি ! রাগ করিও না, আমার কথা আগে শুন।”—আমার কথা চাপা দিয়া বলিতে লাগিল—“কি শুন্‌বো লক্ষ্মী-ছাড়া মিন্‌সে ! এই কাগজ দিয়া নল বন্ধ করিলাম, আর সকল কথা সকালে বলিয়া দিয়া তোমার মুখে খ্যাংরা মারিব।”

ক্রমশঃ—

কি করিলি ?

[কীর্ত্তনের সুর]

হয়ে মত্ত, ভুলে তত্ত্ব, বৃথাকাজে মন কাল হারালি।
পেয়ে মানবজন্ম, তারকব্রহ্ম,শ্রীহরির নাম না স্মরিলি। (চতুর্বর্গ-ফলপ্রদ)
জননী-জঠরে পেয়ে কঠোর যন্ত্রণা, ভবে এসে ভজ্‌বি হরি করেছিলি মন্ত্রণা,
তাহা কি মনে নাই ? মনে নাই (জঠরের কথা—কঠোর ভোগের কথা)
এখন ভবে এসে,রিপুর বশে,কি করিতে কি করিলি ! (হরিপদ না ভজিয়ে)
শৈশবে বৈভব পেয়ে, মাতৃস্তন যুগলে, স্তন-দুগ্ধপান করিতে সদা কুতূহলে,
তখন ডাক নাই (হরি হরি বলে—দীনবন্ধু বলে)—
খেলে ছেলে খেলা, ক'রে হেলা, কাজের খেলা না খেলিলি।
(এই ভবের খেলা খেল্‌তে ব'সে)
বাল্যেতে চঞ্চল অতি সদানন্দ মনে,ক্রীড়াচ্ছলে কাটালি কাল সঙ্গীগণসনে,
তখন চিন্ত নাই (চিন্তামণির চিন্তা) তখন কর নাই কর নাই—
পরে মায়া ফান্দে পড়ি শ্রীহরিকে পাসরিলি (তাঁর পদ না ভজিয়ে)
যৌবনে কুসঙ্গে রঙ্গে, করিলি কালগত, স্বার্থপর হয়ে অর্থ চিন্তি অবিরত,
অর্থ হল কৈ, হল কৈ ? (সেই গুরুদত্ত অর্থ)
কেবল অনর্থক অর্থলোভে সাধুসঙ্গ না করিলি। (রিপু-পরতন্ত্র হয়ে)
বার্দ্ধক্যে বল-বুদ্ধিহীন, জীর্ণদেহ, প্রতি কাজে চিত্তভ্রম সতত সন্দেহ,
কিছু হল না হল না, (মানবজন্ম পেয়ে)
অবশেষে অরে ভ্রান্ত ! স্বখেদে ডুবে মরিলি,
(হরিপদ না ভজিয়ে—অগাধ পাপ সাধিয়ে)

নবীন ভাবুক।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ক্রমে তিনি রাজ-পুতানার রাজধানী “চিতোর” নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এস্থলে বাবুরামের কল্পনা সাগর উথলিয়া উঠিল। কিন্তু কার্য্যের সময় কার্য্যকরা উচিত বিবেচনা করতঃ,তিনি মনিব-সমীপ-

গত হইয়া তাহার আগমন সমাচার জানাইলেন। মনিব বাবু বড় ভাল লোক; তিনি তাহাকে যথাবিহিত স্নেহ-সহকারে তৎসংক্রান্ত সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাবুরাম খুড়োও তথায় রহিয়া গেলেন। বাবুরাম খুড়ো এদিক ওদিক দেখিয়া এক একবার মনে করিতেন,—"এস্থান যত কবির আড্ডা, আমিও কিছু কিছু কবি। আমিও এই-স্থানে থাকিয়া কিছু কেন উন্নতি করি না? নিশ্চয় করিব।"

মনিব বাবুর দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র। বড় কন্যার দুই সন্তান, ছোট কন্যার বয়স ১৫।১৬ এখনও সন্তানাদি হয় নাই। পুত্রটীর বয়স ৩।৪ বৎসরের হইবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবুরাম খুড়ো, কুঠীর বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মনিব মহাশয়ের ছোট মেয়েটী তাহার নয়ন-পথের পথিকা হইলেন। বাবুরাম আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অমনি দৌড়িয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। মনটা নভেল লিখিবেন। প্রথম একটা পদ্যে "মটো" লিখিতে আরম্ভ করিবেন, মনস্থ করিতেছেন, এমন কি দুই এক লাইন লিখিয়াওছেন,—এমন সময়ে—মনিব মহাশয় তাহাকে ডাকিলেন,—দৌড়িয়া গিয়া দেখেন ছোট মেয়ে! বাবুর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা!! বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে বাবুরাম! আজ একটী নিমন্ত্রণ আছে, তুমি কি যাবে?" বাবুরাম একমনে ভাবিতেছেন, কি করিয়া—আমার হস্ত, এই রমণীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবে? মরি কি চাঁচর চিকুর, কিবা মোহনভাব চক্ষে"—ইত্যাদি। মনিবের কথা কর্ণে তাহার গেল না। মনিব বাবু পুনরায় উক্ত কথার আবৃত্তি করিলেন।

বাবুরাম উত্তর দিলেন "বাগানের পাশে।"

বলা বাহুল্য যে, খুড়ো নিম্ন কয়েক চরণ লিখিতে লিখিতে চলিয়া আসিয়াছিলেন,—এবং সেই কথাই তাহার মনে বিশেষরূপে আন্দোলিত হইতেছিল ঃ—

বাগানের পাশে মরি, কিবা সে রূপমাধুরী,
খঞ্জন দেখিয়া পায় ভয়।
দেখিতে২ বালা, চক্ষুপাশে চলি গেলা,
ছড়াইয়া রূপরাশি চয়॥

বাবু, বাবুরামের কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, "কি বল্‌চ?"

বাবুরাম—কিছু পরে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ্ঞে আপনি কি বল্‌চেন?"

বাবু। "নিমন্ত্রণ যাবে?" "আজ্ঞে না।" বলিয়া খুড়ো চলিয়া গেলে, 'বাবু' বলিলেন,—"বাবুরাম পাগল না কি?"

বাবুরাম খুড়ো ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন, হঠাৎ তাহার মাথায় দরজার ভয়ানক আঘাত লাগিল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঘরে আসিলেন। ভাবনার বিরাম নাই। ঘরে আসিয়া দেখেন, তাহার কাগজের উপর এক বিড়াল শুইয়া 'ভোঁস্ ভোঁস্' করিয়া নিদ্রা দিতেছে। দেখিয়া বাবুরাম অবাক্। বিড়াল তাড়ান হয় না—কারণ তাহার Description তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যায়। সে যে কুণ্ডলি করিয়া শুইয়া আছে, তাহা আর থাকে না। বাবুরামের মহাবিপদ। এত করে সংগৃহীত Thoughtটা একেবারে মাটী হইতে দেওয়া তাহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। অগত্যা তিনি অন্য-স্থানে কাগজ কলম আনিতে গমন করিলেন। আসিয়া দেখেন, বিড়াল গাত্রোত্থান করিয়া আলস্য ভাঙ্গিতেছে। পরে, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া, বাবুরাম, কলিকাতাস্থ কোনও বন্ধুকে ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বন্ধুও আমার মতন তাহা ছাপাইয়া বাবুরামকে পাঠাইলেন। বাবুরামের আজ আনন্দের সীমা নাই! তাহার এতদিনের আশা আজ পূর্ণ হইল দেখিয়া তিনি সোৎসাহে এক খণ্ড পুস্তক তাহার মণিব বাবুর হস্তে দিলেন। মণিববাবু তাহার উদ্ভট তালগাছ বর্ণনা! বকের লম্বা ঠোঁটের বর্ণনা, কাকের সুন্দর চেহারা বর্ণনা, অবশেষে আর কন্যা সংক্রান্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে মনে কি ভাবিয়া, পরদিন বাবুরামকে—"তোমার মত মহৎ লোককে এমত সামান্য কার্য্যে রাখিতে পারি না"—বলিয়া তাহাকে কার্য্য হইতে অবসর দিলেন। বাবুরাম তখন মনে মনে গর্ব্বের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"দেখছ নামটা কিরূপ বেরুল? দিলেই বা কাযে জবাব? আমার সঙ্কল্প ত পূর্ণ হইয়াছে।"

মনের আগুন।

মনের আগুন, আহা থাক্ থাক্ ঢাকা,
নিজাগুণে নিজে পুড়ি,—পরের অদেখা।
কায কি দেখায়ে পরে?
সেও যদি পুড়ে মরে?
থাক্, থাক্, ঢাকা থাক, পুড়িব আপনি—
অপরকে পুড়াইতে, কেন ডেকে আনি?

পরের সুখের প্রাণে,
কেন দুঃখ দিব এনে?
থাক্, থাক্, ঢাকা থাক্,—মরি নিজে পুড়ে,
নাহি জানে ব্যথা যেই কেন দিব তারে?

নিবাতে যতই চাই,
কেবল পুড়িয়া যাই,
ঢাকাতেই জ্বলুনিতে, নাহি যায় থাকা,
মনের আগুন! তুমি থাক, থাক, ঢাকা।

এ আগুন—নিবিবে না,
এ হৃদয়—জুড়াবে না,
যতকাল রব, রবে—এ আগুন জ্বালা,
থাকরে আগুন! থাক,—করোনা—উথলা।

জুড়াতে পাব না হেথা,
জুড়াব যাইয়ে সেথা,
অপার করুণা যাঁর—এ মহী-মণ্ডলে,—
জুড়াব প্রাণের জ্বালা—তাঁর পদ-তলে।

শ্রীভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুর আতিথ্য।

চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, তোমারই জন্য রূপের ডালা সাজাইয়া, ধন-ভাণ্ডার খুলিয়া প্রকৃতি দেবী হাসিতেছেন। স্রোতস্বিনীর সুবিমল জল, ঐ দেখ, তোমারই তৃষ্ণা-নিবারণ করিবার জন্য, ঢল ঢল করিতেছে। বনে বনে, উদ্যানে উদ্যানে, ঐ দেখ, তোমারই জন্য, তরুণ-তরুশ্রেণী সুরসাল ফলের ভার লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যে দিকে চাহিবে দেখিবে, তোমারই দুঃখ, ক্লেশের অপনোদনার্থ তোমারই সুখ-সন্তুষ্টি সংসাধনার্থ সর্ব্বদা ব্যস্ত। তোমারই জন্য সূর্য্য উঠে, তোমারই জন্য চন্দ্রদেব কিরণ ঢালে, তোমারই জন্য ঋতু, পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করে, তোমারই জন্য, শস্যৌষধি, তোমারই জন্য দিনরাত্রি, তোমারই জন্য মাস, বৎসর। এক কথায় তোমারই জন্য, সমগ্র সংসারের সৃষ্টি।

সংসার যেমন তোমার জন্য, তুমিও তেমনই আবার অনেকের আশা ভরসার স্থল। তোমাকে যেমন বিন্দুমাত্র অনুগ্রহের আশায় সর্ব্বদাই প্রকৃতির মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়, তেমনই হয় ত কেহ তোমারই বিন্দুমাত্র কৃপার আশা করিয়া, তোমার চরণতলের এক-বিন্দু ছায়ার কামনা করিয়া, তোমার অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিতেছে। সেই শরণাগতকে তোমার দেখা উচিত; না দেখিলে প্রত্যবায় আছে; না দেখিলে প্রকৃতি তোমার উপর রুষ্টা হইবেন।

তুমি, শুদ্ধ তোমার জন্য নহে। সংসার-গণ্ডীর ভিতর আসিয়া, অনুক্ষণ তোমায় সংগ্রাম করিতে হইবে, তোমাকে অবিশ্রাম খাটিতে হইবে। মনুষ্যত্ব দেখাইতে হইবে, অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে; আপনার পোষ্য পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিতে হইবে; তাহার সঙ্গে আর দশটীকেও তোমার সাধ্যমত দেখিতে হইবে। সাধ্যমত আর দশজনের অভাব অভিযোগের দিকে তোমায় দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্বার্থপরতার সঙ্গে সঙ্গে, পরার্থপরতার অনুশীলন পরিচালন করিতে হইবে। না করিলে তুমি "মানুষ" হইতে পারিলে না।

জীবন তোমার কর্ম্মময়। সংসার তোমার কর্ম্মভূমি। কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মপাশ হইতে নিষ্কৃতিলাভই হইল, মনুষ্য-জীবনের মুখ্য লক্ষ্য অথবা শ্রেয়ঃ—মুক্তি—নির্ব্বাণ! ইহাতে পরার্থপরতার দ্বার খুলিয়া যায়। স্বার্থ-সঙ্কুচিত-প্রাণ, উদারতা লাভ করে। মনের ময়লা কাটিয়া আসে। অস্বার্থপরতা, উদারতা, পর-প্রীতি, মানসিক কলঙ্করাহিত্যাদি চিত্তবিশুদ্ধির প্রধান সোপান; চিত্তবিশুদ্ধি আত্মমুক্তির সম্যক্ সহায়।

হিন্দুশাস্ত্রে তাই স্বার্থপরতা এত হেয় বলিয়া গণ্য, পরার্থপরতার তাই অধিক আদর। শম, দম, তিতিক্ষাদি, পরার্থপরতার বৃদ্ধির এবং স্বার্থপরতা বিলাস-বাসনাদির হ্রাস করিবার বিশিষ্ট পন্থা। তাই শাস্ত্রে শম-দমাদি উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া গণ্য। তাই হিন্দুশাস্ত্রে পরার্থপরতার এত বাড়াবাড়ি! তাই হিন্দুশাস্ত্রে আতিথ্যধর্ম্মের এত আদর!

আজন্ম-মরণাবধি হিন্দু-জীবনে তাই এত কঠিন কসন! তাই এত বিধি-নিষেধের বাড়াবাড়ি। তাই শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, মননে, গমনে সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়েই শাস্ত্রোক্ত বিধিপালনের এত কড়া ব্যবস্থা।

গুরুগৃহে অধ্যয়ন-কার্য্য সাঙ্গ হইলেই, গুরুর অনুমত্যনুসারে হিন্দু-শিষ্য দারপরিগ্রহ করিবেন, গৃহস্থ হইবেন, ইহাই শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা। চতুর্ব্বিধ আশ্রম-মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বোত্তম। সর্ব্বোত্তম বলিয়াই বুঝি, গৃহস্থলীর মধ্যে মনুষ্য-জীবনের এতাদৃশী ভীষণ পরীক্ষা! পদে পদে সংযম-সাধনের এত আবশ্যকতা! প্রত্যেক গৃহস্থকেই শাস্ত্র বলিয়া দিতেছেন, 'গৃহস্থ! তোমার নিত্যই অসংখ্য প্রাণীহিংসার সম্ভাবনা!' তাই তিনি, তোমার ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া পঞ্চসূনা যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জাতি বা অজাতি প্রাণিবধ-জনিত মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই পঞ্চসূনা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আর নিত্য যত্নসহকারে তোমায় আতিথ্য ধর্ম্মপালনও করিতে হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রে আতিথ্য ধর্ম্মের বড়ই আদর,—বড়ই প্রাধান্য। হিন্দু-শাস্ত্রমতে, আতিথ্য ধর্ম্মের ফল অনন্ত। প্রতিপদে অতি সাবধানে চলিতে হইবে। প্রলোভনের ছল-কৌশলের সংসারে বড়ই ভয়। বিন্দু পদস্খলনেই পতন। পতনেই সর্ব্বনাশ। তা'ই বিশিষ্ট বিচক্ষণ আর্য্য

ঋষিগণ এত যত্নসহকারে গার্হস্থ্যকর্ত্তব্যাদির নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন! প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানাবধি রাত্রিতে পুনঃ শয্যা-গমন পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্যেরই ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে! ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কার্য্যটীকেও তোমার মানিয়া চলা কর্ত্তব্য।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"ধন্য যশস্য মায়ুষ্যং স্বর্গঞ্চাতিথি পূজনম্।"

অর্থাৎ অতিথি-পূজার বলে, ধন, যশঃ, আয়ু ও স্বর্গলাভ হইতে পারে। আরও বলিয়া দিয়াছেন,—

"শিলানপুঞ্ছতো নিত্যং পঞ্চাগ্নিনপি জুহ্বতঃ।
সর্ব্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোঽনর্থিতোবসন্॥"

ভাবার্থ,—শিল্পবৃত্তি বা উঞ্ছবৃত্তিই করুন, প্রতিদিন পঞ্চাগ্নিযোগে হোমই করুন, গৃহস্থ যতই কেন পুণ্যবান্ হউন না, যদি ব্রাহ্মণ অতিথি তাঁহার গৃহে অনর্থিত বা অনাদৃত হইয়া বাস করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সমস্ত সুকৃতিই সেই ব্রাহ্মণ অতিথি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র-বিধির উপর দৃঢ়বিশ্বাস, এখনকার কালে, আর সাধারণ লোকের বড় একটা দেখা যায় না। তাই এ যুগে অতিথি সেবারও তেমন আদর আর নাই। তখনকার কালে, যাহার যেমন শক্তি, সে তেমন ভাবেই অতিথি সৎকার করিত। এখনকার কালে কেবল স্বকামপোষণ এবং স্বোদরসৎকারেরই বাড়াবাড়ি।

গৃহস্থের গৃহে, আজকাল পূজা পাওয়া দূরে থাকুক, অনেকস্থলে গৃহস্থের হাতে অতিথিকে বিড়ম্বনার একশেষ ভোগ করিতে হয়। সভ্য, ভব্য অনেক বাবুর হাতে পড়িয়া, কোন কোন অসভ্য অতিথি-ভিক্ষুককে শ্রীঘরদর্শন পর্য্যন্তও করিতে হয়।

শাস্ত্রে আস্থাবান্ হইতে হইলে, আবার সেই শাস্ত্রাচরিত পথেই চলিতে হইবে। "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সংসার-পথে চলিতে হইবে। নিজের মনুষ্যত্বটুকুকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটীত্বে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। এবং শনৈঃ

শনৈঃ ভেদবুদ্ধিকে কমাইয়া আনিয়া, সচ্চৈতন্যের শরণাগত দাস হইতে হইবে। ইহাই এখন কর্ত্তব্য। শ্রীহঃ—।

সংক্ষিপ্ত-জীবনী।

সক্রেতিস্।

মানবজাতি, যে সমস্ত গুণগ্রাম-দ্বারা সভ্যতায় উন্নত হইতে সক্ষম হয়েন, তন্মধ্যে বিদ্যা সর্ব্বপ্রধান। পুরাকালাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যা-প্রভাবেই বন্য-পশ্বাদির ন্যায় অসভ্য মনুষ্যগণ, ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়া, পরিশেষে সুসভ্যজাতি-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ইংরাজ-জাতি তাহার উদাহরণ-স্থল। অপিচ প্রাচীনকালে গ্রীস ও অন্যান্য সভ্যদেশে, বিদ্যার সাতিশয় সমাদর ছিল, এবং তাহার অবিশ্রান্ত অনুধাবন, প্রতিষ্ঠা-লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া, সকলেই স্বীকার করিত। অপর, যে সমস্ত মহাত্মারা বিদ্যা-প্রভাব-দ্বারা, গ্রীস ও প্রাচীন অন্যান্য দেশে উজ্জ্বল-যশঃ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহা-দিগের নাম অদ্যাবধি সমস্ত সভ্যজাতি-মধ্যে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। সেই সকল মহানুভব সুধীবরের মধ্যে সক্রেতিস্-নামা গ্রীসদেশীয় এক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তদীয় জীবন-বৃত্তান্ত পাঠকগণ-সমীপে সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত মনে করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

খ্রীষ্টাব্দের ৪৭৬ বৎসর পূর্ব্বে, সক্রেতিস্ এথেন্স-প্রদেশের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সফ্রোনিকস্, ভাস্কর-কার্য্যদ্বারা, জীবন যাপন করিতেন। সক্রেতিস্, বাল্যাবস্থায় পিতৃ-ব্যবসায় শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হন, এবং কিয়ৎকাল-মধ্যে ঐ কর্ম্মে এরূপ পারদর্শিতালাভ করেন, যে তৎকর্তৃক খোদিত একটী মূর্ত্তি শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ বলিয়া, এক্রপলিসের মন্দিরে, বহুকাল পর্য্যন্ত স্থাপিত ছিল। জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে তিনি এই শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যালাভের জন্য, অযত্নবান্

ছিলেন না। তিনি অসাধারণ-ধী-শক্তি-প্রভাবে, অল্পকাল মধ্যে বহুবিধ পুস্তক পাঠ করিতে সক্ষম হন, এবং নানাবিধ শাস্ত্রাভ্যাসদ্বারা ও পণ্ডিতদিগের সাহায্যে, শীঘ্র কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অনাক্সগোরাস্ ও অর্কিলসের শিষ্য ছিলেন, এবং তাহাদিগের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, দর্শনশাস্ত্রে তিনি এরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন যে, তাহাতে তদীয় যশোরাশি শীঘ্রই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

সক্রেতিস্, স্বভাবতঃ সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিলেন; এবং তাঁহার এরূপ শ্রম ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা ছিল, যে অত্যন্ত শীতের সময়েও তিনি যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া অনাবৃত পদদ্বয়ে, তুষার-মণ্ডিত প্রদেশে, অনায়াসে ভ্রমণ করিতেন। ঋতুর পরিবর্ত্তনে তিনি পরিচ্ছদের কিছুই বিভিন্নতা করিতেন না। শীতকালে, তিনি যে সমস্ত পরিধেয় পরিধান করিয়া কালযাপন করিতেন, গ্রীষ্মকালেও তৎসমুদয় ব্যবহার করিতে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশবোধ হইত না। তাঁহার শীত এবং গ্রীষ্মে সমভাব ও শ্রম-সহিষ্ণুতা সন্দর্শন করিয়া, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইত। তিনি জেন্থিশিয়া-নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কামিনীর পাণি-গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার মন্দ-স্বভাব-প্রযুক্ত, তিনি তৎসহবাসে প্রত্যা-শিত-সুখসম্ভোগ করিতে পারগ হন নাই। স্বদেশীয় এথিনীয়দিগের ন্যায় তিনি বল-বীর্য্যে কিছুমাত্র ন্যূন ছিলেন না। তিনি পতিদিয়া-নামক-দুর্গাক্রমণে ও তিলিময় ও আম্পিফলিসের যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁহার পরাক্রম ও যুদ্ধনৈপুণ্যের পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। স্বীয় বাহুবলে ও পরাক্রমে ভীষণ-সমরক্ষেত্র হইতে সুবিখ্যাত আল্-সিবাইদিস্, ও জিনফন নামক তদীয় ছাত্রদ্বয়ের জীবনরক্ষা করেন।

সক্রেতিস্ স্বদেশীয়-দিগের বিদ্যোন্নতির বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত, কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন নাই। তৎকালীন অন্যান্য পণ্ডিতদিগের ন্যায়, তিনি সাধারণ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পণ্যালয় কিংবা কর্ম্মশালায় সমুপস্থিত থাকিয়া, তিনি যুবাব্যক্তিদিগকে বিদ্যাভাসে উত্তেজিত করিতেন, এবং সদুপদেশ প্রদান

করিয়া, তাহাদিগের মনোমধ্যে বিদ্যা-বীজবপন করিতে সতত যত্নবান্ থাকিতেন। পিথাগোরাস ও অপরাপর সুপ্রসিদ্ধ গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত-দিগের মত পরিত্যাগ করিয়া, তিনি স্বকল্পিত স্বতন্ত্র মত অবলম্বন করেন। যদিচ তন্মত-দ্যোতক কোন দর্শন-শাস্ত্র আমরা প্রাপ্ত হই নাই, তত্রাচ তাঁহার শিষ্যদিগের গ্রন্থে তাঁহার মত, যে প্রকার বিন্যস্ত আছে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার মত, যে পূর্ব্বোক্ত দর্শন-শাস্ত্র-কর্ত্তাদিগের মত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রচলিত সাধারণ ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট নহে, জ্ঞান করিয়া, তিনি এক অভিনব ধর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বন করেন, এবং তাহাই সত্য-ধর্ম্ম বলিয়া, সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে, পরম করুণাময় পরমেশ্বর অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান্, এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন। সেই ঈশ্বর, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্রষ্টা, তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় আর কেহ নাই; তিনি তেজোময় পদার্থ; তাঁহার কোন প্রকৃত আকার নাই; তিনি অনাদি ও অনন্ত পুরুষ, এবং সর্ব্বকর্ম্মের আধার। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সক্রেতিস্ স্বদেশীয়দিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ ইহাস্পতেমসের যুদ্ধে স্পার্টাদেশবাসীরা, এথিনীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতঃ এথেন্সরাজ্য বিলুণ্ঠিত করিল, এবং প্রজাপুঞ্জকে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া, সর্ব্বত্র স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য সংস্থাপন করিতে লাগিল। অধিকন্তু, এথিনীয়দিগের চিরপ্রথানুযায়ী সুবিখ্যাত সোলনের রাজ্যশাসন-নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত করতঃ, ত্রিংশৎ ব্যক্তিদ্বারা রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুর্বৃত্ত শাসনকর্ত্তারা, নিরপরাধে প্রজাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়া, এথেন্স নগর প্রায় জনশূন্য করিয়া ফেলিল। পরিশেষে, কতিপয় দেশহিতৈষী এথিনীয় একত্র মিলিত হইয়া ঐ দুরাচার শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশ-পদ-চ্যুত করতঃ সোলনের শাসন-প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করিতে যত্নবান্ হইলেন। তাহারা, সক্রেতিসের অভিনব-ধর্ম্ম-প্রচারে ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁহাকে নির্দ্দয় শাসনকর্ত্তাদিগের পক্ষ বিবেচনা করতঃ, সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে, বিচারালয়ে প্রেরণ করিলেন। সক্রেতিস্ ঐ ভয়ানক

অপবাদ সমূহ, মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য, যে এক বক্তৃতা করেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। যদিচ উহা দুষ্প্রাপ্য, তথাচ তদীয় শিষ্য প্লেতো তাহার অধিকাংশ "সক্রেতিসের ব্যপদেশ" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিচারপতিগণ, পূর্ব্বে তাঁহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু বক্তৃতাকালে তাঁহার স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র মত অবলোকন এবং প্রধান এথিনীয়দিগের বিপক্ষে তদীয় মুখ-বিনির্গত দ্বেষবাক্য শ্রবণে, সকলে কোপান্বিত হইয়া, একমতে তাঁহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন। সক্রেতিস্ ঐ ভয়ানক আজ্ঞা-শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না। মৃত্যুর কিয়দ্দিন পূর্ব্বে, তিনি পর-মাত্মার চিরস্থায়িত্বের বিষয়ে, শিষ্যদিগকে উপদেশ দেন; এবং দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা বিবিধ কারণ দর্শাইয়া সপ্রমাণ করেন। খ্রীষ্টীয় অব্দের ৩৯৯ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি বিচারপতিদিগের আদেশানুসারে, বিষ-ভোজন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর হইয়াছিল।

সক্রেতিস্ ঐ তাবৎকাল জীবিত থাকিয়া, স্বদেশের যে অনেক মহো-পকার সাধন করিয়াছিলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদিচ তাঁহার স্বাধীনতা ও অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার জন্য তিনি দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তথাচ, তাহা যে উৎকৃষ্ট বলিয়া সকলের আদরণীয় হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। প্লেতো ও তদীয় শিষ্য-গণ তাঁহার মৃত্যুর পর, যে সমস্ত দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তৎ-সমুদয় তাঁহার মতের প্রতিভাস্বরূপ। দুই সহস্র তিন শত বৎসর অতীত হইয়াছে, তিনি গ্রীসদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নাম, যে সভ্যদেশ মাত্রেই এখন পর্য্যন্তও সকলের মনে জাগরূক রহিয়াছে, সে কেবল তদীয় অসামান্য বিদ্যা ও মহত্বতার প্রতাপ। তাঁহার শান্তস্বভাব, প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, ও ধর্ম্মাবধারণার জন্য তিনি স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের নিকট অতিশয় আদরণীয় ছিলেন।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

(সহজ শিল্প-শিক্ষা।)

১। কাচ বিষয়ক।

কাচে ছিদ্র করিবার উপায়।

যে কাচে ছিদ্র করিতে হইবে, সেই কাচখানিকে, স্পিরিট অফ টারপেন্‌টাইনে (Spirit of Terpentine) কর্পূর দ্রব করিয়া, সেই দ্রবে, ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে, একটী ভ্রমিযন্ত্র (যাহার দ্বারা কাষ্ঠ ছিদ্র করে) উত্তমরূপে উত্তপ্ত করতঃ, পারদপাত্রে ডুবাইয়া লইতে হইবে। পরে উক্ত ভ্রমিদ্বারা, কাচবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতে কাষ্ঠের ন্যায় শীঘ্র কাচবিদ্ধ হইবে।

ঘসা কাচ প্রস্তুত করিবার উপায়।

Sandarac	(সাণ্ডারাক)	১৮ ভাগ।
Mastie	(মাষ্টি)	৪ ভাগ।
Ether	(ইথার)	২০০ ভাগ।
Benzol	(বেন্‌জোল)	৮০ ভাগ।

এই কয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, কাচের উপর প্রলেপ দিলেই, ঘসা কাচ প্রস্তুত হইয়া থাকে। দ্রব্যগুলি ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। সাবধান! এই কয়েকটী দ্রব্য বিষাক্ত; কদাচ অসাবধানে ব্যবহার করিবেন না।

কাচের উপর কিছু লিখিবার উপায়।

যে কোন কাচ নিৰ্ম্মিত দ্রব্যে লিখিতে হউক না কেন, প্রথমে সেই দ্রব্যকে (Brunswick Black) ব্রন্স উইক ব্লাক নামক পদার্থের প্রলেপ দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিতে হইবে; পরে কোনও কঠিন দ্রব্য দ্বারা উহার উপর অভিমত চিত্র কিম্বা অক্ষর অঙ্কিত করিয়া, হাইড্রোফ্লুয়োরিক আসিড (Hydrofluoric Acid) মধ্যে পাত্রটী শুষ্ক হইলে ডুবাইয়া কিঞ্চিৎক্ষণ রাখিলে ও তাহার পর পাত্রটীকে জলে ধৌত করিলে, উত্তম অঙ্কিত চিত্র কিম্বা অক্ষর দৃষ্ট হইবে। (Brunswick Black) এর পরিবর্ত্তে মম (wax) ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু মম জলে ধুইলে উঠিবে না; তারপিন তৈল দ্বারা উঠাইতে হয়।

২। কাগজ সংক্রান্ত।

নোটের কাগজ প্রস্তুত করিবার উপায়।

কাগজকে প্রথমে জলে ভিজাইয়া, সিক্তাবস্থায় যেরূপ আকারের ইচ্ছা কাটিয়া, একটী কাচপাত্রে (Dilute Sulphuric Acid) জল মিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক রাখিয়া, তাহার মধ্যে ৪।৫ সেকেণ্ড ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে (Weak Amonia) নিস্তেজ এমোনিয়া দ্বারা ধূইয়া লইলে, ইহা ঠিক পার্চমেণ্টের ন্যায় হইবে। ইহাতে দরকারী বিষয় লিখিয়া রাখিলে শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

অদহনীয় কাগজ প্রস্তুত করিবার উপায়।

১ ছটাক পরিষ্কৃত টেলো সাবানের ফেনার সহিত ঐ পরিমাণ ফটকিরি (Alum) মিশ্রিত করিয়া, উক্ত জলে ডুবাইয়া রাখিয়া, কাগজ প্রস্তুত করিলে, ঐ কাগজ অধিক উত্তাপেও দগ্ধ হইবে না। উক্ত কাগজে দলিল, পাট্টা, কবুলিয়াৎ ইত্যাদি প্রস্তুত করা উচিত। পল্লীগ্রামে প্রায়ই অগ্নি লাগিয়া উক্ত সমস্ত দরকারী কাগজ পুড়িয়া গিয়া থাকে। এই উপায়ে কাগজ প্রস্তুত করিলে, উক্ত ভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়।

জলে কাগজ নষ্ট হইবে না।

প্রথমতঃ ৮ তোলা ফটকিরি (Alum) আর ৩॥০ তোলা ক্যাছ-টাইল সাবান, পরিমাণ মত জলে দ্রব করিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর পরিচ্ছন্ন গঁদ (Gum) ২ তোলা এবং ৪ তোলা নীল পৃথক পৃথক রূপে অর্দ্ধসের জলে মিশ্রিত করিতে হইবে। এক্ষণে এই সমস্তগুলি একটী পাত্রে একত্র করিয়া অল্প উষ্ণ করিতে হইবে। উষ্ণাবস্থাতেই উহাতে কাগজ ভিজাইয়া বাতাসে ধীরে ধীরে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে যে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তাহা জলের মধ্যে অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলেও নষ্ট হইবে না।

জীবন-সঙ্গীত।

[১]

বলোনা বলোনা বৎস! শোকার্ত্ত বচন—
অলীক-স্বপন-সম মানব-জীবন;
মর্ত্ত্য-ধর্ম্ম-শীল যারে, ভাবিতেছ বারে বারে,
জানিও নিশ্চয় নাহি তাহার মরণ।
থাকি আলস্যের কোলে, নিদ্রিত যে প্রতি পলে,
জীবিত হ'লেও সেই মৃতের মতন—
অলীক-স্বপন-সম নহে এ জীবন॥

[২]

জীবন সবার নিত্য পরমার্থময়,
শ্মশানে জীবন কভু নষ্ট নাহি হয়;
শরীর মৃত্তিকাময়, মৃত্তিকাতে পা'বে লয়,
আত্মার বিনাশ ভবে হয় না কখন,
অলীক-স্বপন-সম নহে এ জীবন॥

[৩]

সম্ভোগের জন্য ভবে নহে আগমন,—
কিম্বা প্রিয়জন-শোকে করিতে রোদন,
উন্নতির পথে যা'য়, অগ্রসর হ'য়া যায়,
করিতে এমন কার্য্য কর হে যতন;
অলীক-স্বপন-সম নহে এ জীবন॥

[৪]

বহু-জ্ঞান-রত্ন-পূর্ণ এ ভব-ভবন,
কাল-সহ দ্রুতবেগে চলিছে জীবন—
"সোঽহং" শব্দে প্রতি শ্বাসে, জানায় মোদের পাশে,
অগ্রসর হয় ক্রমে যত নরগণ,
শমন-ভবন-মুখ-প্রতি অনুক্ষণ॥

[৫]

বিস্তৃত ধরণী-তল সমর-প্রাঙ্গন,
করি'ছে তোমায় রিপুগণে আক্রমণ,
ধুরন্ধর-জন্তু-প্রায়, চালিত হ'ওনা হায়!
যথার্থ বীরের কর্ম্ম কর অনুক্ষণ;
রিপুবশে আনি'কর উদ্দেশ্য সাধন॥

[৬]

ভবিষ্যৎ সুখ আশে দাও বিসর্জ্জন,
কি বিশ্বাস আছে হ'বে আশার পূরণ?
কাল-স্রোতে দূরে গত, অতীত ঘটনা যত,
এখনি এখনি কর কর্ত্তব্য সাধন;
দয়ালু ঈশ্বরে সদা করহ স্মরণ॥

[৭]

জানায় মহাত্মাগণ-মাহাত্ম্য-বর্ণন—
আমরাও পারি হ'তে তা'দের মতন;
তাঁ'রা কাল-সিন্ধু-তীরে, পুণ্য-কর্ম্ম-ক্ষেত্রোপরে,
রেখেছেন পদ-চিহ্ন মোদের কারণ;
হইব তেমতি করি' তদনুসরণ॥

[৮]

পুণ্যকাল-সিন্ধু-পারে করিতে গমন,
জীব যায় দেহ-তরী করি' আরোহণ;
ভাগ্যদোষে যদি হায়, পোত-মগ্ন হ'য়ে যায়,
হেরি' সেই পদ-চিহ্ন করিবে গমন,—
দ্বিগুণ উৎসাহ করি' হৃদয়ে ধারণ॥

[৯]

তবে হায়! কেন বৃথা করি'ছ রোদন;
যা' আছে অদৃষ্টে তা'ই হ'ক সংঘটন;

এস মোরা কার্য্য করি, পদ-চিহ্ন লক্ষ্য করি',
যাহা রেখেছেন ভবে মহাজনগণ;—
পরিশ্রম, প্রতীক্ষায় শিখি' অনুক্ষণ॥

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

সমালোচনা।

বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত—আমরা গত ১৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার "ষ্টার থিয়েটারে" উক্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। উক্ত নাট্যশালার অধ্যক্ষ, বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সুন্দর ও সতেজ লেখনী হইতে নাটকখানি প্রসূত হইয়াছে। অভিনয় দর্শনে আমরা প্রীত হইয়াছি। রাজা জয়সেন, রাণী দুর্জ্জয়ময়ী (বিমাতা), বিজয়, বসন্ত, দর্শনলাল, প্রভৃতি প্রত্যেকেরই অভিনয় প্রশংসা-যোগ্য। দুর্ব্বুদ্ধির কথাগুলি বেশ হাস্যজনক। বলবন্ত-বেশধারী নট-শিরোমণি বাবু অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের মশান-স্থলের চরিত্র ও পরিশেষে শোণিতাক্তহস্তে, রাজা-রাণীর সম্মুখের অভিনয় অতি সুন্দর, মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বিজয়-বসন্তের কাতর উক্তিগুলি হৃদয়গ্রাহী। এ ক্ষেত্রে শান্তাকে বাদ দিবার যো নাই। শান্তা স্বর্গীয় দয়া, স্নেহ, মমতায় পূর্ণা—সকলের আদর্শ। রাণীর শেষের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর; পাপের জ্বলন্ত পরিণাম! জল্লাদের অভিনয় বেশ সুন্দর। বৃদ্ধবয়সে বিবাহের পরিণাম—অতিরিক্ত স্ত্রীভক্তের আত্মগ্লানি—সত্যের জয়,— প্রভৃতি সাধারণের শিখিবার, দেখিবার অনেক বিষয় বিজয়-বসন্তে আছে। আমরা সাধারণকে একবার "বিজয়-বসন্ত" দেখিতে অনুরোধ করি।

ভারত-বান্ধব—লালবর্ণের ডিমাই একখানি কাগজ। মাসিক পত্র। কানাইলাল দে এণ্ড কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত। সমালোচনার্থে—আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি বিবিধ চুট্‌কি উদ্ধৃত কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং দুই এক খণ্ড না দেখিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } মাঘ, ১৩০০ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

বন্দনা।

(বর্ত্তমান মাসে "বীণাপাণি"র ধরায় আগমন উপলক্ষে।)

জয়, জয়, বেদমাতা! অজ্ঞান-নাশিনী;
অধম-জনের গতি, মাতঃ! বীণাপাণি!
সরস্বতী! তব বলে কি না হ'তে পারে;—
মূর্খ-জন লভে খ্যাতি, পণ্ডিত-মাঝারে।
তোমার প্রসাদে মাগো! চোর রত্নাকর,—
ধরিল 'বাল্মীকি' নাম,—হ'ল কবীশ্বর।
ভারতী! করিয়ে দয়া মূর্খ কালিদাসে,
করিলে কবির গুরু জ্ঞানের বিকাশে।
তোমার প্রসাদে মাগো! মানব—নশ্বর,
ভবে লভে অমরত্ব, হয় গো! অমর!
ধরার অজ্ঞান নাশি', কর জ্ঞান-দান,—
জ্ঞানদাত্রি! তব পদে শতেক প্রণাম,
দয়া করি' দাস-পানে বারেক নেহারি',
জ্ঞান-দান কর মাগো! করুণা বিতরি।

লেখক ও পাঠক।

[উপদেশ]

কেহ কেহ বলেন, "Fit audience though few" শ্রোতার মত শ্রোতা, দুই দশজনও ভাল ; কিন্তু অসামাজিক, অগুণগ্রাহী, অসহৃদয় শ্রোতা, অসংখ্য হইলেও লাভ নাই। অবস্থা বুঝিয়া, ব্যবস্থা করিতে হয়। যিনি হাড়ীপাড়ায় গান জমাইতে চাহেন, তাঁহাকে ঝুমুর, তর্জ্জা গাহিতে হইবে। কিন্তু ঝুমুর তর্জ্জায় ত আর সকল গায়কের প্রবৃত্তি হইবে না ?

সংবাদ-পত্রই বল, সাময়িক-পত্রই বল, আর কেতাব-পত্রই বল, যাহাতে যিনি লিখিবেন, তাঁহারই উচিত একটা মহোদ্দেশ্য, সদাই সম্মুখে রাখা। শুদ্ধ অর্থার্জ্জনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, সাহিত্য-ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। মদের দোকানে, দালালী করিলেও ত পয়সা রোজগার করা যায়।

লোককে শিক্ষা দিব ; যাহা নিজে ভাল বলিয়া বুঝিব, তাহা দশজনকে বুঝাইব ; লোককে কুপথ হইতে সুপথে আনিব ; রাজা প্রজা সকলকে কর্ত্তব্যশিক্ষা দিব ; ধর্ম্মের গুণগান করিব, পাপের নিন্দা করিব ; ধর্ম্মের সুখ দেখাইয়া দিব, অধর্ম্মের দুঃখ বুঝাইয়া দিব ; যেখানে যাহা ভাল পাইব, তাহা পাঠকের কাছে ধরিয়া দিব ; যেখানে যাহা মন্দ দেখিব, তাহার দোষও দশজনকে দেখাইয়া দিব ; যাহাতে সমাজে পবিত্রতার আধিপত্য হয়, অপবিত্রতার অনাদর হয়, লেখনী-সাহায্যে তাহার উপায় করিব ;—এইরূপ এবং অন্যরূপ নানা উদ্দেশ্য, সদাই লেখকের সম্মুখে রাখা কর্ত্তব্য। যিনি এই উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান, তিনি লেখক-কুলের কুলাঙ্গার।

যাহারা, কেবল হাস্য-পরিহাস করিতে চায়, কোনরূপ কাজের কথায় কাণ দিতে চায় না ; মন দিতে চায় না,—তাহারা সমাজের অধম জীব—তাহারা কৃপার পাত্র—ঘৃণার পাত্রও বটে। সংসারে

কেহই কেবল মজা লুটিতে আসে নাই, প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি পতঙ্গেরও নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কার্য্য আছে।

যে মজ্‌লিসে, কেবল খোষগল্পের—কেবল বাচালতার আদর, সমজদার সামাজিকেরা, সে মজ্‌লিসে নিমেষমাত্রও বসিতে পারেন না। যে জলসায় কেবল ঠুংরি, টপ্পা বা খেউড়ের আদর, তাহাতে কোন কালোয়াত তান্‌পূরা ধরেন না। কোন সমজদার শ্রোতাও সেখানে আসন লইতে চাহেন না।

সকল দিক বজায় রাখিয়া চলা মন্দ নহে। শুদ্ধ ধ্রুপদ, খেয়ালে সকল লোকের তৃপ্তি হয় না, জানি। কিন্তু শুদ্ধ টপ্পায় কেবল বেল্লিক-বেলেল্লা লোকে তুষ্ট হইয়া থাকে ; শুদ্ধ চাট্‌নিতে পেট ভরে না,—কেবল সন্দেশ দিয়াও আগাগোড়া লুচি খাওয়া যায় না,—শুদ্ধ মধু চাটিলে মুখ মারিয়া দেয়।

সুরতালের তারতম্য করিতে পার, কিন্তু গানের উদ্দেশ্য ঠিক রাখিতে হইবে। অনবরত পচাল পাড়িলে, কেবল হাড়ী-মুচি আর মাতাল, তেড়েলেরই আনন্দবিধান করিতে পারিবে।

লোক শিক্ষাই হইতেছে, লেখার উদ্দেশ্য। এই জন্যই মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন,——

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি।"

একটা শব্দের সুপ্রয়োগ হইলে, ঐহিক, পারত্রিক দ্বিবিধ মঙ্গলের সাধন হয়। যাহাতে পারত্রিক মঙ্গলের সাধন হয়, তাহা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আর প্রকৃত পার্থিব সুখও কলুষময় কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না ;—মলভাণ্ডে কখনই মৌচাক হয় না।

যে ব্যক্তি মনে করে, কেবল সঙ দিয়া যাত্রা জমাইব, তাহার যাত্রা কোনকালে জমে না। যে লেখক, কেবল লোককে হাসাইবার চেষ্টা করেন, তাঁহার লেখায় সমজদার লোককে কাঁদিতে হয়। যদি নির্ব্বোধকে হাসানই লেখকের উদ্দেশ্য হয়, তবে দোয়াতের কালী, কলমে না দিয়া, যত কালী মুখে মাখিলেই ত সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে ?

উপদেশের সঙ্গে, সঙ্গে, আনন্দের উদ্রেক করিতে পার, মন্দ নহে। যেরূপে উপদেশ দিলে, লোকের হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করে, সেরূপ ব্যবস্থা করায় দোষ নাই, বরং গুণই আছে; কিন্তু মনে থাকে যেন, উপদেশ দেওয়া প্রধান উদ্দেশ্য,—আনন্দোৎপাদন গৌরবমাত্র।

পদে পদে রসিকতা করিতে গেলে, ভাঁড়ামী হইয়া পড়ে। রগড়াইলে, কচলাইলে, গোলাপের সুগন্ধ উড়িয়া যায়। উলঙ্গ করিয়া দিলে, সুন্দরীকেও কুৎসিতা বলিয়া মনে হয়। খুলিভরা রসের আদর নাই, রসগোল্লার ভিতরে যে রস থাকে, তাহাই লোকে আদর করিয়া খায়;—তালশাঁসের রস বাহিরে আসিলেই তাড়ী হয়।

কেবল ভাষার করতপ করিতে গেলে, ভাবের অভাব হয়। আবার কেবল ভাবের প্রস্রবণ খুলিয়া বসিয়া থাকিলেও, কাজ চলিবে না; ভাবকে ত ভাষায় চড়িয়া, তবে বাহিরে আসিতে হইবে? কেবল রসে সন্দেশ হয় না; কেবল ছানাতেও সন্দেশ হয় না।

ছানা, রস, দুই চাই; কিন্তু পাকেই বাহাদুরী। যে রস, যে ছানায়, বহুবাজারের ভীমনাগ, অমৃতফল প্রস্তুত করিত, আনাড়ী ময়রা তাহাতেই একটা ঘোর অখাদ্য প্রস্তুত করিয়া ফেলিবে। সন্দেশ আঁকিয়া গেলেই অখাদ্য হয়।

কেবল সুরতানে গান হয় না, গানের ভাষা চাই। রচনার প্রাণ বটে—ভাব, কিন্তু দেহ না থাকিলে প্রাণ রাখা হইবে কোথায়? রচনায় ভাষা চাই, ভাবও চাই; শুদ্ধ ভাষায় দেহ হইতে পারে, কিন্তু ভাব না থাকিলে, সে দেহ নির্জ্জীব হইবে। শবের কোথায় আদর হইয়া থাকে, বল।

যাঁহার যেদিকে অভিরুচি, সখের লেখায় তিনি সেইদিকেই যাইতে পারেন। কিন্তু সেরূপ লেখায় ত সকল পাঠক তুষ্ট হইবেন না। পত্র, পত্রিকার স্বতন্ত্র পথ, সকল লোকেরই পাঠ্য। যিনি যত অধিক লোককে শিক্ষা দিতে পারিবেন, তিনি স্বকর্ত্তব্যের ততই সাধন করিতে পারিবেন।

কিন্তু সাবধান! যেন সুশিক্ষা দিতে গিয়া, কুশিক্ষা দেওয়া না হয়।

কুশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা, কোনরূপ শিক্ষা না দেওয়া ভাল। শিক্ষা না পাইলে, লোকে না হয় উন্নতিই করিতে পারে না, কিন্তু কুশিক্ষায় অবনতি নিশ্চিত। অবনতি অপেক্ষা অনুন্নতি প্রার্থনীয়।

সকল বিষয়েই উপদেশ দেওয়া উচিত; পত্র-সম্পাদকের বিশেষতঃ। কোন ফলটাই জগন্নাথকে দিলে চলিবে না। যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, তখন সে বিষয়ে আলোচনা অবশ্যই করিতে হইবে। তোমার পাঠক যাহার আশা করেন, তাহা তোমাকে দিতেই হইবে।

সাধুতাই সুনীতি। সকল কথাই খুলিয়া বলা উচিত। ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, ভাবপ্রকাশের জন্য; ভাবগোপনের জন্য ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' বলিয়া,—ধর্ম্মরাজকেও নরক দেখিতে হইয়াছিল। গোঁজামিলনে বড়ই বিড়ম্বনা; না বুঝিয়া কোন কথা লেখা উচিত নহে; কিন্তু লিখিতে হইবে সকল কথা। অতএব পরকে শিক্ষা দিতে গেলে, নিজেও শিক্ষা লইতে হইবে। যিনি নিজের শিক্ষায় উদাসীন, তিনি পরকে শিক্ষা দিতে অধিকারী নহেন।

বলিয়াছি, যেখানে যাহা ভাল পাইবে, তাহাই পাঠকের কাছে ধরিয়া দিবে। ভাল জিনিস চাহিয়া লইতে দোষ নাই। সকল কথাই যে নিজে লিখিতে হইবে, এমন কোন শাস্ত্রাদেশ নাই। যিনি কেবল নূতন কথা লিখিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাকে, পদে পদে কাঁটালের আমসত্ব বানাইতে হয়। সর্ব্বদা নূতন সৃষ্টি করিতে গেলে, সৃষ্টিছাড়া ফল-প্রসব করিতে হয়।

গুরুকে, যেরূপ শিষ্য প্রস্তুত করিতে হয়, লেখককেও সেইরূপ পাঠক প্রস্তুত করিতে হয়। যে গুরু, শিষ্যের মন যোগাইবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরু-পদ-বাচ্য নহেন। যে লেখক, কেবল পাঠক তুষিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি লেখক-পদবাচ্য নহেন। যাঁহার লেখায় লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি না হয়, তাঁহার লেখনী ধারণ বিড়ম্বনা। লোক-শিক্ষাই যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার লেখক হইতে নাই। যাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ নহে; তাঁহার কাজটাও জঘন্য।

দৈঃ সঃ।

আমাদের কষ্ট কেন ?

পৌরাণিক-কথা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পূর্ব্ববারে "আমাদের কষ্ট কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর অতি সামান্য রকমই দেওয়া হইয়াছে। এবারে আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকথিত ঘটনার পর, অলক্ষ্মীদেবী পৃথিবীতে বসতি-স্থান স্থির করিতে না পারিয়া, স্বামী দুঃসহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা দুঃসহের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! আপনি আমার স্বামী ও দেবতা; আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তবে আমি কোথায় থাকিব?—কে আমার পূজা করিবে? এই কথা বলিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দুঃসহ কহিলেন,— "শুন!—স্ত্রীলোকই প্রায় তোমায় পূজা করিতে পারে; যে পূজা করিবে, তাহাকেই তুমি আশ্রয় করিয়া থাক। আর আমি তোমায় অধিক বলিতে পারি না, তোমার নিকটে থাকিতে আমার কষ্ট-বোধ হইতেছে।"—এই বলিয়া, দুঃসহ পাতালে প্রবেশ করিলেন। অলক্ষ্মী, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, দুঃখিতমনে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, ও ভাবিতে লাগিলেন,—কোথায় থাকি? একদা লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে, নারায়ণকে দেখিতে পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! আমার স্বামী আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন; বলুন—এখন আমি কোথায় যাই?" নারায়ণ কহিলেন,—(পদ্মপুরাণ) "যে গৃহে, নিত্য কলহ, শবমুণ্ড, অস্থি, কেশ, চিতাভস্ম প্রভৃতি আছে, কিম্বা যে গৃহস্বামী, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা কথা ব্যবহার করে, চরণ ধৌত না করিয়া শয়ন করে, অথবা তৃণ, অঙ্গার, বালুকা অস্থি, প্রস্তরদ্বারা দন্তধাবন করে, কিম্বা যে ব্যক্তি, রাত্রিকালে তিলপিষ্ট, (তিলকুটো) গাঁজা, শ্রীফল, লাউ, ছাতিম ভক্ষণ করে, তুমি সেই গৃহে গিয়া বাস কর।"

পাঠক মহাশয়গণ! বার বার আমাদের মধ্যে প্রচলিত কার্য্য

সমূহের সহিত, অলক্ষ্মীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। আপনারা বুঝিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এখন বোধ হয়, পাঠক মহাশয়গণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, বুঝিতে পারিয়াছেন,—"আমাদের কষ্ট কেন?"

বহুক্ষণ ধরিয়া—"অলক্ষ্মীতে পাইয়াছে" "অলক্ষ্মীতে পাইয়াছে"— বলিয়া "মেয়েলী শ্লোকের" আবৃত্তি করিতেছি;—আর না। এখন সেই সর্ব্ব-সন্তাপকারিণী, আমাদের অশেষ-কষ্ট-দায়িনী, অলক্ষ্মীদেবীর দূরীকরণ সম্বন্ধে, কতিপয় কথা বলিয়াই, এই প্রস্তাবের শেষ করিব।

বিবিধ গ্রন্থ-মতে, অলক্ষ্মীর দূরীকরণ-প্রথাও বিভিন্ন। এস্থলে দুই একটী বলিলেই বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে।—

স্মৃতিগ্রন্থকর্ত্তা আচার্য্য চূড়ামণি, অলক্ষ্মী-পূজার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন,——

"কার্ত্তিক মাসের, অমাবস্যার রাত্রে, গোবরের পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া, বামহস্তে নির্ম্মাল্য পুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পদ্বারা অলক্ষ্মীর পূজা করিবে। তাহার মূর্ত্তি, কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বিভুজ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান লৌহের অলঙ্কারে ভূষিত, কাঁকরের চন্দন সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত, হস্তে ঝাঁটা, গর্দ্দভে আরূঢ়া। ইহাকে পূজা করিয়া স্তব করিবে,—"হে দেবি! আমার এই পূজা শ্রবণ করিয়া, এইস্থান হইতে প্রস্থান করতঃ আমার শত্রুর গৃহে গিয়া, অবস্থান কর। যদি আমার উপর প্রসন্না হইয়া থাক, তবে তোমার নিকট এই প্রার্থনা যে, আমার পুত্র কলত্র মিত্রাদির কাহাকেও আশ্রয় করিও না।"—পরে সেই মূর্ত্তিকে স্থূর্প অর্থাৎ কুলার বাদ্যের সহিত ভদ্রাসনের সীমান্তে বিসর্জ্জন দিবে।

ব্রহ্ম-পুরাণে কথিত আছে,—"নিশীথে অর্থাৎ অর্দ্ধ-রাত্রিতে অলক্ষ্মী-পূজা করিয়া অমন্ত্র বিসর্জ্জন করিতে হয়।"

ভবিষ্যৎ পুরাণে কথিত আছে,—"অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে, নিদ্রা-নিমীলিতলোচনে স্থূর্প ও ডিণ্ডিম্ অর্থাৎ ঢোল বাদ্য করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে অলক্ষ্মীকে গৃহের বাহির করিবে।"

হইতে পারে, পূর্ব্বোক্ত কথা সমুদয় "মেয়েলী শ্লোক"—হইতে

পারে, এ সমুদয় ভণ্ডামী;—কিন্তু আমাদের এটাও বিশ্বাস করা উচিত যে, ঋষিগণ, আমাদের অপেক্ষা নিতান্ত বোকাও ছিলেন না—তাহাদের প্রণীত পুরাণও নিতান্ত অমূলক নহে। যদ্যপি হিন্দুশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস থাকে, তবে হিন্দুমাত্রেরই উক্ত সমুদয় দোষবর্জ্জিত হওয়া উচিত। অজ্ঞানিতভাবে কোনও দোষ স্পর্শিতে পারে,—এই স্থির করিয়া অলক্ষ্মীকে দূরকরণার্থ, অলক্ষ্মীর পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আশা।

[১]

কে গো তুমি? কাণে কাণে কত কথা কও,—
ভুলাইয়া বিঘ্নবাধা,
যাহে সদা লাগে ধাঁ ধাঁ,
সুফলে অন্বিতধরা আমারে দেখাও;
কে তুমি? বলনা, কেন চুপ করে রও?

[২]

নিরাশ, হতাশ যা'র হৃদে সমুদিত,
তোমার কি এই কাজ?
মনে নাহি পায় লাজ?
হাসাও সে জনে—সেই চিরদুঃখান্বিত,
ভাবি-সুখচ্ছবি চক্ষে ধরিয়া সতত।

[৩]

বিশ্বাস টুটেছে যার ভবিষ্যৎ সুখে,—
ভাবে সদা মনে মনে,
থাকে সদা ক্ষুণ্ণ-মনে,
তাহারে কেমনে তুমি বলনা হাসাও?
ভাবি-সুখ-পথ তুমি কেমনে দেখাও?

[৪]

উত্তাল তরঙ্গময় সাগর মাঝারে—
অথবা অরণ্য-মাঝে,
যথা ঘোর দুঃখ রাজে,
বল, সে বিপন্ন-জনে কি তুমি দেখাও?
যাহে তা'রা আনন্দেতে চলিছে উধাও।

[৫]

বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি আশা মায়াবিনী;
প্রথমে দেখায়ে আশা,
দেখাও পরে নিরাশা,
মিছা আশা নাহি! চাহি, যথা ইচ্ছা যাও;
কেন মিছে মানবেরে হাসায়ে কাঁদাও?
উপসংহার,—ভবিষ্যৎ আশার আসে দেও বিসর্জ্জন,
বিশ্বাস কি আছে তাহে, না হ'লে পূরণ।

বৈজ্ঞানিক গল্প।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

চিৎপাত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সেই শীতকালে, কুল্ কুল্ করিয়া ঘাম হইতে লাগিল। একে ঘোর অন্ধকার, আবার সমস্ত খড়্‌খড়ি বন্ধ, যেন নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মারা যাই, আর কি! থাকিতে পারিলাম না; খড়্‌খড়ি খুলিব মনে করিয়া উঠিলাম। অন্ধকারে দেয়াল ধরিয়া আস্তে আস্তে যাইতে লাগিলাম; পর্দ্দায় হাত ঠেকিল। মনে করিলাম, এইখানে জানালা আছে; উঁ হুঁ এ যে ছোট বিছানার মশারি। আবার হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইলাম, দুই তিনবার চৌকিতে পা লাগিয়া "পপাত ধরণী-তলে" হইবার উপক্রম হইল। একটা কিসের শব্দ হইল, ঠাওরাইয়া মনে করিলাম, অন্ধকারে টিপ্‌কলে পা পড়াতে কলে জলের শব্দ হইতেছে। এইবার জানালা পাইয়াছি। পর্দ্দা সরাইয়া যেমন জানালা

খুলিতে যাইব, "বাবারে! এ-এ-মাগো-ও-হি-ই-ই-ই-গেছি-ই-ই-ই" লাফাইয়া যেমন পলাইব, একখানি চৌকিতে পা লাগিয়া পড়িয়া গেলাম। এই শীতকালে রাত্রিতে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডাজল শ্রাবণের ধারার ন্যায় মস্তকে বর্ষণ হইয়াছে। জানালা মনে করিয়া, শাওয়ার বাথের ভিতর ঢুকিয়াছিলাম। কাঁপিতে, কাঁপিতে, পোর্টমেণ্ট খুঁজিয়া আর একটী ইজের পড়িলাম। লেপ মুড়িদিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম।

বিছানায় শুইলাম বটে, কিন্তু অন্ধকারে প্রাণ যেন আই-ঢাই করিতে লাগিল। ঠিক্ যেন যম-যন্ত্রণা হইল। হঠাৎ মনে হইল, আমি কি বোকা, অন্ধকারে এত কষ্ট পাইবার আগে যদি গ্যাস জ্বালিতাম? আর গ্যাস জ্বালিতে কষ্ট নাই, হাতোলটা টিপিলেইত হইবে?

পুনরায় উঠিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া হাতোলটী টিপিলাম। কই গ্যাস জ্বলিল না? ও আবার কি? এত রাত্রে ঘণ্টা বাজে কেন? ঐ যা, গ্যাস জ্বালিতে এলার্ম ঘণ্টা বাজাইয়া দিয়াছি! সর্ব্বনাশ করিয়াছি! ছাদের উপর ভয়ানক শব্দ করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে; এখনি পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিবে! কি করি, শব্দ থামাইবার উপায় জানি না, দৌড়িয়া হার্বির ঘরে যাই; এ ভিন্ন আর উপায় নাই। নল দিয়া কথা কহা? সে কাজ এ প্রাণ থাকিতে হইবে না। তাড়াতাড়ি যেমন যাইব, একটী টেবিলের উপর নানাবিধ খেলানা সাজান ছিল, ধাক্কা লাগিয়া, সমস্ত হুড়মুড় করিয়া উল্টাইয়া পড়িল। এমন সময় হার্বি আসিয়া উপস্থিত।

হার্বি। "কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

আমি। "আগে ভাই! তোমার ঘণ্টাটা থামাও, তারপর বলিতেছি।"

হার্বি। "এই নাও ঘণ্টা থামিয়াছে; এখন নীচে যাই, পাড়ার লোক সব উঠিয়া টেলিগ্রাফ করিতেছে, তাহাদের বুঝাইয়া আসি।"

হার্বি টেলিগ্রাফ দ্বারা সকলকে বলিয়া আসিল,—'ভ্রমক্রমে এরূপ হইয়াছে; বাস্তবিক কোন বিপদ ঘটে নাই।' আসিয়া গ্যাস জ্বালিয়া দিল।

আমি। "ভাই! কিছু মনে করিও না, অন্ধকারে কেমন ঘুম হইল না, গ্যাস জ্বালিতে গিয়া, এই কাণ্ড করিয়াছি।"

হার্বি। "তা'র আর কি হইবে? এখন আমি শুইগে। দেখ, আমার জামা গায়ে দিবার সাবকাশ হয় নাই, শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়াছি। বড় শীত ভাই! পলাই।"

আমি। "দাঁড়াও দাঁড়াও! আমার আর একটা কথা আছে। আমি আর এক বিপদে পড়িয়াছিলাম। টিউব দিয়া তোমাকে ডাকিতে গিয়া মিশ্ হার্বিকে ডাকাতে তিনি——"

হার্বি। "থাক্, থাক্, সে কথা কাল শুনবো। তা'রজন্য ভাবনা কিসের? কাল সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি যাই।" হার্বি চলিয়া গেল; আমার সব কথা বলা হইল না। সকালে মুখ দেখান ভার হইবে। এস্থান হইতে যদি কোন প্রকারে পলাইতে পারিতাম, তবে ভাল হইত। ভাবিলাম,—না পারিই বা কেন? ঘড়ীতে সবে ৪টা বাজিয়াছে, যদি যাইতে হয় ত এই সময় যাওয়াই ভাল। একটু পরেই লিডি নিশ্চয়ই উঠিবে, তাহার সহিত দেখা করা হইবে না। সঙ্গে রেলওয়ে গাইড ছিল, দেখিলাম, ৫টার সময় একখানি গাড়ি লণ্ডনে যাইবে। তা'হলে এই বেলা যাওয়াই শ্রেয়ঃ। ছোট পোর্টমেণ্টোটী স্বচ্ছন্দে হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব।

একখানি কাগজে লিখিলাম,—"আমি না বলিয়া চলিয়া গেলাম, কিছু মনে করিও না; আমার সম্বন্ধে যদি কেহ কিছু বলে, সে সব মিথ্যা জানিবে। লণ্ডনে যাইয়া সমস্ত বিষয় পত্রদ্বারা জানাইব।"

টেবিলের উপর কাগজখানি রাখিয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া বুট যোড়াটী হাতে করিয়া সিঁড়িতে নামিলাম। নীচে আসিয়া বুট পায়ে দিলাম। সম্মুখেই দরজা, দরজার ভিতরদিকে ভাল সবুজ সাটিনের পর্দ্দা। সরাইয়া দরজা ঠেলিলাম, বন্ধ; হ্যাণ্ডেল ঘুরাইলে খুলিতে পারে ভাবিয়া, যেমন হ্যাণ্ডেল ধরিলাম,—আ-আ-আ-আ-উ-উ-উ-খুউন—খুউ-উন। হার্বির চোর কলে পড়িয়াছি। দক্ষিণ হস্তদ্বারা হ্যাণ্ডেল ধরিয়াছিলাম। উহাও আমার হস্তকে উত্তমরূপে ধরিয়াছিল।

আমি ছাড়িলে সে ছাড়ে না! পোর্টমেণ্টো ফেলিয়া বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত উঠাইতে গিয়া, দুটী হাতই তাহাতে লাগিয়া গেল। কেবল হাতের যন্ত্রণা হইলে রক্ষা ছিল,—সমস্ত শরীর তাড়িতবেগে (Galvanic shock) অস্থির।

হঠাৎ কাঁপুনি থামিল; নিকটে একখানি চেয়ারে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। সম্মুখেই হার্বি; সে আমার যন্ত্রণা দেখিয়া, অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপে চোরকলে আসিয়া পড়িলে?" হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম; "বাড়ী যাইতেছিলাম। সমস্ত রাত্রি কষ্টভোগ করিয়াছি, শেষে কষ্টের ধাড়ি পাইয়াছি। উঃ! ইহাতে আমাকে আধমরা করিয়াছে। এখন দরজা খুলিয়া দাও, আমি চলিয়া যাই।"

হার্বি। "বিলক্ষণ, এস উপরে এস; যাবে কোথা?"

আমি। "না, আমি থাকিব না, নিশ্চয়ই যাইব। তোমার যে বাড়ী, এদিকে নল, ওদিকে টিপ্‌কল, সেদিকে ব্যাটারি, সেখানে তার, মাথায় ঘণ্টা, যেন ভূতের আড্ডা; এখানে কি ভদ্রলোকে থাকিতে পারে? খোল, দরজা খোল, আমি যাই, আবার কি ট্রেণ ফেল হ'ব?"

হার্বি। "নেহাত যাইবে? তবে দাঁড়াও, সহিসকে গাড়ি তৈয়ার করিতে বলি, আমি তোমাকে ষ্টেশনে রাখিয়া আসিব। ততক্ষণ লিডিকে কিছু খাবার আনিতে বলি। সে এতক্ষণ উঠিয়াছে।"

এতক্ষণ কড়া, কড়া, কথা বলিতেছিলাম, লিডির নাম শুনিয়া, হৃৎকম্প হইল। বলিলাম, "না না, খাবার কাজ নাই। আমি এই চলিলাম, গুড্‌বাই।"

হার্বি। "সে কি হে! পাঁচমিনিট দাঁড়াইতে পার না?"

আমি। "না ভাই মাপ কর, তা'র উঠিবার আগেই আমি চলিলাম; গুড্‌বাই, গুড্‌বাই।"

হার্বি। "তবে একমিনিট দাঁড়াও, আমি কাপড় ছাড়িয়া আসি, তোমার সঙ্গে যাইব।"

আমি। "না ভাই, তোমার পায়ে পড়ি—"

এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল, আর দাঁড়াই? গুড্‌বাই বলিয়াই দৌড়। ফটক পর্য্যন্ত দ্রুত আসিয়া, মনে পড়িল, এখানেও কোন রকম তার তোর থাক্‌তে পারে। পিছনে চাহিয়া দেখিলাম,—হার্বি দাঁড়াইয়া। উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন হে! এখানে কোন রকম কষ্ট আছে?"

হার্বি। "কষ্ট আবার কি? কোনও ভয় নাই।"

আমি। "কোন রকম টিপ্‌কল ফিপ্‌কল নাই ত?"

হার্বি। না, না, তুমি স্বচ্ছন্দে যাও।

পা দিয়া দরজা খুলিলাম। হাত দিলাম না, পাছে দরজার গায়ে গা ঠেকে। সাবধানে বাহির হইলাম।

রাস্তায় আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। যথাসময়ে লণ্ডনে আসিয়া পঁহুছিলাম। এখন আর আমার সে "হুইস্কার" নাই।

দুইদিন পরে, হার্বির এক পত্র পাইলাম। যদিও তামাসা করিয়া লিখিয়াছে, তথাপি পড়িয়া আমার রাগ হইল। পত্রের কিয়দংশ এইরূপ—'ছি! ছি! লিডির ঘরে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলে? ভাল কর নাই, ভদ্রলোক হইয়া, দাসীর প্রতি ওরূপ ব্যবহার অতি ঘৃণার্হ। বিশেষ, বন্ধুবান্ধবের ভিতর ওরূপ চরিত্রের লোক হইলে, বড় দুঃখ হয়।'

পড়িয়া পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। প্রত্যুত্তর লিখিলাম না।

কিছুদিন পরে, হার্বি স্বয়ং আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, পুনরায় তাহার সহিত আলাপ করিয়াছি; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—আর তাহার বাড়ী যাইব না। দেখি বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় কি না?

শ্রীহেমলাল দত্ত।

নির্ব্বাসিতের স্বপ্ন।

হায় রে নিয়তি-লিপি, বুঝিবারে সাধ্য কার;
স্থূল-বুদ্ধি ক্ষীণ-দৃষ্টি ভাবে এক,—হয় আর!
আশার কুহক ঘোরে—সুখের চপলা খেলা;
শ্রান্ত পান্থে পথ-প্রান্তে মরুতে মরীচি মেলা।
আশা-ভ্রান্ত প্রাণ-ক্লান্ত দীপ-দৃষ্ট কীট প্রায়;
আশার আশ্বাসে ধেয়ে, নিরাশ্বাসে প্রাণ যায়।
যন্ত্রণায়, মন্ত্রণায়, ত্যজি' সুখ রম্য পুর;
মিথ্যা ছল-বলে এবে বিতাড়িত বহুদূর।
কোথা' সেই দিব্যধাম, সুখ স্নেহ-প্রেমপাশ?
প্রিয়তমা চারুহাসি মধুর অফুট ভাষ?
প্রীতিশান্তি নিকেতন কতদূরে এনু ফেলে!
পা'ব কি সে সব আর, কখন কোথাও গেলে?
শূন্য প্রাণে শূন্যদৃষ্টি হেরি শূন্য চারিধার;
ভীষণ মরুভূ হায়, নাহি দেখি পারাপার।
অনন্ত বালুকা স্তূপ, নাহি কোথা' ফল-জল;
থাকি' থাকি' দেখি মাত্র আশা-মরীচিকা-ছল!
পরিচিতস্থান ছেড়ে কোথায় পড়েছি এসে;
ভাবিনি কাঁদিতে হ'বে, অচেনা প্রদেশে শেষে।
নাহি একে তরু-ছায়া, তাহে রবি খরতর;
পদ-তলে তপ্ত বালু, বহে বায়ু দগ্ধকর।
থাকিতে সকলি হায়! ভাঙ্গা-হৃদি জুড়িবার;
তবু কেন হেথা পড়ে, হাহাকার অনিবার?
হৃদয় আঁধার আজ—সেথা' ত প্রদীপ ছিল;
তবু ত তাড়া'য়ে আরো আঁধার বাড়া'য়ে দিল।
মনে করি একবার—'কেন বা কাঁদিব আর?'
ততই যে ঝরে চখে অনিবার অশ্রুধার।

দু'হাতে চাপিয়া তা'য়—ভূমে পড়ি' মুখ ঢেকে;
মুছাত যা' আগে সেই, আজি তাহা কেবা দেখে?
হায়! নিদ্রা শান্তিময়ী তা'ওত গিয়েছে ছেড়ে;
হৃদিভেদী দাবানল কেবলি রয়েছে বেড়ে।
কি জানি ভুলিয়া বুঝি নিদ্রার কোমল কর,
এসেছিল চখে মম কালি বহুদিন পর;
কিন্তু সে চক্ষের ঘুম, কিবা সাধ্য আছে তার;
পূর্ব্ব-স্মৃতি-চিন্তা-স্রোত হৃদি-বেগ নাশিবার!
ভগ্ন-খাটে শু'য়ে তাই দেখিলাম কতক্ষণে;
মনোমত স্বপ্ন কিবা, আছে কিনা আছে মনে—
প্রিয়-প্রেম-পাশ-চ্যুত ম্লানমুখা বিষাদিনী;
প্রিয়তমা, রবি-হারা যেন ধনী সরোজিনী;
বসিয়া নির্জ্জন-কক্ষে মুক্ত-বাতায়ন পাশে;
একমনে—স্থিরচক্ষে—হেরিছে প্রকৃতি হাসে।
অমূল ভূষণগুলি কোথায় ফেলায়ে দেছে;
সে মধুর স্নিগ্ধ-কান্তি কালীপারা হ'য়ে গেছে!
অশ্রুমাখা মুখ খানি দুঃখ-ভারে কর-তলে;
শিশির-ভারেতে যেন নলিনী পড়েছে ঢলে!
সুধাংশু-কিরণ মালা পড়িয়াছে মুখ'পরে;
এ কি শোভা মিশামিশি সুধাকর সুধাকরে!
নহে বুঝি আধ-ফোটা বাসন্তী-কুসুম-কলি;
বিমল কৌমুদীসনে প্রেমভরে গলাগলি!
নবীন-নীরদ শ্যাম কেশপাশ এলায়িত;
ঢাকিছে মোহিনী ঠাম—কভু মন্দ সঞ্চালিত!
দুরন্ত জলদপুঞ্জ আজি বড় পুলকিত;
আবরিছে থাকি থাকি যেন শশী নবোদিত!
নীরব, নিথর, তনু সোণার প্রতিমা যেন;
অনাথিনী-প্রায় বসে একাকিনী কান্দে কেন?

দিব্য সুখধাম, তার রম্য কক্ষ-মাঝে বাস;
তবু ত সে চাঁদমুখে নাহি সে মধুর হাস।
যে চখেতে অবিরাম বহিত অমৃতধারা;
আজি তাহা ছল ছল কেবলি জলেতে ভরা! (ক্রমশঃ)—

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

কর্ম্ম-ফল।

জগতের সকল জীবই এক পরমপিতার সন্তান। সকলেই তাঁহার সমান স্নেহের পাত্র—দয়াময়ের দৃষ্টি সকলের উপর সমভাবে রক্ষিত। বৃহত্তমজীব হইতে ক্ষুদ্রাদপি কীট পর্য্যন্তও তাঁহার সমান স্নেহের অধিকারী,—পিতার নিকট পুত্রবাৎসল্যের ইতর বিশেষ নাই। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের রাজা, সকল প্রজাকেই সমভাবে ন্যায় বিতরণপূর্ব্বক, বিশ্বরাজ্য চালাইতেছেন। যদি জগতে, সকলেই তাঁহার সমান দয়া ও সমান স্নেহের পাত্র হয়, তবে তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে, অবস্থাভেদে, সুখ দুঃখের ইতর বিশেষ দেখিতে পাই কেন? কেহ ধনকুবের, অভাব কাহাকে বলে জানে না; কেহ বা সামান্য জঠর-জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত;—জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যের অভাবে হয় ত মৃতপ্রায়। আবার কেহ হয় ত পার্থিব সমস্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াও, মানসিকক্লেশে অনুদিন কাতর; কেহ বা দারিদ্র্য-দুঃখে নিপীড়িত হইয়াও, সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে, সাংসারিক অভাবে, তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। আবার দেখা যায়,—অদ্য যে লক্ষপতি, কল্য সে পথের ভিখারী—মুষ্টিভিক্ষার প্রার্থী; অদ্য যে শত পুত্রের পিতা, কল্য একেবারে সন্তানহীন; পক্ষান্তরে, আবার অদ্যকার ভিখারী, কল্যকার রাজা। ন্যায়বানের রাজ্যে এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন ও তারতম্য, এ প্রকার ইতর বিশেষ কেন? তবে কি তিনি সকল সন্তানকে সমান চক্ষে দেখেন না? সকল ভক্তের প্রতি কি তাঁহার সমান দয়া হয় না?

জগতে এইরূপ অবস্থার তারতম্য দেখিয়া, লোকে সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের দয়ায় সন্দেহ করে, বিধাতার দোষ দেয়, আপন অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া, কেবল আত্মগ্লানি আনিয়া উপস্থিত করে, ও প্রভূত পাপ সঞ্চয় করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে। শিবদাতা ধাতা কখনও অপকারী নহেন, দয়াময়ের অনন্ত দয়া-ভাণ্ডারের প্রার্থী সকলেই; তিনি, সমভাবে সকলকেই দয়া বিতরণ করেন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, এবং সন্দেহ করাও মহাপাপ।

আমরা নিজদোষে, নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছি;—স্বখাদ-সলিলে নিজেই ডুবিয়া মরিতেছি; নিজের সর্ব্বনাশ, নিজেই আনয়ন করিয়া, মঙ্গলময় বিধাতার করুণায় সন্দেহ করিয়া, পাপ-ভারাক্রান্ত হইতেছি।

"রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধনঃ ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ বৃক্ষাণাম্ ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥"

এই সংসারে, রোগ, শোক প্রভৃতি, যত কষ্ট আমরা ভোগ করিয়া থাকি, সমস্তই আমাদের আত্মাপরাধ বৃক্ষের ফল। আমরা জন্মান্তরীণ সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলানুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছি।

পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীই কর্ম্ম-ফলের বশীভূত। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধন, কেহই কর্ম্ম-ফলের হাত এড়াইতে পারেন না। কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; স্বয়ং বিধাতাও কর্ম্ম-ফলের বাধ্য। কর্ম্ম-ফলানুসারে আমাদের যতটুকু প্রাপ্য, তাহার অতিরিক্ত প্রদানে বিধাতাও অক্ষম। বস্ত্রহরণকালে যখন দ্রৌপদী, সকাতরে সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সেই অশরণের শরণ,—জগৎপতির নিকট লজ্জা-রক্ষার্থে, বস্ত্র প্রার্থনা করেন, তখন প্রথমতঃ তিনি, তাঁহাকে বস্ত্র-দান করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণা স্বীয়-কর্ম্ম-ফলানুসারে বস্ত্র পাইতে পারেন কি না?—তাহা তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। যখন জানি-লেন যে, দ্রৌপদী বাল্যকালে একজনকে বস্ত্রদান করিয়াছিলেন, এবং বস্ত্র পাইবার উপযুক্ত, তখন তিনি, তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন

যে, 'যদি শত সহস্রবর্ষও চেষ্টা করে, তাহা হইলেও তোমাকে বিবস্ত্রা করিতে পারিবে না, আমি তোমার বস্ত্র যোগাইব।' অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিধাতাকেও কর্ম্মফলের বশীভূত হইতে হয়। এই জন্যই শিহ্লন কবি "শান্তিশতকের" প্রারম্ভে কর্ম্মকেই নমস্কার করিয়াছেন; তিনি লিখিতেছেন ঃ——

"নমস্যামো দেবান্ ননুহতবিধেস্তেহপি বশগা।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোহপিপ্রতিনিয়তে কর্ম্মৈক ফলপ্রদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মমভ্যো বিধিরপি ন যেভ্য প্রভবতি॥"

অর্থাৎ দেবগণে নমস্কার করা বিফল, কারণ তাঁহারা বিধাতার বশবর্ত্তী; বিধাতাও কর্ম্ম-ফলপ্রদ। তবে আমি, যাহার উপর বিধাতারও প্রভুত্ব নাই; সেই কর্ম্মকেই নমস্কার করি।

জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা এই ভবে জন্ম-গ্রহণ করি। এবং যতদিন কর্ম্ম-সূত্র ছিন্ন না হয়, ততদিন জননী-জঠর-যন্ত্রণাভোগ করিয়া, বার বার এখানে যাতায়াত করিতে থাকি। আমরা এই ভব-হাটে হাটক কিনিতে আসি, কিন্তু মায়াপাশে জড়িত হইয়া ও দুর্দ্দম্য রিপুগণের বশবর্ত্তী হইয়া, পার্থিব ক্ষণভঙ্গুর, আপাত-মধুর বস্তুর অন্বেষণে ব্যগ্র হই। অজ্ঞান-তিমিরে আমাদের চিত্ত তমসাচ্ছন্ন হয়; সুতরাং সুবর্ণভ্রমে কাচ পাইবার জন্য লালায়িত হই, এবং তাহাতেই ভুলিয়া থাকি। মঙ্গলময়ের আদেশ ভুলিয়া, তাঁহার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে ভুলিয়া, নিয়ত কুপথে চালিত হই এবং দুষ্কৃতির পরিণামফলে শেষে অসহ্যক্লেশে নিপতিত হই। আমরা নিয়ত যেন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করি, তাঁহার মঙ্গলময় পথের পথিক হই, ও অনিত্যবস্তু ত্যাগ করিয়া যেন নিত্যবস্তুতে আশক্ত হইতে পারি,—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, ইহাই তিনি চাহেন এবং ইহাই তিনি বলিয়া দিতেছেন। কিন্তু পাপী আমরা, নিজ কর্ম্ম-ফলে পরিচালিত হইয়া, কর্ম্মানুসারেই ফলভোগ করিয়া আসিতেছি। যেরূপ বীজ রোপণ করিয়াছি, সেইরূপ ফললাভ করিতেছি;—কে তাহার অন্যথা করিবে?

আমাদিগকে এইরূপ কর্ম্মফলের বশীভূত করিয়াছেন বলিয়া, পরম-পিতা তাঁহার দুষ্ট সন্তানগণকে নিয়ত শাসন করিতেছেন। এই শাস্তি, এই শাসন দয়াময়ের অনন্ত দয়ার পরিচায়ক। ইহাতে আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ কিছুই নাই, বরং সন্তুষ্টচিত্তে অম্লান-বদনে ন্যায়বান্ পরাৎপরের শাস্তিভোগ করিয়া, নিজ ভ্রম, নিজ দোষ, উপলব্ধি করিতে শিখিয়া, তাঁহার নিকট করযোড়ে অনুতপ্তহৃদয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত। দীন-দয়াল, অনুতপ্ত পাপীকে, অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। তাঁহার অসীম কৃপায়, আমরা নির্ভয়ে সাংসারিক মায়াজাল ও কর্ম্ম-সূত্র ছিন্ন করিয়া, দুস্তর ভবসাগর পার হইয়া, পরমপিতার পবিত্র নিকেতনে অবশ্যই উপস্থিত হইতে পারিব।

যখন পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব, পিতৃসিংহাসন-প্রাপ্তির আশায় পিতৃ-সন্নিধানে গমনকরতঃ, বিমাতৃবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন সুনীতি তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন,——

"নোদ্বেগ স্তাত কর্ত্তব্যঃ কৃতং যৎ ভবতাপুরা।
তৎ কোপহর্ত্তুম্ শক্নোতি, দাতুং যশ্চাকৃতং ত্বয়া॥
তথাপি দুঃখঃ ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্ত যাবৎ স তে নৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্॥"—বিষ্ণুপুরাণম্।

অর্থাৎ বৎস! দুঃখিত হইও না, তুমি পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহার ফল, কেহ অপহরণ করিতে পারিবে না। যাহা কর নাই, তাহা, প্রদান করিতে কেহ পারগ নহে। এ বিষয়ে দুঃখিত হওয়া, কথনই উচিত নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য পাইয়াই, সন্তুষ্ট থাকেন।

অতএব কর্ম্মফলে যাহা প্রাপ্য তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। অনর্থক বিধাতার দোষ দিয়া, মহাপাপ সঞ্চয় করা মানবের কর্ত্তব্য নহে। কারণ ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন——

"ন কর্ত্তৃত্যং ন কর্ম্মাণি লোকস্থ সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪॥
না দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥" ১৫॥ গীতা ৫ম অধ্যায়।

অর্থাৎ ঈশ্বর, জীবের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্ম সকলও সৃষ্টি করেন নাই, এবং কর্ম্ম-ফল সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু জীবের অবিদ্যাই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ১৪॥ বিভু কাহারও পাপগ্রহণ করেন না, কাহার পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই জন্যই জন্তুগণ মোহিত হয়, এবং ভগবানে বৈষম্য দর্শন করে॥ ১৫॥ শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

সহজ শিল্প-শিক্ষা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৩। জল শীতল করিবার সহজ উপায়।

এই গ্রীষ্মকালে শীতলজল যে কত উপাদেয়, তাহা বোধ হয়, কাহারও অজ্ঞাত নাই। কিন্তু কলিকাতা সহরে বরফ জলে দিয়া জল শীতল করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের জন্য (অর্থাৎ যে স্থানে বরফ পাওয়া যায় না) একটী সহজ প্রক্রিয়া নিম্নদেশে লিখিত হইল;—ইহাতে সকলেই অতি অল্প ব্যয়ে ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে জল শীতল করিতে সমর্থ হইবেন। ঢুই সের সল্‌ফেট অব্ সোডা (Sulphate of Soda) একসের মিউরেট অব্ এ্যামোনিয়া (Murate of Ammonia) এবং একসের নাইট্রেড অব্ পটাস (Nitrate of Potash) একত্র করিয়া, সমান পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিবামাত্র সমস্ত জল মুহূর্ত্তমধ্যে শীতল হইয়া পড়িবে। তখন ঐ পাত্রের মধ্যে একগ্লাস পানীয়জল রাখিলে, অল্পক্ষণ মধ্যেই উক্ত জল বরফ জলে পরিণত হইবে। উক্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি বিষাক্ত; দেখিবেন; যেন ঐ গুলি কদাচ ব্যবহার করিবেন না।

৪। তাম্রপাত্র পরিষ্কারের সহজ উপায়।

আমাদের দেশে সচারাচর তেঁতুল দ্বারাই তাম্রপাত্রাদি পরিষ্কৃত হইয়া থাকে; তথাপি সময়ে, সময়ে, তাম্রের পাত্রের দাগ সম্পূর্ণরূপ

উঠিয়া পরিষ্কৃত হয় না। কিন্তু নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াদ্বারা পাত্র পরিষ্কার করিলে, অল্পক্ষণ মধ্যে পাত্র প্রভাতের তরুণ তপনের ন্যায় পরিষ্কৃত হইবে। প্রথমতঃ পাত্রটীকে কিছুকাল দগ্ধ করিতে হইবে। পরে উষ্ণ থাকিতে থাকিতেই ইহাতে খানিকটা তারপিন তৈল (Oil of Terpentine) ঢালিয়া দিয়া, নরম বনাত অথবা ফ্ল্যানেল দিয়া খানিক জোরে মর্দ্দন করিয়া, তাহার পর জলে ধৌত করিলে, তাম্রপাত্র উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইবে।

৫। আম গাছে পোকা নিবারণের উপায়।

যে আমগাছে পোকা হয়, সেই গাছের স্থানে স্থানে, চিনির শিরা প্রস্তত করিয়া, তাহার সহিত গন্ধক অথবা তাম্রচূর্ণ মিশ্রিত করণান্তর তাহার সহিত উহার দশভাগের পরিমাণে (Arsenic) সেঁকোচূর্ণমিশ্রিত করিয়া, লাগাইলে পোকার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়।

৬। গ্রীষ্মকালে কমলালেবু।

গ্রীষ্মকালে কমলালেবু পাওয়া যায় না। কিন্তু একটী সহজ উপায় দ্বারা কমলালেবু শীতের পরও ৩।৪ মাস রাখা যাইতে পারে। একটী বাক্সে প্রথমে একস্তর বালি রাখিয়া পরে, তাহার উপর কমলালেবু পরস্পর হইতে এক অঙ্গুলি দূরে রাখিয়া সাজাইয়া দিবে। এইরূপে একস্তর বালি, একস্তর কমলালেবু রাখিতে হইবে। এইরূপে রক্ষিত কমলালেবু প্রায় ৩।৪ মাসেও নষ্ট হইবে না; ঠিক টাট্‌কা থাকিবে।

৭। লালপদ্মকে নীল করিবার উপায়।

রামায়ণে রামচন্দ্র একটী নীলপদ্মের জন্য স্বীয় চক্ষুর উৎপাটনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের প্রতাপে শত শত নীলপদ্ম অনায়াসে প্রস্তত করা যাইতে পারে। সেই সঙ্কেতটী নিম্নে লিখিত হইল, ইহাদ্বারা লাল গোলাপকেও নীল করা যাইতে পারে। একটী গ্লাসে খানিকটা ইথার (Ether) রাখিয়া, তাহার মধ্যে ইহার দশভাগের একভাগ পরিমাণ তরল এ্যামোনিয়া (Light Ammonia) মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থে লালপদ্ম, গোলাপ, জবা, প্রভৃতি

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা।

'দারোগার দপ্তর' ২০শ ও ২১শ সংখ্যা—পুস্তক দুই-খানির নাম, যথাক্রমে "বামুন ঠাকুর" ও "এ কি! খুন!!" বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ, বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে কে না জানেন? তাঁহারই প্রণীত সত্য ঘটনা-মূলক গল্প সমুদয় ক্রমান্বয়ে "দারোগার দপ্তর" রূপে সুযোগ্য শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। আমরা "দারোগার দপ্তর" পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। যা' তা' রবিস্ উপন্যাস পাঠ না করিয়া, উপন্যাস-পাঠক সাধারণকে আমরা এইরূপ উপন্যাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তৃপ্তি—মাসিক পত্র। ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ। 'তৃপ্তি' পাঠ করিয়া আমরা স্থানে স্থানে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ছাপা ততটা তৃপ্তিকর নহে।

বিকাশ—মাসিক পত্র। ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ। ইহাতে লিখিত বিষয়গুলি বেশ হইয়াছে। "বিকাশ" সাধারণের মধ্যে বিকাশ পাইলে আহ্লাদের বিষয়।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী—মাসিক পত্রিকা। এ খানির প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। কি জানি কেন, পত্রিকায় মাসের কোনও উল্লেখ নাই। রীতিমত সময়ে তৃতীয় সংখ্যাখানি না পাইলে কিছুই বলিতে পারিলাম না।

'বাবু'—আমরা গত ৭ই জানুয়ারি, রবিবার "ষ্টার রঙ্গমঞ্চে" উক্ত সামাজিক নক্সার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে আফিমের কমিশন হইতে, বিধবা বিবাহ, উন্নতি-শীলবাবু, বৈজ্ঞানিক বাবু, স্কুলের ছাত্র-বাবু প্রভৃতি সংক্রান্ত কোনও নক্সাই বাদ পড়ে নাই। আমাদের সমাজের আধুনিক অবস্থার জ্বলন্তছবি "বাবু" দেখিয়া সাধারণের একবার কিছু শিক্ষা করা উচিত।

নিম্নলিখিত পত্র পত্রিকাগুলিও আমরা বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতেছি,—

ভারত সংবাদ—সাপ্তাহিক পত্র।

দাসী—দাসাশ্রমের মাসিক পত্রিকা।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } ফাল্গুন, ১৩০০ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

রাজপুত-রমণী।

বীর-প্রসবিনী রাজপুতানার বীর-কীর্ত্তি ত্রিভুবন-বিদিত। এই রাজপুতানার বীর-রমণীগণের আন্তরিক তেজ, মানসিক বল, ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত। সুকুমারী ললনার যে কমনীয় হৃদয়, স্নেহ, দয়া, মমতাদি কোমল প্রবৃত্তির আধার, সেই ললনা-হৃদয় আবার কার্য্যকালে, কর্ম্মক্ষেত্রে, কতদূর কঠোর, কতদূর তেজোগর্ব্বে গর্ব্বিত হইতে পারে, তাহা বীরাঙ্গনা রাজপুত-ললনার হৃদয় অন্বেষণ করিলেই সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, মিবারাধিপতি সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর, মিবাররাজ্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে। মিবার-রাজবংশধর উদয়সিংহ তখন নিতান্ত শিশু থাকায়, সংগ্রামসিংহের ভ্রাতা পৃথ্বী-সিংহের দাসী-পুত্র বন্‌বীরসিংহ অনেক কৌশলে মিবারের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। দাসী-পুত্র হইয়া সিংহাসনপ্রাপ্তিতেও তাঁহার দুরাশার নিবৃত্তি হইল না; পাপাশয় বন্‌বীর, উন্নতির পথে কণ্টক দেখিতে হইলেন। তিনি মনে মনে যে সুখ-স্বপ্ন দর্শন করিতেছিলেন, কল্পনা-রাজ্যে যে মনোহর ছবি অঙ্কিত করিতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই সুখস্বপ্ন

ভাঙ্গিয়া গেল—অকস্মাৎ তাঁহার কল্পনাকাশে একখণ্ড কালমেঘ উদিত হইল। তিনি দেখিলেন,—মিবারের বংশধর শিশু উদয়সিংহ জীবিত থাকিতে, তাঁহার সুখের প্রত্যাশা নাই। এ কণ্টক বিদূরিত করিতে না পারিলে, নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। অনেক চিন্তার পর,দুরাত্মার পাপচক্ষু,নির্দ্দোষী শিশুর উপর পতিত হইল। তাঁহার সুখের কণ্টক এক্ষণে তাঁহার অধীন মিবারদুর্গেই বাস করিতেছেন। শিশু উদয়সিংহের পান্নাধাত্রী ভিন্ন এ জগতে আর কেহ নাই। রাজপুত-ললনা পান্না, মিবার-বংশধরকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষা—প্রাণাপেক্ষা—অধিক ভালবাসেন। যদি আবশ্যক হয়, তবে প্রাণ দিয়াও—প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রের জীবন দিয়াও, পান্না তাঁহার প্রতিপালকের—অন্নদাতা স্বর্গীয় সংগ্রাম সিংহের—বংশধরকে রক্ষা করিবে, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। রাজপুত-রমণীর এ প্রতিজ্ঞা অটল।

একদিন রাত্রিতে আহারান্তে যখন ভৃত্য উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি স্থানান্তরিত করিতে আসিল, তখন তাহার মুখে পান্না যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল—সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শুনিলেন,—দুরাত্মা বন্‌বীর স্বয়ং অসিহস্তে শিশুর রক্ত-পিপাসু হইয়া আগমন করিতেছেন। বীরাঙ্গনার বীরহৃদয় ক্ষণকালের জন্য আন্দোলিত হইল। যে প্রভু-সন্তানকে তিনি স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় দেখেন, আজ কোন্ প্রাণে, সেই প্রাণ-পুত্তলীকে নর-পিশাচের হস্তে অর্পণ করিবেন? কোন্ প্রাণে মাতৃ-স্থানীয় হইয়া, মাতৃপিতৃহীন শিশুর নিধন স্বচক্ষে দেখিবেন? কিন্তু এই বীরাঙ্গনার অন্তরে যে বল ছিল, শত শত বন্‌বীরের জিঘাংসু হস্তে সে বল থাকিতে পারে না। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি রাজকুমারকে বাঁচাইবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত, আন্তরিক অমিত-বলে বলবতী হইয়া, আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শিরীষ-কুসুম-সম সুকুমার রমণী-হৃদয়, এক্ষণে বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিল। নিদ্রিত শিশুকে উচ্ছিষ্টপাত্রের মধ্যে শয়ন করাইয়া, ভৃত্যকে দুর্গের বাহিরে লইয়া যাইতে, এবং তথায় তাঁহার গমনকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা

করিতে, আদেশ দিয়া, স্বীয় গর্ভজাত সন্তানকে রাজ-পুত্রোচিত পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিয়া, রাজকুমারের শয্যায় শায়িত করিলেন!

ভৃত্য বিদায় হইবার ক্ষণকাল পরেই, কালান্তক যম সদৃশ দুরাত্মা বন্‌বীর, রক্তপিপাসু হইয়া, শাণিত অসিহস্তে পান্নার গৃহে প্রবিষ্ট হইল। তাহার শাণিত তরবারি, দীপালোকে প্রতিফলিত হইল। দুরাত্মা পান্নাকে, রাজকুমারকে দেখাইয়া দিতে বলিতে লাগিল। ক্রোধে ও ঘৃণায় পান্নার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, যে শয্যায় তাঁহার প্রাণপুত্তলী অঘোর নিদ্রায় অভিভূত, তিনি সেই শয্যা দেখাইয়া দিলেন! দুরাত্মার শাণিত অসি নির্দ্দোষী শিশুর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল!! নির্দ্দোষী অপোগণ্ডের রক্তে শয্যা সিক্ত হইল! নরপিশাচ রক্তাক্ত-অসিহস্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। আর বীরাঙ্গনা জননী?—সেই পৈশাচিক দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া স্থির রহিলেন! ধন্য রাজপুত-রমণীর মানসিক বল; ধন্য তাঁহার আত্মোৎসর্গ! এই আত্মোৎসর্গের মোহিনীশক্তিতে আজ পান্নার নিকট সন্তান-বাৎসল্যও তুচ্ছ পদার্থ; আজ পান্না প্রভু-হিতের মহান্ যজ্ঞে নিজ সন্তান বলি দিয়া, জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিল। পান্নার এই মানসিক বলই প্রকৃত বল, এই মানসিক তেজই, প্রকৃত তেজ; এই বল, এই তেজ, ক্ষত্রিয় রমণী-হৃদয়ের অমূল্যরত্ন। সামান্য ধাত্রী পান্না, জগতে আজ যে কীর্ত্তি-স্থাপন করিল, যুগ যুগান্তেও তাহা লুপ্ত হইবার নয়; এ কীর্ত্তি অক্ষয়।

যে দেশের রমণীগণ জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করিয়া, পতির অনুগামিনী হয়—জগৎকে সতীত্বধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে, সে দেশের রমণী-হৃদয়ের ঈদৃশ বল, ঈদৃশ তেজ, এরূপ বীরত্ব,অস্বাভাবিক নহে। রাজপুত-ললনার জহরব্রত ত্রিভুবন-বিখ্যাত। জন্মভূমি রক্ষার জন্য বীরকেশরীগণ সম্মুখ-সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে, তদীয় পত্নীরা চিতায় দেহ ভস্মসাৎ করিয়া, পতির সহিত অনন্ত স্বর্গধামে গমন করিতেন। যখন দুরন্ত যবন আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন, যখন প্রচণ্ড সমরবহ্নিতে চিতোরের শত শত যোদ্ধা রণশায়ী হয়, যখন আলাউদ্দিন পদ্মিনী-লাভ-লালসায় চিতোরদুর্গে প্রবেশ করেন,

তখন তিনি সেই রাজপুত-রমণীর মানসিক বল ও অলৌকিক বীরত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন,—চিতোর-রাজপ্রসাদ অগ্নিময়ী, চিতার ধূমে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন! আর সুকুমারী বীরাঙ্গনাগণ দলে দলে সহাস্যবদনে সেই জ্বলন্তচিতায় আত্মসমর্পণ করিয়া, পতি-বিয়োগাগ্নি-যন্ত্রণার হাত এড়াইতেছেন! তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিলেন,—রাজপুত-রমণীর হৃদয়ের কত বল, বীরাঙ্গনার হৃদয়ের কত তেজ; জগৎ বুঝিল,—সতীত্বধর্ম্মের এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি নাই।

রাজপুত-রমণীর এই 'জহরব্রত' এই একবার নয়, হিন্দু-যবন-সংঘর্ষণ-কালে ইহার ভূরি ভূরি অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুত-রমণী স্বহস্তে পুত্রকে রণবেশে সজ্জিত করিয়া, সমরক্ষেত্রে বিদায় দিতেন; বলিতেন; "যাও বৎস! সম্মুখ-সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া বীর-ধর্ম্ম,—ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, নতুবা সমরপ্রাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া, দিব্যলোক প্রাপ্ত হও। কিন্তু সাবধান, যেন শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া, কাপুরুষের ন্যায়, ভীরুর ন্যায়, পলায়ন করিয়া, ক্ষত্রিয়-কুলে কালিমা অর্পণ করিও না;—যেন বীরভূমি রাজপুতানার চির-গৌরব অতলজলে নিমজ্জিত করিও না!" পৃথিবীতে অনেক সুসভ্য-জাতি ও অনেক ইতিহাস আছে, কিন্তু রমণী-হৃদয়ের ঈদৃশ তেজ, আর কোন জাতির কোন ইতিহাসে, দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল বীরাঙ্গনার হৃদয় যে উপাদানে গঠিত, সে সকল উপাদান বোধ হয়, জগতে আর কোন হৃদয়েই নাই। ইহা কেবল রাজপুত-রমণীর নিজস্বধন।

কিন্তু হায়! আজ সেই সকল বীরাঙ্গনা কোথায়? সেই রাজপুতানা, সেই আরাবলী পর্ব্বত, সেই রাজ্য, সেই রাজবংশ সকলই আছে; কিন্তু সেই বীরভূমি আজ অন্তঃসার-শূন্য। যে রমণী-হৃদয়ের তেজোগর্ব্বে যবন চমকিত হইত, অমিততেজে, অতুল বিক্রমে, যোদ্ধাও নতশির হইতেন, যে বীর-ললনার শাণিত অসিতে শত শত যোদ্ধা ভূতলশায়ী হইত, যাহাদের চামুণ্ডামূর্ত্তির প্রখর শূলাঘাতে কত শত

অসুরের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইত, আজ সেই তেজ, সেই শক্তি, সেই রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি, কালের করালগ্রাসে পতিত; কিন্তু মানবের চিত্তপটে আজিও অঙ্কিত থাকিয়া "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই বাক্যের সার্থকতা সাধন করিতেছে। সকলই কালের খেলা, কালেই সমস্ত সৃজিত হয়, আবার কালেই লয় প্রাপ্ত হয়; অতএব—"কালোহি দুরতিক্রমঃ।"

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

নির্ব্বাসিতের স্বপ্ন।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

নৈশ-নিদ্রা-শান্তিসুখ লভিছে অনন্ত বিশ্ব,
জ্যোৎস্নায় নাচে হাসে নীরবে নিখিল দৃশ্য;
স্বভাবের শ্রেষ্ঠরত্ন অফুট কামিনী কড়ি,—
আশা-বৃন্ত-চ্যুত কিন্তু, বিবশা ভূমেতে পড়ি'।
নবীন তমালহারা মাধবী বসন্তে আজ;
মনোদুঃখে ফেলে যেন দিয়েছে সাধের সাজ!
কতক্ষণে আচম্বিতে বিমল সুধাংশু দেখে;
চমকি' উঠিল বালা, দুটী হাতে মুখ ঢেকে!
পাগলিনী প্রায় চেয়ে, পড়িল শয্যার পর;
বিষম প্রাণের জ্বালা কাঁপে অঙ্গ থর থর!
আলু থালু কেশ-পাশ—কি যেন বলিল ধীরে;
উপাধান আশ-পাশ তিতিল নয়ন-নীরে!
হেনকালে আমি যেন বসিয়া নিকটে তা'র;
তুলিনু সে মুখ খানি ঊরু'পরে আপনার।
তবু তার সংজ্ঞা নাই, কি করি?—যতনে করে;
মুছাইনু অশ্রুবিন্দু ছিল যা' বদন পরে।
মুছাইতে অশ্রু তা'র বুঝি না, কেন বা হায়,—
অজ্ঞাতে আমার অশ্রু মিশিল অমনি তায়!

চমকি কিশোরী উঠে, ঘোর স্বপ্ন হ'তে যেন ;—
পুছিল কম্পিত-কণ্ঠে—'এ কি! তুমি হেথা কেন ?'
কহিনু করেতে ধরি কত বা আদর করি ;—
"সে কি কথা তোমাবিনা কেমনে পরাণ ধরি ?
ভুলান প্রাণের কথা বহি সদা ভগ্ন প্রাণে —
তো'র স্মৃতি টানে প্রাণ, ছোটে বলে তো'রি পানে।
বাক্যে নয়, চখে নয়,—মিশামিশি প্রাণে প্রাণে ;
কত বা মনের কথা কত দিন কত স্থানে।
কাঁদিলে কাঁদিতে সদা কত যে প্রবোধ দিতে ;
বলিলে দিলাম প্রাণ, যবে প্রাণ এলে নিতে!
আগে না কহিলে কথা নিতি অভিমান হ'ত ;
আজি(ও) সব আছে মনে তখন সেধেছি কত!
তিলমাত্র অদর্শনে কাতর হইবে ব'লে ;
বাহিরিতে আগুলিতে পথ নিতি কতছলে।
সজল নয়নে কভু মুখ খানি ক'রে ভার,
বলিতে—'দিব না যেতে'—পারি নাই যেতে আর!
দুদিনে কি সেই সুখ কখন ভুলিতে পারি ;
তুমি যদি ভুল তবু আমি যার, রব তা'রি!
প্রণয়ের রীতি এই যত হৃদি ভেঙ্গে যায় ;
যে ভাঙ্গে কে জানে? তা'রে ততই পরাণ চায়!
কেন তবে বিধুমুখি! হেনকথা কহ আজ ?
বিনাদোষে বিতাড়িত সকলি বিধির কাজ।"
মুখ খানি চাপি' মম কিশলয়-করতলে ;
সহসা কহিল বালা তিতি আর আঁখিজলে ;—
"সে কি কথা, কেন আর? আমি ত বলিনি তাহা!
অভাগিনী ভাগ্যদোষে ঘটিল কপালে যাহা।
তুমি যা'র র'বে তা'রি, আমি কি পরের হ'ব ?
যা'র হই তা'র হই, আমি ত তোমারি রব।

অভাগিনী লাগি' তোমা বিতাড়িত হ'তে হ'ল ;
সে দুঃখ কোথায় আর কেমনে ভুলিব বল!
যে হতে গিয়েছ নাথ! সদাই ত পাগলিনী ;
ছট্‌ ফট্‌ করি যেন পিঞ্জরেতে বিহঙ্গিনী!
বুঝি না বিধির বিধি, এ কেমন রীতি তাঁ'র ;
আশৈশব ভালবাসা এ কি তার পুরস্কার ?
বুঝেছি যাতনা তা'রি যাহারি সরল প্রাণ ;
নহে কেন মরমের দহে অন্ততম স্থান!
বুঝেছি শৈশব আশা বড়ই ছলনাময়,—
সুখময় আগে, শেষে সকলি অপূর্ণ রয়!
কিন্তু নাথ! বল বল, এমন কি কিছু নাই ;
অতীতের স্মৃতিগুলি যাহাতে ভুলিতে পাই!
আছে নাথ! আছে আছে তুমি কি জান না তা' ;
ঘুচাতে এ জ্বালা আর মৃত্যুবিনা কিছু না।
এখনি ত্যজিব তবে—এ দগ্ধ অসার দেহ ;
প্রাণভরে ভালবেসে কখন কি বাঁচে কেহ ?
কেন কাঁদে পোড়া মন অতীতের সুখতরে ;
পরের প্রাণের ব্যথা কভু কিরে বুঝে পরে!
সমানে সমানে প্রেম সদা সুখময় হয় ;
অসমানে অধীনেরে নিদারুণ দুঃখময়!
এত বলি' যেন প্রিয়া ভূমেতে পড়িল ঢ'লে ;
পড়িনু অবশে আমি "কি হ'ল" "কি হ'ল" বলে!
ভাঙ্গিল চেতনা তায় কাঁপে অঙ্গ থর থর ;
স্বপ্নভঙ্গে দেখি পড়ে সেই ভগ্ন খট্টাপর!

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

দুঃখিনী।

[কোনও সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সৌদামিনীর কথা।

আমার নাম সৌদামিনী। আমি কোনও সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ কায়স্থ-ঘরের কন্যা, আমার পিতার নাম বলিব না। আমাদের আদিম বাসস্থান ছিল * * * পুরে। এখন আমার অবস্থিতিস্থানও আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতে আমার অনিচ্ছা হয়, ইহাতে আপনাদের বোধ হয়, ততবেশী ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

আমি, আমার পিতা মাতার একমাত্র কন্যা,—পিতা মাতার বড় আদরের সামগ্রী ছিলাম। আমার বয়ঃক্রম যখন ৫ বৎসর, তখন আমার পিতা আহ্লাদ-পরবশ হইয়া তাঁহার বন্ধু, শ্রীযুক্ত * * বসুর পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দেন। শুনিতাম, আমার শ্বশুর মহাশয় আমার পিতার ন্যায়; বিপুল ধনের অধিকারী। আমি যখন বিবাহের পর একবার তাঁহাদের বাড়ীতে যাই, তখন আমার মনে পড়ে, সে বাড়ীটী বেশ বড় ও বড়লোকের বাড়ী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সে বার ফিরিয়া আসার পর, আমি আর সে বাড়ীতে যাই নাই। আমার বয়ঃক্রম যখন ১১ বৎসর, সমস্ত বিষয় কিছু কিছু বুঝিতে পারি,—এমন সময় একদিন শুনিলাম, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। মাতাঠাকুরাণী ও পিতাঠাকুর মহাশয় এ সংবাদে একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন, আমারও কেমন এক প্রকার হৃদয় খারাপ হইয়া গেল। দিনে সদাসর্ব্বদা অন্যান্য পাড়া প্রতিবেশীর কন্যাদের সহিত খেলাধূলায় একরকম থাকিতাম, কিন্তু একাকী থাকিলে আমার যেন মনের ভিতর কেমন করিত। সে কথা আমি কাহাকেও বলিতাম না, এক্ষণে বুঝাইতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই।

এই ঘটনার তিন চারি মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণী হঠাৎ জ্বর-

রোগে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই সময় আমি পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকেই অন্ধকার! আলোক আর নাই, যাহা ছিল,—টিপ্ টিপ্ করিয়া যাহা জ্বলিতে ছিল,—আজ তাহাও নিবিয়া গেল। মন বড়ই উচাটন হইল! দিবারাত্রি আমার চক্ষে অশ্রুধারা গড়াইত। এতদিন কোনও দুঃখ হইলে, মাতাঠাকুরাণী সান্ত্বনা করিতেন; কিন্তু এখন আমার প্রাণের এত দুঃখ দেখিয়াও, কেহই সান্ত্বনা করিত না। আপনি কাঁদিতাম, আপনিই শান্ত হইতাম। সময়ে সময়ে পাড়ার কেহ আসিয়া আমায় সান্ত্বনা করিত।

দুই চারি মাস করিয়া, এক বৎসর কাটিয়া গেল। পিতাঠাকুর মহাশয় পুনরায় বিবাহ করিলেন। নূতন মাতা, বয়সে প্রায় আমার সমান ছিলেন; উভয়ে মিলিল ভাল; কিন্তু যখন পূর্ব্বস্মৃতি মনে উদিত হইত, তখন আমি কাঁদিতাম। নূতন মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, সময় সময় দুঃখও করিতেন। কিন্তু সে মাতার মত আমাকে সান্ত্বনা করিতেন না, করিবেন কোথা হইতে? তিনিও ত আমার ন্যায় ছেলে মানুষ!

ক্রমে আমি বড় হইতে লাগিলাম, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাবনাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সংসার যেন আমার পক্ষে শূন্য বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু বুঝিয়া কি করিব? যাহা হইত, তাহাতেই সুখে থাকিতাম।

ক্রমে নূতন মাতার একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। পিতাঠাকুর মহাশয়কে এতদিনের পর, কিছু আহ্লাদিত বলিয়া বোধ হওয়াতে, আমিও কিছু আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু সে আহ্লাদ অধিকদিন থাকিল না। পিতাঠাকুর মহাশয় ভয়ানক রোগে শয্যাগত হইলেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি যাইতে লাগিল, পিতাঠাকুর মহাশয়ের রোগ আর আরাম হইল না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল মাত্র। পিতাঠাকুর মহাশয় প্রায় দুই মাসকাল রোগভোগ করিয়া অবশেষে কালের ক্রোড়ে জন্মের মত শান্তিলাভ করিলেন।

অসার সংসার আমার নিকট ভীষণতর অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পিতা-মাতা-শূন্য সন্তানের—বিশেষতঃ বিধবা কন্যা সন্তানের—কতদূর শোচনীয় অবস্থা হওয়া সম্ভব, তাহা বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি এই বহুজন পরিপূর্ণ সংসারে আজ একা—একা—একা!

কালের লীলা বিচিত্র। নূতন মাতা পিতার মৃত্যুর পর পিত্রালয় হইতে তাঁহার ভ্রাতা ইত্যাদিকে আনয়ন করতঃ আমার পিতার রক্ষিত জমীদারী-কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতে, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বুঝিয়া লইলেন। কর্ম্মচারীদিগকে কার্য্য হইতে অবসর দিতে লাগিলেন, আমার একজনমাত্র পরিচারিকা ছিল, তাহাকেও কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইল। যখন আমার পরিচারিকা, আমায় পরিত্যাগ করিবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া গেল, "দিদিমণি! অনেকদিন তোমার নিকটে ছিলাম, আজ চলিলাম—তবে আসি" তখন বাস্তবিকই আমার বড় দুঃখ হইল। বিমাতার উপর আমার মনে যেন কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা আসিয়া জুটিল। আমি আর এক রকম হইয়া গেলাম, আজ আমার একমাত্র সঙ্গের সাথী ছাড়িয়া গেল, আমি এই শূন্য পৃথিবীতে শূন্যমনে একা পড়িয়া রহিলাম!

ছোট মাতাঠাকুরাণী এখন যেন কেমন এক বিকৃত-ভাব ধারণ করিয়াছেন। পিতা জীবিত থাকিতে যেমন আমায় যত্ন ও স্নেহ করিতেন, এখন আর তেমন করেন না। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বোধ হইত, যেন তিনি আমাকে শত্রু মনে করেন। তা' তিনি যাহাই করুন, আমার ন্যায় লোকের তাঁহার মুখাপেক্ষী না হইয়া, স্বাধীনভাবে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি পিতৃমাতৃ-হীনা!! স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব,—সেই স্বামীরত্ন হইতে যখন আমি বিচ্যুত, তখন আমার স্বাধীনতা কোথায়? সুতরাং আমি এখন সম্পূর্ণ তাঁহার অধীন। তিনি যা' করেন, আমাকে তাহাতেই সম্মত হইতে হয়।

ক্রমে আমি দেখিলাম,—আমার পিতার সমুদয়ই আমার বিমাতার আত্মীয়স্বজনের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া পড়িল, আমি এখন তাঁহাদের মুখাপেক্ষী। তাঁহারা আমাকে যেরূপে রাখিয়া সুখী হন, আমি সেইরূপই থাকি। আমার কোনও আপত্তি নাই, আমি এখন আমার বিমাতার পিত্রালয়ে রহিলাম। এখানে আমার সহিত দুইটী লোকের পরিচয় হইয়াছে, একটী আমার বিমাতার ছোট ভগিনী—নাম শান্তিময়ী, অপর আমার বিমাতার মধ্যম ভ্রাতা—নাম হরলাল। এখন আমার কথার প্রথমাংশ শেষ হইল, ক্রমে অন্যান্য সকলের মুখ হইতে অন্যান্য সকল কথা শুনিতে পাইবেন। ক্রমশঃ—

মনুষ্য ও বিভিন্ন ধর্ম্ম।

জগৎস্রষ্টার কি চমৎকার কার্য্য। সে কার্য্যকলাপ বুঝিবার সাধ্য মানবের নাই। সেই অসীমের ভাবনা সসীমমানব কখন হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। এখন আমরা কি যেন দেখিয়াছি, তাই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ের সন্দেহ করি। তাই যেন ধর্ম্ম কথা শুনিতে ভালবাসি না—তাহারই জন্য বোধ হয়, আমরা এত বাজে গল্পপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। কি দেখিয়া আমরা এরূপ হইয়াছি? কেহ কি জান? নিশ্চয়ই জান। সকলেই জানে, সকলেই বুঝে, কিন্তু তাহা দূর করা দূরে থাক, বরং আমাদের নিকট তাহা ক্রমে ক্রমে প্রশ্রয় পাইতেছে। প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে—ক্রমে তাহা আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এই সর্ব্বনাশক আর কেহই নহে—ইহা বিভিন্ন ধর্ম্মভাব।

জানি না, আমাদের এ বিশ্বাস কতদূর সত্য। হইতে পারে, আমাদের এখনকার মনের ভাব অতি উচ্চ; তাহা অতি সুন্দর; কিন্তু আমরা সেটীতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

আজকাল চতুর্দ্দিকে বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়া, স্ব স্ব দলের পরিপুষ্টির জন্য, স্ব স্ব মতের পোষকতা করিবার জন্য, নানারূপ কৌশল প্রকাশ করিতেছে। চঞ্চলবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা কেহ কেহ তাহাতেই মত্ত হইয়া, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষপালিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া, নবধর্ম্মে সাহ্লাদে দীক্ষিত হইতেছে; পুরাতন ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতেছে। নবধর্ম্ম-মণ্ডলীর পাণ্ডারা সময়ে সময়ে এমন সকল সুন্দর কৌশলময়ী কথা প্রকাশ করেন যে, তাহা সময়ে সময়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও বিচলিত করিয়া ফেলে। বুদ্ধিমানেরাও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই সকল মতের পোষকতা করিয়া, সনাতন ধর্ম্মকেও সময়ে সময়ে অঙ্গহীন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে।

আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্ম্মই আমাদের সনাতন পবিত্র ধর্ম্ম। খ্রীষ্ট, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম আমাদের প্রীতিকর নহে। যিনি হিন্দু, তিনি যদি বুদ্ধিমান্ হইয়াও এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত হন, যদি হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা করেন, তিমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া, অন্ততঃ আমাদের নিকট পরিচিত হইতে পারেন না। আমাদের বিশ্বাস, 'যার এক ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, তাঁহার কোনও ধর্ম্মেই বিশ্বাস থাকিতে পারে না।' যিনি এক ধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপনে অশক্ত, যে পূর্ব্বপুরুষগণের রক্তে তাঁহার দেহ পোষিত, সেই পূর্ব্বপুরুষগণ পালিত ধর্ম্ম, যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি কি কখন বুদ্ধিমান্ হইতে পারেন? তিনি আমাদের মতে পৃথিবীর একটী অতি হেয় ও অধমজীব।

পরমপিতা, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় মনুষ্য-হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধর্ম্মভাব প্রদান করিয়াছেন। সকলকেই স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুগত থাকিয়া, তাহার উন্নতি করিতে বলিয়া দিয়াছেন। বিধর্ম্মীকে ধ্বংস করিতে, কিম্বা স্বধর্ম্মে মন্ত্রণা দিয়া আনিতে শিক্ষা দেন নাই, এবং তাহা তাঁহার অভিপ্রেতও নহে। আমরা দেখিয়াছি, যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারা কখন তর্কদ্বারা স্বীয়মতের সমর্থন করিতে প্রয়াস পান না, বরং তর্ককারীরই পরিপোষকতা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ যে, নিজ ধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ, কিন্তু পরধর্ম্মে আশুমুক্তি-লাভের ইচ্ছায় প্রবেশ করা উচিত নহে। মুক্তি কোন ধর্ম্মের পক্ষেই সহজ সাধ্য নহে। হুজুগে মুক্তিলাভ হয় না। ভক্তি চাই! ভক্তি চাই!! ভক্তি চাই!!! ভক্তি করিতে পারিলেই মুক্তি। ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য কোনও সুপ্রশস্ত পথ নাই।

ঠগী জীবনী।

আত্ম-পরিচয়। *

আমার নাম আমীর আলি। নৃশংস আচারে অনেক নরহত্যার পর, আমি ইংরাজ-রাজের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে, আমি ৭১৯টী নরহত্যা করিয়াছি। যদি আমি ইংরাজ-রাজ কর্ত্তৃক বন্দী না হইতাম, তাহা হইলে এইরূপে আমি কত নরহত্যা করিতাম, তাহা বলা যায় না। আমার জীবনী শ্রবণে সাধারণের কোন ফলোদয় আছে কি না, জানি না। তবে আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তা'ই আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। আজ আমি যদিও ইংরাজের হস্তে বন্দী, ইংরাজ-রাজের নিকটে নতশির, কিন্তু এখনও এক এক সময়ে আমার পূর্ব্বাবস্থার কথা মনে পড়িলে, মনে কত সাহস, কত উৎসাহ আসিয়া উপস্থিত হয়। এখনও এক এক সময়ে আমার এ দাসত্ব শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। আবার সেইরূপ একটী ঠগীদলের নেতা হইয়া, নর-নারীর জীবন-বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে সময় গিয়াছে, নৃশংস নরহত্যার আর তত প্রবৃত্তি নাই; কেবল সেই স্বাধীনতা টুকু আমি বড় ভালবাসি, সেইরূপে দেশে দেশে স্বাধীন পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হয়। নিজ জীবনের উপর এখন মমতা জন্মিয়াছে,—প্রাণের মায়া কত অধিক, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি; তা'ই আর পর-জীবননাশে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার মত কত ঠগীর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি; ইংরাজের হস্তে ধৃত হইয়া, আমারও ঐরূপ দশা একদিন হইতে পারে, তাহাও বুঝিয়াছি,—তা'ই এই দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি।

* "Confession of a Thug" by late Colonel Medows Taylor C. S. I. নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

ভারতবর্ষের মধ্যে যত ঠগী সম্প্রদায় আছে, তাহারা সকলেই এক সূত্রে বাঁধা। সকলেরই একই নিয়ম—একই চিহ্ন। ঠগী দলের মধ্যে আমি অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছি, তাহাদের আচার ব্যবহার আমি সমস্তই জানি। এমন কি শুধু চেহারা দেখিলেই আমি বলিয়া দিতে পারি যে, সে ব্যক্তি ঠগী-শ্রেণীভুক্ত কি না? ঠগীগণের উচ্ছেদ-সাধনে ইংরাজ-রাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তা'ই আমার দ্বারায় ঠগীগণকে ধৃত করিবার জন্য, তাঁহারা আমায় নিযুক্ত করিয়াছেন। শত সহস্র জীবনের বিনিময়ে, আমার নিজ জীবন রক্ষিত হইয়াছে, তাহাও আমি জানি। এ বিশ্বাসঘাতকতায় আমার পাপ আছে কি না, জানি না। কিন্তু কতকটা কর্ত্তব্য-বোধে ও কতকটা নিজ জীবনরক্ষার্থ, আমি এ কার্য্যে সহায়তা করিতেছি। আমি জানি, আমারই জন্য একদিন এ ভয়ানক নর-হত্যা প্রথা ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হইবে।

হোলকার রাজ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা মাতার কথা আমার তত মনে পড়ে না, কিন্তু তাঁহারা যে বড়লোক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ শৈশবাবস্থায় আমি অনেক স্বুবর্ণালঙ্কার পরিতাম, ও আমার জন্য দুই তিনজন দাসদাসী নিযুক্ত ছিল; তাহা এখনও আমার কিছু কিছু স্মরণ হয়। আমার একটী ভগিনী ছিল, তাহাকে আমি বড় ভালবাসিতাম। ইহা ব্যতীত আর আমার অন্য কথা বড় একটা মনে পড়ে না।

একদিন সহসা বাড়ীর সকলকে ব্যস্ত সমস্ত, বাক্স তোরঙ্গ বাঁধা-বাঁধি, অস্ত্র-শস্ত্রধারী লোকজনের সমাগম, হাঁকাহাঁকী ডাকাডাকি দেখিয়া, আমার মনে হইল যে, 'আমাদের বুঝি কোথায় যাওয়া হইবে।' বাস্তবিক ঘটিলও তা'ই। আমার মা' আমাকে লইয়া একখানি ডুলিতে উঠিলেন, চাঁপাবুড়ী (আমার দাসী) আমার ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়িল, এবং বাবা তাঁহার মস্ত ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক-গুলি অস্ত্রশস্ত্রধারী পুরুষও চলিল। আমার বোধ হয়, পিতা,

তাঁহাদের শরীর-রক্ষক হিসাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় কি চতুর্থ দিবসে, আমরা একটী বাজারের সরাইয়ে, সেই দিনকার মত বাসা লইলাম। আমার পিতা আমাদের তথায় রাখিয়া তাঁহার কি কার্য্যোপলক্ষে কোথায় চলিয়া গেলেন। সেই অপরিচিতস্থানে, আমার মাতা, আমায় বার বার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া, পথশ্রান্তি বশতঃ নিদ্রাগতা হইলেন। চাঁপা রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এবং অস্ত্র-শস্ত্রধারী পুরুষগণ আহারান্বেষণে বাজারে চলিয়া গিয়াছিল। ছেলে মানুষের মন, তখন কি আর অত শত জানি? কেহ আমায় বাধা দিবার নাই দেখিয়া, মাতাঠাকুরাণীর নিষেধ ভুলিয়া গেলাম। খেলা করিবার জন্য চুপি চুপি মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে পলাইয়া বাসা হইতে বহির্গত হইলাম। রাস্তায় কতকগুলি সমবয়স্ক বালককে খেলিতে দেখিয়া, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া খেলা ধূলা আরম্ভ করিলাম। এইরূপে যখন খুব লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ী, করিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়, অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈনিক-বেশপরিধৃত একজন লোক আমার হাত ধরিয়া, আদর করিয়া, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সে লোকটীকে দেখিতে বেশ সুন্দর, বলিষ্ঠ গঠন, বয়ঃক্রম ৩০।৩২ বৎসর। রাস্তার ছোট লোকের ছেলেদের সঙ্গে আমি খেলা করিতেছি, অথচ আমার পোষাক পরিচ্ছদ বড়লোকের ছেলের ন্যায়, গায়েও দুচারখানা স্বুবর্ণালঙ্কার দেখিয়াই বোধ হয়, সন্দিগ্ধচিত্তে তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আমার পরিচয় দিলাম, এবং আমরা যে ইন্দোরাভিমুখে যাইতেছি, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঠিক হয়েছে, তোমাদেরি কাল আমি তবে পথে দেখিয়াছিলেম। তোমরা সকলে একখানা ঢাকা গরুরগাড়ি করে আস্‌ছিলে না?" আমি তাঁহার কথা শুনিয়া রাগতভাবে উত্তর করিলাম, "কখন না; আপনি আমাদের দেখেন নি। মা পাল্কীকরে আস্‌ছিলেন, আমি তাঁর কোলে বসে ছিলেম; বাবা একটা বড় ঘোড়াচড়ে পাশে পাশে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলেন। চাঁপা আমার ছোট টাট্টু ঘোড়া চড়ে

পাল্কীর পিছনে পিছনে আস্‌ছিল, আর আমাদের শরীর-রক্ষক জোয়ানেরা আগে পিছনে ছিল। আপ্‌নি কি ভাবেন যে, আমার পিতা একজন বড় ধনী পাঠান বণিক হয়েও, সামান্য চাষালোকের মত আমার মা'কে গরুরগাড়ি চড়িয়ে দেশবিদেশে নিয়ে যাবেন?"

আমার কথা শুনিয়া, সেই অপরিচিত সৈনিক পুরুষটী বোধ হয়, যেন কিছু পুলকিত হইলেন। মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তিনি কহিলেন—"বেশ বেশ, তুমি যা' বল্‌ছো ত'াই ঠিক, আমার তবে দেখ্‌তে ভুল হয়েছিল। আর দিন কতক বাদে তুমিও তোমার পিতার মত বড় ঘোড়া চড়্‌তে পারবে, আমার মত তোমার কোমরে তলোয়ার ঝুল্‌বে—তুমি বেশ ছোক্‌রা। তুমি এত দৌড়াদৌড়ী কর্‌ছো, তোমার খিদে পায়নি? তুমি সন্দেশ খা'বে? দেখ ঐ দোকানে কেমন গরম গরম হালুয়া, আর জিলিপী তয়ের কচ্ছে, কত সন্দেশ বরফী সাজান রয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে যা'বে? এস, আমি তোমায় খাবার কিনে দিই।"

বালকের পক্ষে খাবারের লোভ, বিশেষতঃ সম্মুখেই দোকানে নানাবিধ মিষ্টান্ন সাজান দেখিয়া মনের অবস্থা যে কি হয়, তাহা বালক ভিন্ন আর কেহ অনুভব করিতে পারেন না। আমি বিনা-আপত্তিতে সেই সৈনিক পুরুষের সঙ্গে খাবারের দোকানে উপস্থিত হইলাম। তিনি, মনোহরা, সন্দেশ, বরফী, হালুয়া, জিলিপী, 'গজা ইত্যাদি নানাবিধ মিঠাই মোণ্ডা, একঠোঙা কিনিয়া আমার হাতে দিলেন। সে এত খাবার যে তাহা বহন করিবার শক্তিও আমার ছিল কি না সন্দেহ। আমার অবস্থা বুঝিয়া সেই সৈনিক পুরুষটী সেই সমস্ত খাবার একখানি বড় রুমালে বাঁধিয়া, আমার গলায় ঝুলাইয়া দিলেন; আমি বাসা-অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। যে সকল রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে আমি পূর্ব্বে খেলা করিতেছিলাম, তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিল। অনেক খাবার দেখিয়া বোধ হয়, তাহাদের যথেষ্ট লোভও হইয়াছিল। সৈনিক পুরুষটী আমায় খাবার কিনিয়া দিয়াই ভিন্নদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন,

আমিও বাসার দিকে আসিতেছিলাম। পথি-মধ্যে আমার উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল; রাস্তার ছেলেগুলো রাস্তার ছোট ছোট ইট কুড়াইয়া লইয়া আমার দিকে ছুঁড়িতে লাগিল। কেহ বা ধূলি-নিক্ষেপ করিল, শেষে তাহাদের মধ্যে একজন একটু বৈশী বলিষ্ঠ ও সাহসীগোছের ছোক্‌রা আসিয়া, আমার হাত ধরিয়া আমার খাবার কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। আমি তাহাদের সহিত অনেকক্ষণ হুড়াহুড়ি করিলাম, কিন্তু তাহারা অনেকগুলি এবং আমি একা, কাজেই পরাজিত হইলাম। তাহারা আমার নিকট হইতে খাবারগুলি কাড়িয়া লইল। একটী দুর্দ্দান্ত বালক ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, শেষে আমার কণ্ঠদেশ হইতে জোর করিয়া 'সোণার হার' কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। এইবার আমার বড় ভয় হইল, আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া সেই আগন্তুক সৈনিক পুরুষটী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, এবং আমায় সমূহ বিপদ্‌গ্রস্থ জানিয়া, দ্রুতবেগে আমার নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, সেই সকল দুষ্ট ছোক্‌রাগুলি খাবারের ঠোঙা ফেলিয়া পলাইয়া গেল। তিনি তখন আমায় আবার আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া, আমাদের বাসা বাটীতে রাখিয়া আসিলেন। আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে না দেখিতে পাইয়া, বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, আমাকে পাইয়া তাঁহার ভাবনা দূর হইল। চাঁপাকে তিনি কত তিরস্কার করিলেন, এবং আমি আর যাহাতে বাসা-বাটীর বাহির হইতে না পারি, তাহার জন্য সাবধান থাকিতে বলিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তা।

[তিরোরীর যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথ্বীরাজকে সুখভোগে ব্যসক্ত ও স্বপ্ন দর্শনে ভীত হইতে দেখিয়া সংযুক্তা তাঁহাকে যে উত্তেজক বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারই ভাবালম্বনে লিখিত।]

[১]

"এ জগতে তোমাসম চৌহান-তপন!
বিপুল ঐশ্বর্য্য কেবা ভুঞ্জিয়াছে এত?
তথাপি হ'ল না তব আশার পূরণ?
তথাপিও সুখলিপ্সা এত অভিপ্রেত?
নহিলে সামান্য স্বপ্ন হেরি' কি কারণ,
ভাবি-চিন্তা ভাবি মনে—হইলে কাতর?
দুর্নিবার এ নিয়তি হ'তে প্রাণেশ্বর!
দেবেন্দ্রের মুক্তিলাভে নাহিক শকতি;—
জনম গ্রহন শুদ্ধ মরণ কারণ।
মরণ কেবল জন্ম-গ্রহণ কারণ॥

[২]

"ভাবি' দেখ প্রাণনাথ! এই কলেবর——
ত্যজি' নবদেহ পা'বে বিধির বিধানে;—
ত্যজি' পুরাতন বাস, কে আছে—বর্ব্বর,
করে না বাসনা নব বাস পরিধানে?
বিনশ্বর কলেবর করি' উৎসৃজন,
সৎকার্য্য সাধন করি' গৌরব সহিত;
করেন মৃত্যুরে যিনি সুখে আলিঙ্গন;—
চিরকাল তরে তিনি থাকেন জীবিত।
নারী আমি কি বুঝাব? তোমারে রাজন্!
কর হে এখন দেব! বিহিত যেমন।

[৩]

"দিও না দিও না নাথ! দিও না হে স্থান;
অন্তরে তোমার কভু স্বার্থের বিষয়ে।
অমরত্ব লভিবারে উপায় প্রধান,—
যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ মর্ত্ত্যে প্রসন্ন হৃদয়ে;
অথবা বিজয়-লক্ষ্মী প্রসাদ অর্জ্জন।
অতএব অমরত্ব লাভে প্রাণেশ্বর!
প্রাণপণে অনিবার করহে যতন।
মোর জন্য ভাবিও না,—আমিও সত্বর,
তব অর্দ্ধাঙ্গের কার্য্য করিতে সাধন,
নিশ্চয় প্রস্তুত সদা থাকিব রাজন্!"

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

কালের প্রতি।

হে কাল! তুমি মহাকাল! তুমি অনাদি, অনন্ত, অসীম, অক্ষয় ও দুর্জ্ঞেয়! তুমি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। তুমিই এ অনন্ত সংসারের সর্ব্বনিয়ন্তা! তুমি এই সসাগরা সদ্বীপা মেদিনীমণ্ডলস্থ যাবদীয় স্থাবর ও জঙ্গমের সৃজন মরণ নিয়ামক। তুমি নিখিল জগত প্রসবিতা। আমরা শয়নে, স্বপনে, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে, যখন যে কোন পদার্থ দেখিতে বা শুনিতে পাই, সে সকল তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া, আবার তোমাতেই লয় পাইয়া থাকে। এ ত্রিগুণজাত জগদ্মণ্ডলের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের তুমিই একমাত্র কারণ, এবং সাক্ষাৎ ও সত্য প্রমাণস্বরূপ। তোমা ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা, সন্দেহ ও ঘোরপ্রমাদ সঙ্কুল। আমরা যাহা কিছু করি, সে সকলেরও তুমিই একমাত্র কারণ। একমাত্র তোমারই চক্রবৎ নিয়ত পরিভ্রাম্যমাণ ও পরিবর্ত্তনশীল নিয়মরাজির পরিচালনায় এ জগতের যাহা কিছু উন্নতি ও পতন সংসাধিত হইতেছে।

জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি, তুমি মহৎ হইতেও মহত্তর, তেজ হইতেও তেজস্কর। তোমার গতি প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারই নাই, এজন্য লোকে তোমাকে মহাদেব কহিয়া থাকে। যখন এই জগত গভীর তমোরাশির কোলে লুক্কায়িত ছিল, তখন একমাত্র তুমিই বিরাজমান ছিলে। কাল! তোমা হইতেই তোমার জ্যোতিঃ তেজঃপ্রভা পরিব্যাপ্ত করিয়া; সেই সূচীভেদী অনন্ত নিবিড় আঁধার বিনাশ করতঃ এই চরাচর সৃষ্টি করিল। এই অনন্ত জড়পিণ্ড তোমার সেই প্রচণ্ডশক্তির প্রভাবে ক্রমশঃই বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে ও অণু পরমাণুর পরস্পর সংযোগে এই অনন্ত বিরাটবর্ত্তুলের সৃষ্টি করিতেছে।

তুমি ইচ্ছাময়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, রবি, চন্দ্র, তারা, এ সকলই তোমার ঐ অপার ও অচিন্ত্য ইচ্ছার ফল। তুমি ত্রিগুণময়, আমরা তোমার অনন্তরূপ মনশ্চক্ষে সন্দর্শন করতঃ তোমারই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও সারাৎসার এবং ভয়ানক হইতেও ভয়ানক, প্রচণ্ড প্রভাব-পাদমূলে ধূলিবৎ লুণ্ঠিত হই। মনুষ্য হউক, আর দেবতাই হউক, তোমার পরিচালনানুসারে সকলকেই পরিচালিত হইতে হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এ সকল, তোমার ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। যখন তুমি সৃজন কর, তখন তোমাকে রজোগুণাধার পরমব্রহ্ম, যখন তুমি পালন কর, তখন তোমাকে সত্ত্বগুণাধার নারায়ণ, আর যখন মৃত্যুরূপে প্রাণীগণকে বিনাশ কর, তখন তোমাকে তমোগুণাধার সাক্ষাৎ মহারুদ্র বলিয়া জানি। এ জগতে সকলই নশ্বর, কিন্তু তোমার মরণ নাই, এই জন্য লোকে তোমাকে মৃত্যুঞ্জয়, এবং তুমি প্রাণীগণকে মৃত্যুরূপে সংহার করিলেও আবার যখন তাহাদের মঙ্গলের জন্য, শত শত সুখস্বচ্ছন্দতার উপযোগী পদার্থ সমূহের নিয়ত সৃষ্টিবিধান করিতেছ, তখন তোমাকে পরম শিবময় বলিয়া থাকি। তুমি একে তিন ও তিনেই এক।

চেতন অচেতন উদ্ভিদ প্রভৃতি সকলই তোমার খেলার সামগ্রী। বালক যেমন আপন ইচ্ছামত ধূলা হইতে কর্দ্দম, এবং কর্দ্দম হইতে ক্রীড়ার দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করে, তেমনই এই অনন্ত ও অবিরাম

বিঘূর্ণায়মান বিরাটবর্ত্তুল তোমার ইচ্ছা-প্রসূত ক্রীড়নক মাত্র। আবার যেমন খেলার পরিশেষে, বালক সাধের ক্রীড়নক ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, সে ক্রীড়নক যে ধূলা সেই ধূলাতেই মিশিয়া যায়, কিন্তু বালক বর্ত্তমান থাকে, তেমনই তোমার লীলা-খেলার অবসান হইলে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবার সেই অণু হইতে অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশে মিশিয়া যাইবে, কিন্তু কেবল একমাত্র তুমিই তখন বর্ত্তমান থাকিবে। কি ধনী, কি দুঃখী, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি সভ্য, কি অসভ্য, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি রাজা, কি প্রজা কেহই রক্ষা পাইবে না; সকলেই তোমার পবিত্র সূক্ষ্ম সুবিচার প্রভাবে শান্তিময় সমতার কোলে মিশিয়া যাইবে। দুঃখ, শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, হাসি, কান্না তোমাতে উৎপন্ন হইয়া, একদিন আবার তোমাতেই মিশিয়া যাইবে। তাই বলি কাল! তোমার কি চমৎকার নিয়ম! তোমারই নিয়মে, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, উন্নতির পর পতন, পতনের পর ক্রমিক উন্নতি; নিদারুণ শীতের পর বসন্তের প্রফুল্ল মধুর মলয় হিল্লোলে লতাকুসুম-কলিকার তালে তালে হাসি ও নৃত্য, পর পর কেমন নিত্য এ জগতে আসা যাওয়া করিতেছে! আশার পর দুরাশা, পূর্ণত্বের পর ভগ্নতা, মানব হৃদয়কে কেমন জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে! কে বলে মানুষ বলশালী ও বুদ্ধিমান্? তাহার বলবুদ্ধি সকলই ত তোমার কাছে পরাভূত। নহিলে মানুষ প্রবল হইয়াও দুর্ব্বলের নিকট পরাভূত হয় কেন? বুদ্ধিমান্ মূর্খের নিকট অবমানিত হয় কেন? কে বলিবে, একমাত্র তোমার প্রভাবই ইহার হেতু নয়? আজ যে তোমার স্নেহে হাসিতেছে, কাল সে হয় ত তোমার বিকট ভ্রূকুটীর ভীষণ তাড়নে কাঁদিয়া বেড়াইবে। আজ যে তোমার কৃপায় সুখনিকুঞ্জে বসিয়া কত মনোমোহন স্বপ্ন দেখিতেছে, কাল তোমারই কৃপায় তাহার সে সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে! আজ যাহা বর্ত্তমানকাল, তাহা অতীতের আঁধার বিমানে মিশিয়া যাইবে! এইরূপে ভবিষ্যতে যাহা আসিবে, তাহাও আবার অতীতে মিশিয়া যাইবে! কেহ তাহাকে জীবন্ত রাখিতে পারিবে

না। স্নেহ, মায়া, সুখ, হাসি, সাধ, কান্না সকলই ক্রমে তোমার নিকট পরাভূত হইয়া, কোথায় চলিয়া যাইবে! শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

"বিকাশে"—রসময়। *

বর্ত্তমান সময়ে 'পদ্যনদী'র জল কাণায় কাণায়। মাঝে মাঝে তাহার উপর আবার বন্যা—সাহিত্য-জগৎ ডুবে ডুবে গোছ হইয়া পড়িয়াছে! যেরূপ দম্‌কা বাতাস উঠিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বনাশের আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত! আজকাল যত্র তত্র কবি-পুরুষ আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদের "ইচ্ছাময়ীছন্দে"—"বাঞ্ছাময়ীতালে" কবিতা লিখিয়া ধন্য হইতেছেন। অদ্য আমরা এরূপ গুণসম্পন্ন কোনও কবিতার বিষয় বলিবার নিমিত্ত এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

"বিকাশ"—একখানি মাসিকপত্র। মহাকবি কি অতিকবি (কি বিশেষণে বিশেষিত করিব ভাবিয়া পাই না) শ্রীলশ্রীযুক্ত রসময় লাহা বাহাদুর মহাশয় তাহার একজন 'ভেনারেবল্' লেখক। এই কবিবর "বিকাশে" "শৈশবস্মৃতি—আত্মার অবিনশ্বরতা" শীর্ষক আট-পৃষ্ঠাব্যাপী এক পদ্য লিখিয়াছেন! পদ্যটী Wordsworth লিখিত "Intimations of immortality—From recollections of Early Childhood." হইতে অনুবাদিত। রসময় বাহাদুর Wordsworth এর পদ্যটীকে স্বলেখনী-বলে, নূতন ও নবভাবে বিকাশিত করিয়াছেন। পড়িয়া বোধ হইল, তিনি নিজেই বাঙ্গালার Wordsworth? আমরা মূর্খ, সুতরাং এরূপ পদ্য পড়িয়া বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। বলিতে কি, আমরা পদ্যটী পড়িয়া মূর্খের বেহদ্দ হইয়া পড়িয়াছি; কারণ পদ্যটী পড়িয়া আমরা না পাইলাম ভাব, না পাইলাম মিষ্টত্ব, না পাইলাম ছন্দের নাম। এক কথায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই; শৈশবস্মৃতির কোনও স্মৃতিই আমাদের মূর্খ হৃদয়ে উদিত হইল না—আত্মার অবিনশ্বরতার প্রমাণও আমাদের জ্ঞানহীন চক্ষু, খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। পাঠক মহাশয়দিগকে পদ্যের কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি বুঝুন। কবি ৩য় প্যারায় বলিতেছেন;—

এবে বিহঙ্গেরা যবে প্রীতি গীত গায়,
মৃগ শিশু নাচে যবে,
তালে তালে বংশীরবে,
হইল বিষণ্ন মম অন্তর তখনি;
দুঃখ প্রকাশিনু শান্তি লভিনু অমনি,
আবার হইনু সুস্থকায়।
নির্ঝর দুন্দুভিনাদে, গিরিহতে আনন্দে বাহিত;
দিব না আসিতে মনে দুঃখ এ সময়।
শুনিতেছি প্রতিধ্বনি শৈলগর্ভে হতেছে মিলিত.
ঘুমন্ত প্রান্তর হতে সমীরণ বয়।
ধরাতল আনন্দে মগন;
স্থল, জল,
আনন্দের মাঝে অঙ্গ করেছে অর্পণ,
বসন্তের প্রাণের সহিত,
লভিছে বিরাম প্রাণিগণ!
আনন্দে বিহ্বল, আনন্দের ধ্বনি, চৌদিকে আমার কর আমি শুনি,
সুখী তুমি রাখাল-নন্দন!

পাঠক কি বুঝিলে, বল; নতুবা তুমিও আমার মত মূর্খেরদলে পড়িয়া যাইবে! এরূপ ছন্দ, পাঠক! তুমি কখন দেখিয়াছ? আমি জানি ও দেখিয়াছি; তা'ই আমি নাম দিয়াছি, "রসময়ীছন্দ"। তোমার কোনও আপত্তি আছে কি?

আমাদের স্থান সীমাবদ্ধ ও অল্প সেইজন্য এহেন কবির কবিতা; আমরা আমাদের পাঠকগণকে সম্পূর্ণরূপে উপহার দিতে পারিলাম না, তজ্জনিত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এই কবি রসময় আপন "রসময়ীছন্দে" পূর্ব্বে অনেকবার "সুবোধিনী"কে রসময়ী করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, আমরা "বিকাশে" প্রকাশিত অন্যান্য সুন্দর প্রবন্ধগুলির মধ্যে এহেন উদ্ভট "রসময়ীছন্দের" কবিতা দেখিয়া বাস্তবিকই বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আশা করি, ভবিষ্যতে "বিকাশের" কর্তৃপক্ষগণ, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন বিষয়ে কিছু মনোযোগী হইবেন।

---

* পৌষ মাসের "বিকাশে" শ্রীরসময় লাহা প্রণীত, "শৈশব স্মৃতি—আত্মার অবিনশ্বরতা" শীর্ষক পদ্য-প্রবন্ধের সমালোচনা।

সমালোচনা।

"দারোগার দপ্তর" ২২শ এবং ২৩শ সংখ্যা। পুস্তক দুইখানির নাম যথাক্রমে "বিষম সমস্যা" ও "বলিহারি বুদ্ধি!" পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এ গুলিও সুখপাঠ্য ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

এমারেল্‌ড থিয়েটার। আমরা উক্ত রঙ্গমঞ্চে "মাধবী-কঙ্কণের" অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। জেলেখা, হেমলতা; নরেন্দ্রনাথের অভিনয় বেশ সুন্দর হইয়াছিল। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যা' তা' অসার পুস্তক অভিনয় না করিয়া, এইরূপ উত্তম উত্তম পুস্তক অভিনয় করিলে উপকার আছে।

সিটি থিয়েটার। চতুর্দ্দিকে সকল পত্র-পত্রিকাদির মুখে "সিটি রঙ্গমঞ্চের" বিলক্ষণ সুখ্যাতি শুনিয়া, আমরা একদা "চৈতন্যলীলা" ও "বেহদ্দ-বেহায়া" অভিনয় দেখিতে যাই। প্রথমেই "বেহদ্দ-বেহায়ার" অভিনয় হয়। অভিনয় দেখিয়া আমরা 'হরিষে বিষাদ' লাভ করিয়াছি, মুখে মুখস আঁটিয়া সং নাচা আমরা অনেক দেখিয়াছি,—এ স্থানেও সেটী দেখিতে পাইলাম। জানি, মুখোস মুখে দিয়া কেহ কথা কহেন না, এদের সেই অবস্থায় গান! সে গান ত আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। "সুলভ দৈনিক" বলিয়াছিলেন, "যদি বসন্তের কোকিলের আওয়াজ শুনিয়া মনপ্রাণ প্রফুল্ল করিতে চাও, তবে সিটিতে যাও" কিন্তু দুই একস্থান ছাড়া আমরা উক্ত প্রকার বিশেষণে বিশেষিত করিবার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। চা-ওয়ালী, বিস্কুট-ওয়ালী, ও জুতাশেলাই-ওয়ালীর গান সুন্দর হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন প্রায় সমুদয় গানগুলিই বায়সবিনিন্দিতস্বরে গীত হইয়াছিল। পরে "চৈতন্যলীলা"। ইহার অভিনয় আমরা পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ 'হতভাগা' অভিনয় আর কখনও দেখি নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জানি না, বিখ্যাত বিখ্যাত পত্রপত্রিকা সম্পাদকেরা কি দেখিয়া "সিটির" প্রেত সিটি বাজান! যাহা হউক, সিটির সুখ্যাতি করিবার আমরা অন্তত সেদিন কিছুই দেখিতে পাই নাই।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } চৈত্র, ১৩০০ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

কোথা' দয়াময়!

ক্রমশঃ আঁধার-রাশি ঘনা'য়ে আসিল!
ল'য়ে পাপ-মন-তরি,
বিপদ হইল ভারী—
ভবসিন্ধু মাঝে বুঝি তরণী ডুবিল!
'গোঁয়ার' নাবিক ছটা
সদাই জুটায় লেঠা!
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্র মন, নিজবশ নয়!—
তরঙ্গের অনুকূলে,
নিশিদিন ঢলে ঢলে,
হারা'য়েছে নিজবল—দুর্ব্বল হৃদয়!
উপায় দেখিনে কোন,
হইয়াছি উচাটন,
কি করিলে কি ঘটিবে?—বড় নিরাশ্রয়!

আর বেশী দেরি নাই,
কি করিলে রক্ষা পাই?
দয়াময়!—দয়াময়!—কোথা' এ সময়?
দীন অতি অভাজন,
তাহে পাপে অনুক্ষণ,—
দহিতেছে এ জীবন, করহ উদ্ধার!
কৃপাময় তব নাম,
না করিলে কৃপাদান,
কলঙ্ক পড়িবে নাথ! নামেতে তোমার!

শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়।

রমণীর দুই মূর্ত্তি।

হে মহাশক্তির অংশরূপিণী, ভবার্ণবের তরণী, রমণী! অধম আমি তোমার মহিমা কিরূপে জানিব? জানিবার শক্তিই বা কোথায়? মহামতি মনস্বিগণ, গভীর গবেষণায়, যাঁহার চরিত্রবর্ণনে অক্ষম, বর্ণনা করা দূরে থাকুক, যাঁহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতেও পারেন নাই; আজ আমি কোন্ সাহসে, কোন্ শক্তিতে, সেই শক্তিরূপিণীর শক্তিবর্ণনে অগ্রসর হইব? কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া, আজ সেই রমণী-চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব? আমার এই আশা দুরাশামাত্র, অথবা "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

পুরাকালীন মহর্ষিগণ, তোমার চরিত্র-বর্ণনে চেষ্টা করিয়াও, বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। বহু কষ্টে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া, শেষে বলিলেন,——

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং।
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥"

তবেই দেখ, যাহার চরিত্রবর্ণনে দেবতারাও অক্ষম, আজ এই ক্ষুদ্র পতঙ্গের সেই কার্য্যে উদ্যোগ কেন? পতঙ্গ হইয়া, আজ সাক্ষাৎ অনলরূপিণীর কোপাগ্নিতে পড়িবার ইচ্ছা কেন? পতঙ্গের এ ইচ্ছা মরিবার জন্য।

বামা-কুল-কোপাগ্নিতে প্রাণ যায়, যাউক, আমি কিন্তু "হে সংসার মরুর ওয়েসিস্‌রূপিণী! হে পুরুষ-মাতঙ্গের অঙ্কুশরূপিণী, লীলাময়ি! আজ তোমার অদ্ভুত লীলার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব—তোমার প্রকৃত ও বিকৃতভাব, তোমার স্বভাব ও ভঙ্গভাব, তোমার সৃষ্টিস্থিতি-শক্তি ও সংহারিণী-শক্তি, আজ যথাশক্তি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। যথার্থ কথায়, কেহ কখনও রাগ করে না, অন্যায় না বলিলে ত তুমি আমার উপর রাগ করিতে পারিবে না?

এক কথায় বলিতে হইলে, তুমি নানারূপ-ধারিণী, নিত্য নব নব রূপ ধারণ করিতে পার। তোমার প্রকৃতি, প্রকৃতির ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। জগতে সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল, তুমি যে জগতের কেন্দ্র-স্বরূপা, তবে তুমিই বা এই নৈসর্গিক নিয়মের বশীভূত কেন না হইবে? তোমার বহুমূর্ত্তি সত্বেও, তোমার দুই মূর্ত্তিই প্রধান। এই দুই মূর্ত্তিতেই তোমার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই মূর্ত্তিতেই তুমি সংসারে প্রতিনিয়ত নয়নপথে পতিত হইয়া থাক। এই দুই মূর্ত্তির অনেক কীর্ত্তি ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তোমার এই দুই প্রধান মূর্ত্তির নাম দেবীমূর্ত্তি ও পিশাচী মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তিতে তুমি আনন্দময়ী, সৃষ্টিস্থিতিকারিণী, অন্য মূর্ত্তিতে তুমি সংহারকারিণী ভৈরবী। এক মূর্ত্তিতে তুমি জননী হইয়া, জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, অন্য মূর্ত্তিতে তুমি রসরঙ্গিণী হইয়া, জগৎ রসাতলে দিতেছ। এক মূর্ত্তিতে তুমি সংসার-দুঃখ-সন্তপ্ত-জন-গণকে নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিতেছ, ধর্ম্মপ্রাণে প্রণোদিত করিতেছ; আবার অন্য মূর্ত্তিতে সংসার-সংগ্রামক্ষেত্রে রণরঙ্গিণীবেশে লোল-জিহ্বায় নরশোণিত পান করিয়া নর-মুণ্ডমালিনী হইতেছ। তোমার এক মূর্ত্তিতে এই সংসার স্বর্গ, তোমার প্রেমে প্রেমময়, তোমার আনন্দে আনন্দময়, তোমার স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত; আবার তোমার অন্য মূর্ত্তিতে এই সংসার বিস্তৃত শ্মশান! তোমার পৈশাচিক অট্টহাস্যে

নিনাদিত, ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে কম্পিত ও প্রাণ আকুলিত! এ—তোমার ভৈরবী করালমূর্ত্তিতে যেন জগৎ মৃত ও শবরূপে তোমার পদতলে পতিত। একা তুমিই, স্থান কাল ও পাত্রভেদে এই দুই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক; সংসারে আমরা তোমার এই দুই মূর্ত্তির লীলা প্রত্যহই দেখিতে পাই।

ওই যে লজ্জাবতী লতাটী, সংসার উজ্জ্বল করিয়া গৃহস্থের গৃহ আলোকিত করিয়া, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া পীড়িতের পার্শ্বে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছে, এই সরলতাময়ী, প্রেমময়ী মূর্ত্তিটী কি তোমার দেবী মূর্ত্তি নয়? যে মূর্ত্তিতে তুমি মধুমাখা কথায়, সংসার-সংগ্রাম-কাতর জনগণকে উৎসাহিত করিতেছ, অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী হইয়া অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বোধ করিতেছ, নিজের সত্বা অপরের সত্বার সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছ, সহধর্ম্মিণী হইয়া নিয়ত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করাইতেছ,—এই স্বর্গীয় মূর্ত্তিটীই কি তোমার দেবীমূর্ত্তি নহে? তুমি যে মূর্ত্তিতে, পরমা-প্রকৃতির আদর্শস্বরূপে নিজ শোণিত দিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতেছ, এই স্নেহময়ী বিশ্বজননী মূর্ত্তিই কি তোমার দেবীমূর্ত্তি নহে? আবার গৃহলক্ষ্মী! তুমি যখন অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে স্বহস্তে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পরম পরিতোষে আহার করাইতেছ, স্বীয় শরীর-নিঃসৃত সুধায়, শিশুর প্রাণ রক্ষা করিতেছ; তখন তোমায় সাক্ষাৎ দেবী না বলিয়া, আর কি বলিতে পারি? তোমার যে হৃদয়, স্নেহ, মায়া ও করুণার আধার, তোমার যে হৃদয় নবনীতসদৃশ সুকোমল, সেই হৃদয়পটে যখন তুমি আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া, অকাতরে, সংসার-সুখ-ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া,—স্বামীর চিতানলে ভস্মীভূত করিয়া—সতীত্বধর্ম্মে জগৎ আলোকিত করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিতেছ, তখন কে বলিবে, তুমি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নহ?

আবার ওই যে তুমি করালমূর্ত্তিতে নর-শোণিত-পিপাসু হইয়া, শাণিতছুরিকা স্বামীবক্ষে প্রবেশ করাইতেছ, উন্মাদিনীবেশে সোণার সংসার ছারখার দিয়া, প্রাণাধিক-প্রিয় সন্তানের মায়া বিস্মৃত হইয়া,

উপপতির অনুগামিনী হইতেছ, সেই মূর্ত্তি কি তোমার পিশাচী মূর্ত্তি নহে? সেই মূর্ত্তিতে তুমি কত নির্দ্দোষ মানবের শোণিতে ধরণী সিক্ত করিয়াছ! সেই মূর্ত্তিতে তুমি কত সোণার সংসার ছারখার করিয়াছ! সেই মূর্ত্তিতে তুমি প্রাণ-সম সন্তানের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, কুলে কালিমা লেপন করিয়া, লজ্জার মাথায় পদাঘাত করিয়া, কুল-কলঙ্কিনী হইয়াছ—সেই সংহারিণী উগ্রচণ্ডামূর্ত্তিকে কি পিশাচীমূর্ত্তি বলিতে পারি না? যখন তুমি কুহকিনীবেশে, মোহিনী-মন্ত্রে মায়াজাল বিস্তার করিয়া, পুরুষ-সিংহকেও পদানত কর; পাপ-মন্ত্রণায় ভ্রাতৃবিরোধরূপ সংসারনাশক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সংসার ছারখার করিয়া ফেল; পদানত পুরুষকে পাপে বিমোহিত করিয়া, ধ্বংসের পথে, নরকের পথে—সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর করাও; তখনই তোমার পিশাচীমূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ। তখন তোমার সেই ভয়ঙ্করীমূর্ত্তির দিকে তাকাইলে আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে। আবার যখন তুমি আসবপানে আরক্ত-নয়না, দিগম্বরী মূর্ত্তিতে কুৎসিত সঙ্গীতে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, পাপাশয়গণের পাশব-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতেছ; যখন তুমি হাব, ভাব, কটাক্ষাদি আয়ুধ ধারণ করিয়া, করালবদনে যেন জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যতা হইতেছ; তখন তোমায় পিশাচী না বলিয়া, আর কি বলিতে পারি?

ওই যে তুমি ম্যাক্‌বেথের পত্নীরূপে তদীয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, নির্দ্দোষ-নর-শোণিত পান করিবার জন্য তাহাকে কতই উৎসাহিত করিতেছ! তাহাকে ধর্ম্মভীরু জানিয়া, কতই তিরস্কার করিতেছ, আবার কতই প্রলোভন দেখাইতেছ; সেই মূর্ত্তিটীই তোমার পিচাশীমূর্ত্তি। ওই যে মূর্ত্তিতে তুমি পত্নীবেশে রোম সম্রাট্ ক্লডিয়ামের খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিতেছ! ওই যে মূর্ত্তিতে তুমি কৎলু-খাঁর বক্ষে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া, পদভরে মেদিনীকম্পিত করিয়া বহির্গত হইতেছ; রণরঙ্গিণি! বল দেখি, সেইটী তোমার কোন্ মূর্ত্তি?

তোমার এই দুই মূর্ত্তির মধ্যে প্রথমটীই তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি, আর দ্বিতীয়টী প্রথমটীর বিকৃতিমাত্র। স্বভাবের সকল বস্তুরই এই প্রকৃত ও বিকৃত ভাব আছে। যাহা স্বভাবজ, তাহাই প্রকৃত; আর যাহা প্রকৃতের রূপান্তর, তাহাই বিকৃত। তোমার প্রথমোক্ত মূর্ত্তিটীই স্বভাবজ, সুতরাং প্রকৃত; আর শেষোক্তটীই বিকৃত। যখন সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমপুরুষ, প্রকৃতি-রূপিণী তোমায় সৃষ্টি করিয়া, তোমার সহিত চলক পুটের ন্যায় সংমিলিত থাকিয়া, জগৎ সৃষ্টি করিলেন, আর যে নিয়মে আজিও প্রকৃতি পুরুষ সংমিলনে সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে, সেইটী তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি। দেশ, কাল, পাত্রভেদে তোমার সেই প্রকৃতমূর্ত্তি রূপান্তরিত হইয়াই বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে।

কালবশে, যুগধর্ম্মে, সমস্ত বিকৃত, সুতরাং তোমারও সেই বিকৃত মূর্ত্তির বিকাশ। এই অসত্য যুগে,—এই দুর্দ্দিনে, তোমার সেই স্বর্গীয় মূর্ত্তি, তোমার সেই অন্নদামূর্ত্তি, তোমার সেই শান্তিময়ী গৃহ-লক্ষ্মীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। যে মূর্ত্তিতে তুমি গৃহ উজ্জ্বল কর, যে মূর্ত্তিতে তুমি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া, জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত কর। যে মূর্ত্তিতে তুমি সহধর্ম্মিণী হইয়া,—অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়ত ব্যাপৃত থাক, তোমার সেই অলোক-সামান্য, নয়ন-মন-মুগ্ধকরী আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজিত হও, সেই জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতেই জগতে অধিষ্ঠাত্রী হও, সেই গৃহলক্ষ্মীমূর্ত্তিতে একবার গৃহে গৃহে অবস্থান কর। পাপময় ধরণীকে, স্বর্গের নন্দন কাননে পরিণত কর। এই তমসাচ্ছন্ন সংসার শ্মশানে, আর তোমার পিশাচী মূর্ত্তি প্রকাশ করিও না; চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়! আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে!! তোমার সেই প্রচণ্ডাভৈরবীরূপ সম্বরণ কর—সম্বরণ কর।

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

দুঃখিনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তিময়ীর কথা।

আমার নাম শান্তিময়ী। আমি এখন সৌদামিনীর সহচরী—সখী। সৌদামিনী আমার অপেক্ষা বয়সে প্রায় ৪।৫ বৎসরের বড়। সৌদামিনী আমাকে বিলক্ষণ স্নেহ করেন, আমি তাহাকে নাম ধরিয়াই ডাকিয়া থাকি। তাহাতে আমাতে সর্ব্বদা একস্থানে বাস, একস্থানে খেলা, সকলই একস্থানে হইয়া থাকে। কিন্তু ভোজন একস্থানে হয় না; সৌদামিনী নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, আমিও এক একদিন তাহার সহিত নিরামিষ খাই, কিন্তু সে এক-দিনও আমার সহিত আমিষভোজন করে না। যাহা হউক, আমরা দুজনে আছি, একরূপ মন্দ নয়।

একটা কথা, বলিতেও লজ্জা করে—আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার স্বামী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসেন। সৌদামিনী তখন আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, কিন্তু আমার স্বামী সেটা যেন ভালবাসেন না। তিনি সৌদামিনীকে বড় স্নেহ করেন। আদর করিয়া ডাকিলে, সৌদামিনী নিকটে আসে না, দূরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে থাকে। প্রথম প্রথম দিন-কতক এইরূপ হইত, কিন্তু শেষে সৌদামিনী আমার স্বামীর সহিত মাঝে মাঝে দুই একটী কথা কহিত।

আমার দিদি (সৌদামিনীর বিমাতা) এখন বেশ আছেন। তাহার রকম সকম দেখিয়া, আমার মনে যেন কেমন এক প্রকার ভাবের উদয় হয়। তিনি দিব্য ফিটফিটে হইয়া, সদাসর্ব্বদা থাকিতে ভাল-বাসেন। তাহার পুত্রটী এখন একটী ঝির রক্ষণাধীনে থাকে। তিনি সৌদামিনীকে যখনই দেখেন, তখনই যেন ভ্রূকুঞ্চিত করেন; আমি সেটা স্পষ্ট দেখিতে পাই। সৌদামিনী যে দেখিতে পায় না, এটা

ত আমি কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না। এক এক সময় আমি দেখি কোনও কারণ নাই, অথচ সৌদামিনী কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে, কোনও সন্তোষজনক উত্তর দেয় না। আমি তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, এ সকল দিদির বিড়ম্বনার ফল।

আজ আমার স্বামী আসিলেন। আসিয়াই তিনি আমাকে সৌদামিনীকে ডাকিতে বলিলেন, আমি সৌদামিনীকে ডাকিলাম, সে আসিল। স্বামী তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন, "সৌদা! তোমার সহিত আমার আজ অনেক কথা আছে,—অবশ্য দরকারী কথা। তুমি যদি সকল কথার উত্তর দেও, তবে বিশেষ সন্তুষ্ট হই।"

সৌদামিনী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিল।

ক্রমে আমার স্বামী, তাহাকে তাহার পূর্ব্বের সমুদয় বিষয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিতে আদেশ করিলেন। সৌদামিনী সেই কথা শুনিয়া কেবল বলিলেন, "থাক্ সে কথা, তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।"

সমস্ত কথা এইখানেই শেষ হইল। আমার স্বামী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কেবল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—সে নিশ্বাস যেন বলিয়া দিল, "হে বিধাতঃ! এমন লোকেরও এমন হয়?"

স্বামী নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলিয়া গিয়াছেন। আমি ও সৌদামিনী ছাদে বেড়াইতেছি, এমন সময় হরলাল দাদা ছাদে আসিয়া উপস্থিত। হরলাল, যদিও আমার দাদা, তত্রচ তাহাকে দাদা বলিতে আমার ঘৃণা হয়। তাহার চরিত্র অতি জঘন্য। হরলাল দাদাকে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"দাদা! এখানে কি মনে ক'রে এলে?"

দাদা উত্তর দিলেন,—"কেন, আস্‌তে নেই?"

আমি তখন বুঝিলাম, সৌদামিনীর ন্যায় সুন্দরীকে দাদার ন্যায় লম্পটের নিকট বহুক্ষণ রাখা কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে। তখন সৌদামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "চল সৌদামিনী! নীচে যাই।" সৌদামিনীও তৎক্ষণাৎ আমার পশ্চাদ্গামী হইয়া নীচে চলিল। দাদা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনে কি বলিতে বলিতে ছাদের অপর পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। ক্রমশঃ—

কালের প্রতি।

হে কাল! আমি, তুমি, আমার, তোমার, কে কার, প্রভৃতি সকলই তোমারই প্রভাবে কথিত হইয়া থাকে! তোমাতে সকলই আপনার, তোমাতেই আবার সকলই পর। আজ যে আমার, কাল সে অপরের, আজ যাহার সহবাস-সুখে অপরিসীম আনন্দানুভব করিতেছি, কাল হয় ত আবার তাহার সহিত চিরদিনের মত বিচ্ছেদ হইবে। এত জানিয়াও তবু মানুষ, একমাত্র তোমার প্রভাবে, দেখ, বিষময়সুখে ভুলিয়া পাগলের ন্যায় হয়। আবার তোমাতেই সে যাতনার অবসান হয়, শুনিয়াছি! কিন্তু কাল তা হয় কি?—আহা! শৈশবের শান্তিময়-নিশ্চিন্ত-সমতল ও সুখময় জীবন কত শীঘ্র স্বপ্নবৎ চলিয়া গিয়াছে! তারপর এই চিন্তা-তরঙ্গায়িত, আশা-মুকুলিত এবং কলিকাতেই বিশুষ্ক, যৌবনও ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু হৃদয়ে অতীতের যে সুখের স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে, তাহার মোহিনীমায়াতে এ দিন যেন কিছুতেই যাইতেছে না—থাকিয়া থাকিয়া কেবলই সে দিনের কথা মনে হইতেছে। সে কেমন দিন! সে দিন লোকের আসে কেন? আসিলেই বা যায় কেন? তা নহিলে ত আর সে সুখ-চিন্তা-ভাররহিত দুর্ব্বল জীর্ণহৃদয়কে আজ নিরাশ্বাসের বেদনা ভার বহিয়া, ভগ্ন-প্রাণে, আঁধার পথে অগ্রসর হইতে হইত না। তাই বলি কাল! সকলই তোমার খেলা—আমি স্থূলবুদ্ধি, কেমন করিয়া বুঝিব, তুমি এ খেলা আমায় কেন খেলাইতেছ?

লোক বলে, তোমার গতি বড়ই দ্রুত! কিন্তু সত্য হইলেও, আমার যেন তাহা সহজে বোধ বা বিশ্বাস হয় না। কেন না, এ পর-পদ-বিদলিত-আঁধার হৃদয়ে, কিছুই ত আর বিকাশিত হইয়া

নবীন শোভায়, আমায় মুহূর্ত্তমাত্রও ভুলাইতে পারে না! শৈশবে ও কৈশোরে কেবল যে কয়টী কুসুম-কলিকার উদ্গম হইয়াছিল, এখন তাহারাই কীটদংষ্ট হইয়া, আধফোটা অবস্থাতেই নীরবে ঝরিয়া যাইতেছে। কত কাঁদিতেছি! কত সাধ্য-সাধনা করিতেছি, কিন্তু কেহই ত ফিরিয়া চাহে না। সকলই আপনাপন স্বার্থ-সুখান্বেষণ পথে চলিয়াছে! কত সাধ করিয়া, কত দিনের, কত মনের প্রাণের কথাবার্ত্তা কত যত্ন করিয়া,—প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া, আশায় ভুলিয়া, বক্ষের ভিতর করিয়া চলিয়াছি, তবু ত কেহই তাহাদের একটীবারমাত্রও অনুসন্ধান লইল না! আমি ত আর সে ভার বহিতে পারি না, এই ভারেই ত জীবন এত দুর্ভার হইয়াছে। তা নহিলে কাল! তোমার সর্ব্ববাদিসম্মত চির-প্রচলিত দ্রুত ও নিরপেক্ষ গতি আমার পক্ষে এত বিলম্বিতজ্ঞান হইবে কেন? তাই বলি কাল! সকলই তোমার ইচ্ছাধীন। তোমারই ইচ্ছা, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, তোমারই ইচ্ছা, অপরে ইহাকে পদ-বিদলিত করিয়া চলিয়া যাইবে, তোমারই ইচ্ছা, আমি নিশিদিন শূন্যপ্রাণে, সাশ্রু নয়নে, অনন্ত সংসারে কেবল ভাসিয়া বেড়াইব; তবে আমি বৃথা অনুতাপ করি কেন?

কেন, বুঝিতে পারি না? কেমন করিয়াই বা বুঝিব? লোকে বলে, তোমার গতি পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আমার পক্ষে যে কেবলই স্থিতি-শীল দেখিতেছি। তবে এক কথা! এ জগতে তুমি ঘোর পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, নিখিল চেতন ও অচেতন পদার্থ সকল তোমার নিয়মাধীন হইলেও, কতকগুলি এমনই বস্তু আছে, যাহা চিরদিন সমান রহিয়া যায়! কিছুতেই তাহাদের মোচন বা অবসান হয় না। দেখ, হতাশের বাসনা-দারিদ্র্য-প্রণয়-বিভগ্ন-আঁধার হৃদয়ের অবিরাম নীরব আঁখিজল—আর শ্মশানপ্রায় ভারতভূমিতে কানন-কুসুম সমা হিন্দুবালা বিধবাবালার বিষাদ লোচনাশ্রু-লহরী ও দুর্ভার জীবনের অসহ্য দীর্ঘশ্বাস!! আর কত বলিব? কি সাধ্য আছে তোমার—যে, ইহাদের দশার অণুমাত্র বিপর্য্যয় করিতে পার? যদি

তোমার সে ক্ষমতা থাকিত, যদি তোমার হৃদয় কাহার বিষম-বিষাদ-বিঘোর-বিক্ষিপ্ত যাতনা, বা ক্রন্দনে বিগলিত বা বিচলিত হইত, তাহা হইলে, তোমার সাক্ষাতে—তোমার কোলে আজ এরূপে নির্জ্জনে তোমার স্নেহের ও বহুল আয়াস রক্ষিত শত শত পুত্তলিকা অকালে কোথায় মিশিয়া যাইবে কেন?

না, পরিবর্ত্তন আছে! অবশ্যই আছে। কোথায়? অই যে চিতাধূমসমাচ্ছন্ন-নরকঙ্কাল-কপাল-কেশ-ছিন্নকন্থা-পরিপূরিত—শৃগাল-কবন্ধ-কুল-বিচরিত-বিকট শ্মশানভূমি!! কাল! ও কি ও? ধূ ধূ ধূ উ শোঁ শোঁ শোঁও চট্ চট্ চটাস্ চট্! এই ত তোমার শ্রান্ত-ভ্রান্ত-ক্লান্ত ও চিন্তা-জর্জ্জরিত জীবনে পরিবর্ত্তনের মহৌষধি ও মূলমন্ত্র। ওই জ্বলন্ত অক্ষরে কি তোমার নিত্য সুনিয়ম সকল লেখা রহিয়াছে।—"চিরদিন কখনও সমান যায় না!" দরিদ্রের বাসনা কখন পূর্ণ হইবার নয়! আর কি? আর দাম্ভিক-মানবের অবস্থার উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, অন্তিমেতে একাকার। তাই যখনই আঁধার হৃদয়, আরও আঁধার হইয়া উঠে, হৃদয়গ্রন্থি সকল শিথিল ও প্রতিস্তর ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠে, অন্তরের আশা দুশ্চিন্তার দুশ্চিন্তা ভীতিতেও ভীতি হতাশায় পরিণত হয়, তখনই আমি ছুটিয়া ছুটিয়া এই পবিত্র শ্মশানে আসি। কেন আসি? তাহা জানিয়াও ঠিক প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

জলধর।

অসীম আকাশ বক্ষে, ভাঙাবুকে একা,
জলধর! কোথা' ভেসে যাও?
গভীর গর্জ্জনে তুমি ডাক কি কাহারে?
অথবা কি বেদনা জানাও?
ঘৃণিত এ মর্ত্ত্যবাসী, নহ ত তোমরা,
এত দুঃখ কি কারণে তবে?

নাহি কি এমন কেহ, হেন কোন স্থান,
শোক-তাপ-স্পর্শ-শূন্য ভবে?
না জানি কাহার তুমি, প্রণয়ে নিরাশ?
যবে সেই নৈরাশ্য-আঁধার,—
অসহ্য হইয়া উঠে, উথলি' হৃদয়,
তখনই বুঝি এ প্রকার——
গভীর গর্জ্জনে ডাকি', জানাও তাহারে,
পরাণের অসহ্য বেদন!
ফেল এই ধরাবক্ষে, নয়নের জল,
যাতনার কর উপশম!
কিন্তু তুমি জলধর! কাঁদ যা'র লাগি,
ডাক যারে গভীর গর্জ্জনে!
সে কি কভু এ রোদনে, এ বেদনে তব,
ক্ষুব্ধ হয় তোমার কারণে?
কাঁদিয়া কেবল, মিলে কি বাঞ্ছিত ধন,
মিটে প্রেম-পিয়াসা তাহার?
গভীর সাধনা বিনা, বাসনার ধন,
পেয়ে থাকে কে কবে কোথায়?
এস তবে জলধর! হৃদয় খুলিয়া,
কাঁদি উভে' উভয়ের দুঃখে!
আমার (ও) যে ভাঙাবুক, তোমারি মতন,
ভ্রমি একা সংসারের বুকে!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পলাশী রণ-ক্ষেত্রের স্মরণ-চিহ্ন কি আছে?

ইংরাজ আমাদিগকে অনেক কাজ শিখাইয়াছেন;—লেখাপড়া বহুল, সভ্যতা বহুল, সভা বহুল, বক্তৃতা বহুল, চাঁদা বহুল, আরও কত কি, বহুল, এই সমস্তই ইংরাজদিগের শিক্ষা। দেশের কোন বড়লোক লোকান্তরিত হইলে, কিম্বা কোন বীরপুরুষ রণ-জয়ী হইলে, অথবা কোন উচ্চদরের শাসনকর্ত্তা, বিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগের স্মরণচিহ্ন রাখিবার উদ্দেশে উদ্যোগী হওয়াও, ইংরাজদিগের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ফল।—কাজে আমরা সকল বিষয় সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি, আর নাই পারি; সভা করিয়া,—বক্তৃতা করিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া, সকল বিষয়েই অনুকূল বা প্রতিকূল মতামত প্রদানে কোন ক্রমেই অপটু নহি;—প্রস্তাবের দ্বারা অনুরোধ করিতেও আমাদিগের অসামর্থ্য নাই। সেই সামর্থ্য-বলেই অদ্য আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, পলাশী-রণক্ষেত্রের স্মরণচিহ্ন কি আছে? জয়দ্রথ-বধের দিবস, বীরবর ধনঞ্জয় বারম্বার, মহারথ কুরু-গুরু দ্রোণাচার্য্যকে কহিয়াছিলেন, "তোমারই শিক্ষিত বিদ্যা দেখা'ব তোমারে"—ঠিক সেইভাবে না হউক, প্রকারান্তরে আমরা, ইংরাজ-শিক্ষিত-বিদ্যা-প্রভাবে মহারথ জ্ঞান-গুরু ইংরাজদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি,—ভারত-সাম্রাজ্যে ব্রিটিসপতাকা সমুড্ডয়নের প্রধান রণভূমি,—পলাশীক্ষেত্রের স্মরণচিহ্ন কি আছে? ইতিহাসে পাঠ করা যায়, বড় বড় লোকের স্মরণস্তম্ভ থাকিত;—চক্ষেও দেখা যায়, ইংরাজ আমলে অনেক বীর ও অনেক মহৎ লোকের স্মরণস্তম্ভ হইয়াছে। আধুনিক দৃষ্টান্তে, হাবলক, হার্ডিঞ্জ, হেনিরি লরেন্স এবং আউট্রামের প্রতিমূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। আবিসিনিয়ার অভাগা রাজার রাজ্যের সেনাপতি নেপিয়ার "লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালা" নামে বিখ্যাত হইলেন, সেনাপতি রবার্ট কান্দাহার হইতে পলায়ন করিয়া মহাবীর "ব্যারণ" হইলেন—কয়েকজন বীরের নামে কয়েকটী নগরের নাম করা হইল। দেরা ইস্মাইল খাঁ, দেরা গাজী খাঁ, আকবরাবাদ, সেলিমাবাদ, ডেলহাউসী, হেষ্টিং

ইত্যাদি নগর প্রায় সর্ব্বত্র বিখ্যাত। লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের নামটী এক প্রকার লোকালয় ছাড়িয়া "ক্যানিং টাউন" রূপে লবণ সমুদ্রের ধারে গিয়া পড়িয়াছে। পুণ্যশীলা লেডী ক্যানিং ঠাকুরাণীর নামটী, এই কলিকাতা রাজধানীর হালুইকরের দোকানে "লেডিকেনী" (এক প্রকার ছানাবড়া) নামে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সমস্তই এক এক কল্পে উত্তম, কিম্বা না থাকা অপেক্ষা ভাল। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি,—ভারতে ব্রিটিস সাম্রাজ্য পত্তনের প্রধান ভিত্তি পলাশী রণ-ক্ষেত্রের স্মরণ-চিহ্ন কি আছে?

কিছুই না। একটী মাঠ মুরসিদাবাদ প্রান্তে ধূ ধূ করিতেছে! সেটী এখন এত বিজন প্রান্তর যে, তাহার নিকট দিয়া মানুষ চলিয়া যাইতে ভয় পায়। হায়! ১৩৬ বৎসর পূর্ব্বে, যে স্থানে, লক্ষ লক্ষ লোক, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উদ্দেশে সমবেত হইয়া, ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত করিয়াছিল, যে স্থানের আম্র কাননে, কত প্রকার রাজনীতি ও সমর-কৌশলের মন্ত্রণা হইয়াছিল, যে স্থানের অদূরে হিরণ্যকশিপু-প্রতিম সেরাজ উদ্দৌলার কলুষিত মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, যে স্থানে আমাদিগের কেরাণী—মহাবীর ক্লাইব মহোদয়, রণ-বিজয়ী হইয়া মহা, যশস্বী হইয়াছিলেন; চির-রাজভক্ত বঙ্গবাসীর উত্তর পুরুষেরা কি সেই কুরুক্ষেত্রের তুল্য মহারণক্ষেত্রের কিছুই চিহ্ন দেখিতে পাইবে না? যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে এই সুবিস্তীর্ণ রত্নগর্ভ ভারত-সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছেন, সেই আদিম স্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্রের কি কিছুমাত্র স্মরণ-চিহ্ন তাঁহারা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবেন না?

আমরা প্রস্তাব করিতেছি, একটী উপযুক্ত স্মরণচিহ্ন রাখা উচিত। রাজধানীর "ফোর্ট উইলিয়ম" দুর্গ-চত্বরে যেমন সমুচ্চ স্মরণ-স্তম্ভ "অক্টোরলেনী মনুমেণ্ট" আছে, মুরসিদাবাদের ময়দানে, তাদৃশ এক শূন্য স্তম্ভ স্থাপন করিয়া, কোন ফল নাই। প্রান্তরের মধ্যস্থলে এক-খানি বাটী অথবা একটী পাথরের পুতুল নির্ম্মাণ করাইলেও শোভা হইবে না। প্রান্তর-সংলগ্ন ভাগীরথীর তীরে, একটী সুপ্রশস্ত চাদনি ও দালান প্রস্তুত করাই সু-পরামর্শ। সেই দালানে রণ-বিজয়ী লর্ড ক্লাইব সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। সেই বাটীখানি "পলাশী-প্রাসাদ" নামে বিখ্যাত হওয়া উচিত, বিদেশী পথিকেরা প্রয়োজন মতে, তথায় আশ্রয়লাভ করিতে পারিবে। তত্রস্থ পথে যে নিরাশ্রয় হইবে, সেই আশ্রমে সে ব্যক্তি আশ্রয়প্রাপ্ত হইবে। জিলার লোকেরা অন্য কোন সাধারণ কার্য্যেও তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন, প্রয়োজন হইলে সাধারণ কার্য্যোদ্দেশে তথায় সাধারণী সভাও আহূত হইতে পারিবে। এইরূপ মহৎ উদ্দেশেই, একটী স্মরণ প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হওয়া, আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

[সং-প্রঃ]

ঠগী জীবনী।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

আমি তখনও খুব কাঁদিতেছিলাম, বিশেষতঃ মার তিরস্কারে সে কান্নার মাত্রা আরও বাড়িয়াছিল। এমন সময়ে ঘরের বাহিরে এক-জন অপরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া, মা আমায় সান্ত্বনা করতঃ, কি হইয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি মা'কে সমস্ত কথা বলিলাম, আর যে লোকটী বাহিরে চাঁপার সঙ্গে কথা কহিতেছিল—তাহার কথাও শুনাইলাম। মা আমার কথা শুনিয়া, কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া, সেই ভদ্রলোকটীকে ধন্যবাদ দিলেন। আর বলিলেন যে, আমার পিতা উপস্থিত নাই, তিনি যদি ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি ফিরিয়া আসিতে পারেন, এবং তাঁ'র ছেলেকে এই রকম বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া, বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য শত শত ধন্যবাদ প্রদান করেন। আগন্তুক সন্ধ্যা সময় আসিতে স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার পিতা ফিরিয়া আসিলেন, এবং এই সকল কথা শুনিয়া, আমায় যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন; এবং দুই

এক ঘা প্রহারও দিলেন। মা' আমায় কাঁদিতে দেখিয়া, সন্দেশ ও অন্যান্য মিষ্টান্ন দিয়া, সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। যে সন্দেশের জন্য এত বিপদ, এত কান্নাকাটী, সেই সন্দেশ পাইয়াই, আবার আমায় শান্ত হইতে হইল। জগতের রীতিই এই—যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি হয়।

সন্ধ্যার সময়, সেই আগন্তুক আর একটী লোক সঙ্গে, আবার দেখা দিলেন। আমার বিষয় লইয়াই তাঁরা অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন—আমি সে সকল তত মনোযোগ দিয়া শুনি নাই—কিন্তু শেষে যেন একটী কথা আমার কাণে গিয়াছিল। আমার কথা কহিতে কহিতে—অন্য নানাপ্রকারের কথা হইতে লাগিল—কিন্তু সেই একটী কথা—"ঠগী"—এই কথা আমি প্রথম শুনিলাম। আরও আমি তাহাদের কথাবার্ত্তায় এই বুঝিলাম যে, আগন্তুক আমার পিতাকে যেন "ঠগী"র হাতে পড়িবার বিষয় সাবধান করিয়া দিতেছেন আর বলিতেছেন, ইন্দোরে যাইতে হইলে, পথিমধ্যে এরূপ অনেক "ঠগী" সম্প্রদায়ের হাতে পড়া সম্ভব। আগন্তুক নিজের পরিচয় সম্বন্ধে বলিলেন, যে তাঁহারা সৈনিক পুরুষ, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ইন্দোর হইতে সেইস্থানে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা দলে অনেক লোক আছেন, এবং আমাদিগের সহিত এক সঙ্গে ইন্দোরে যাইতে প্রস্তুত আছেন।

আগন্তুক আমার প্রতি ভারী সদয়—আমি তাঁর তরবারি লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া, আমায় আদর করিতে লাগিলেন; আর পরদিন তাঁর সঙ্গে আমায় ঘোড়ায় চড়াইবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তাঁর কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার ভারী আমোদ হইল। তাঁর সঙ্গে যে লোকটী আসিয়া ছিল, সেটার কুশ্রী চেহারা দেখে, আমার কিন্তু তাহাকে বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই। যাহা হউক, এখন সে কথার প্রয়োজন নাই—এ আখ্যায়িকার অনেকস্থলে তিনি দেখা দিবেন, তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভয়ানক কথা আমার বর্ণনা করিতে হইবে।

পরদিন প্রভাতে আমরা আবার যাত্রা করিলাম। আমাদের নব-পরিচিত সেই দুইটী লোক, এবং তাঁহার দলও আমাদের সহগামী হইল। এই রকমে আমরা দুইদিন অনবরত চলিলাম। আগন্তুক আমায় ঘোড়ায় চড়াইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন—কথনও কথনও তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়ার মুখ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন—আমি ঘোড়ার উপর বসিয়া রহিলাম। ঘোড়াটী বেশ শান্তশিষ্ট—সুতরাং তাহার উপর চড়িয়া থাকিতে আমার কোন ভয় হইত না। এইরূপে দুইদিন আমি আশ মিটাইয়া, ঘোড়া চড়ার সক মিটাইলাম। যখন সূর্য্যের উত্তাপ বড় প্রখর হইত, তখন তিনি আমায় ঘোড়া হইতে নামাইয়া, ডুলির ভিতর, মা'র কাছে বসাইয়া দিতেন, আবার যখন সূর্য্য অস্ত যাইত বা প্রাতঃকালে আমার ঘোড়ায় চড়াইতেন।

তৃতীয় দিনে, আগন্তুক আমার পিতাকে বলিলেন—"উস্মুক খাঁ! এই সব অস্ত্র-শস্ত্রধারী গরিব বেচারীদিগকে, আর ইন্দোর পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার দরকার কি? ওদের এখন ফিরিয়ে দিলেও ত চলে। আমি আর আমার অধীনস্থ সৈনিকগণ, অনায়াসে আপনাদের রক্ষা কোরতে পারবে। আর এখন আমরা বন জঙ্গল ও ভয়ানক স্থান সকল নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করে এসেছি—এখন আর ভয়ের কারণ কিছুই নেই। আর অর্দ্ধ ক্রোশ পরেই আমরা ইন্দোরের রাজ্য-সীমার মধ্যে গিয়ে পড়বো। ঠগী ও ডাকাতের ভয় যে স্থানে ছিল, সে স্থান, আমরা অনেক পশ্চাতে ফেলে এসেছি।"

আমার পিতা, আগন্তুক সৈনিকপুরুষের এই কথা শুনিয়া, সাহ্লাদে বলিলেন—"ঠিক কথা—ওদের যদি আমি এখন ছেড়ে দিই, তাহা হইলে যে ওরা কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হয়, তা' বলা যায় না। আর ওরা আমাদের প্রায় ৫০।৬০ ক্রোশ এগিয়ে দিয়েছে—আসল ভয়ের জায়গা পার করে দিয়েছে। বাস্তবিক ওদের এখন ফিরিয়ে দিলেই চল্‌তে পারে।"

এই রকম কথাবার্ত্তার পরে, শেষে তাই ঠিক হলো। আমার

পিতা, আমাদের শরীর রক্ষক অস্ত্র-শস্ত্রধারী পাঠানগণকে দেশে ফিরে আস্‌তে বল্‌লেন। তাতে তা'রা বড়ই আহ্লাদিত হলো। সেইদিন দুপর বেলায় তা'রা আমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলো। আমি তা'দের একজনের হাতে একটা আক্‌বরী মোহর (যাহা আমায় আগন্তুক সৈনিকপুরুষ আদর করিয়া দিয়াছিলেন) আমার ভগিনীকে দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলাম। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ছোট ভগিনীকে আমি বড় ভাল বাসিতাম, তাই সেই আকবরী মোহরটী আমাদের একজন বিশ্বাসী পাঠান ভৃত্যের হস্তে দিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম—"তাহাকে এই মোহরটী, তাহার গলায় হারের অন্য মোহরগুলির সঙ্গে গাঁথিয়া লইয়া পরিতে বলিও,—আর বলিও, আমি বেশ আমোদে আছি—তবে তা'র জন্যে বড় মন কেমন করে—সে কাছে থাকিলে আরও আমোদ হইত।" পাঠান ভৃত্য আমার পিতার সম্মুখেই আমার হাত হইতে সেই আক্‌বরী মোহর লইয়া চলিয়া গেল। হায়! সেই মোহর আমি পুনরায় পেয়েছিলাম, কিন্তু কি ভয়ানক অবস্থায়—ওঃ—বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়!!

আমাদের পাঠান ভৃত্যগণ আমাদের ছাড়িয়া তখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আমাদের সেই আগন্তুক সৈনিক পুরুষটী তখন আমার পিতাকে বলিলেন,—"এখন হইতে সদর সদর পথ দিয়া যাইলে, এখনও ৫।৬ ক্রোশ পথ ঘুরিয়া তবে ইন্দোরে পৌঁছিতে পারিবেন। কিন্তু আপনি যদি সম্মত হন, তাহা হইলে, আমরা একটা সহজ পথ দিয়া আপনাদের লইয়া যাইতে পারি। তাহাতে আপনারা দুই ক্রোশের মধ্যেই ইন্দোর সহরের সীমার ভিতর উপস্থিত হইতে পারিবেন। আর তাহা হইলে চাই কি এই জ্যোৎস্নারাত্রিতে, আমরা আর অল্পক্ষণ এখানে বিশ্রাম করিয়া, অর্দ্ধেক রাত্রি থাকতে থাকতেই যাত্রা আরম্ভ করিতে পারি। পাল্কী বেহারাদিগকে কিছু বেশী পয়সা দিতেই স্বীকৃত হইলেই, উহারা বিনা-বাক্যব্যয়ে রাত্রিতেই আপনার স্ত্রীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে সম্মত হইবেন। আরও এখানকার সহর কোটাল আমার

বড় বন্ধু—আমরা চাই কি তাঁ'র বাড়ীতে গিয়া উঠিতে পারি। তিনি নিশ্চয়ই খুব আদর যত্ন করিবেন।"

আমার পিতা সরল বিশ্বাসে তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। দ্বিপ্রহর রজনীতে গমন করাই স্থির হইল। ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

সুখ ও দুঃখ।

শিষ্য। গুরো! এই সংসারে ধনীরাই কি প্রকৃত সুখী?

গুরু। না বৎস! যাহারা বিপুল-ধন-সম্পত্তির অধিকারী, তাহারা, প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে, জানে না। কিরূপে তাহার স্বীয় ধন-সম্পত্তি বর্দ্ধিত করিবে, কিরূপে তাহা রক্ষা করিবে;—এইরূপ চিন্তায় তাহাদের শরীর জীর্ণ হয়। অর্থ উপার্জ্জনে কষ্ট; তাহার রক্ষণাবেক্ষণে কষ্ট; আবার বিনষ্ট বা অপহৃত হইলে আরও কষ্ট। তবে অর্থসম্পন্ন ব্যক্তির সুখ কোথায়? অর্থ মনুষ্যের সুখ, বিধানে বিরত থাকিয়া, কেবল দুঃখ প্রদানে নিপুণ। এই জন্যই সাধুরা বলেন, "অর্থই অনর্থের মূল।"

শিষ্য। যদি অর্থ হইতে দুঃখ হয়, তবে লোকে অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, সর্ব্বদা অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকে কেন?

গুরু। লোকে বুঝে না। মনে করে, আমি যে পরিমাণে অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইব, সেই পরিমাণেই সুখ-সম্ভোগে সমর্থ হইব। কিন্তু জানে না যে, উৎপন্ন পদার্থই কালে উৎপাদক-শ্রেণীর জনয়িতা হয়। এবং ইহাই বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বরের একটী প্রশস্ত নিয়ম। এই নিয়মেই জগতের জীব ও উদ্ভিদের বংশ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

শিষ্য। উৎপন্ন হইতে উৎপাদক-শ্রেণীর পুনর্জন্ম, বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যেমন বীজ, মৃত্তিকা সহযোগে অঙ্কুরিত হইয়া, বৃক্ষ উৎপাদন করে, বৃক্ষও ফল ধারণ করিলে, ফল মধ্যে বীজ উৎপন্ন হয়।

আবার সেই বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি দুঃখ হইতে অর্থ, ও অর্থ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যে মহাত্মাগণ, অর্থোপার্জ্জনজনিত ক্লেশকে ক্লেশ মনে করেন না, এবং তাহার ব্যয়েও দুঃখিত হন না; অর্থ তাহাদিগকে দুঃখ দিতে পারে না। সেই মহাত্মাগণ অর্থকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে ব্যয় করিয়া, অনুক্ষণ জগতের হিত-সাধনে চেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও, আত্ম-সুখ-পরতন্ত্র হইয়া অর্থের অযথা ব্যবহার বা কৃপণতার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, বিশালোদরা আশার বিশালোদর পূর্ণ করিতে অনিচ্ছুক থাকেন।

শিষ্য। গুরো! তবে এ সংসারে প্রকৃত সুখী কে?

গুরু। যিনি নিষ্পাপ থাকিয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বীয় হৃদয় মন্দিরে সন্তোষের মোহিনীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, অনুক্ষণ তাহাই দেখেন, তিনিই প্রকৃত সুখী।

শিষ্য। এ জগতে পুণ্যকর্ম্ম কি?

গুরু। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন; বিশ্বস্থ সমস্ত ব্যক্তির সহিত সহোদর-নির্ব্বিশেষে সদাচরণ, যথাসাধ্য পরোপকার ব্রতসাধন ও প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপাতা জগন্নিয়ন্তা শ্রীমদীশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া, নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্কভাবে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন প্রভৃতিই পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। দুঃখীর দুঃখ মোচন, বিপন্নের উদ্ধার সাধন, মোহান্ধকারীকে জ্ঞানালোক-প্রদান প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা সাধারণের শুভসাধন করাই, ধর্ম্ম নামে অভিহিত।

শিষ্য। আপনার কথিতরূপ আচরণ অত্যন্ত কষ্টকর ও কঠিন কার্য্য।

গুরু। হাঁ বৎস! আপাততঃ কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় সত্য। কিন্তু শিবদাতা জগৎ-পাতার এমনই নিয়ম যে, উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইলে কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না; মন অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আর্দ্র হয়। তখন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বলবান্ হইয়া

কু-প্রবৃত্তিদিগকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়, এবং পূর্ব্বোক্ত কার্য্য, সুখসাধ্য হয়। তখন ধর্ম্ম-সাধনের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলে, কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখ হয় না। বরং হৃদয়নিলয়ে অসমুদ্রোত্থিত অমূল্য সন্তোষরূপ নয়নাভিরাম রত্ন সন্দর্শনে, অনুক্ষণ স্বর্গ-সুখ অনুভব করা যায়। ধর্ম্ম কর্ম্ম সুখে সঞ্চয় করা যায় ও ধর্ম্মে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়।

শিষ্য। তবে প্রকৃত সুখ মনুষ্যের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য?

গুরু। প্রকৃত সুখ অনায়াস-সাধ্য বটে, কিন্তু সংসার রিপু-প্রলোভনময়। এই পৃথিবীতে শান্তিসরোবরের পুণ্যপথ অন্বেষণ করিয়া, তদভিমুখে গমন করা কষ্টকর। তবে একবার সেই পথে গমন করিয়া শান্তিসরোবরে উপস্থিত হইলে, সহজেই ধর্ম্ম-পদ্মের মধুপানে সুখী হইতে পারা যায়।

শিষ্য। গুরো! আপনি যে বলিলেন, নিষ্পাপ থাকিয়া পুণ্যকর্ম্ম সাধনকারীরাই সুখী। কিন্তু পাপ কাহাকে বলে?

গুরু। প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অসদাচরণে কাহারও হৃদয় মনস্তাপে দগ্ধকরণ, বলে কিম্বা কৌশলে ধর্ম্মচ্যুতকরণ, কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্মের পবিত্র আশ্রয় হইতে রিপু-পরিবেষ্টিত অধর্ম্মের আশ্রয়ে লইয়া গিয়া, তাহাকে দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিতকরণ প্রভৃতি কার্য্যই পাপ বলিয়া গণ্য। যখন আমাদের কু-প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া আমাদিগকে অসৎপথে অধর্ম্মাশ্রয়ে লইয়া যাইবার পরামর্শ দেয়, তখন ন্যায়পরতানাম্নী ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি শতবার নিষেধ করিলেও, তাহাতে আমরা শ্রুতিপাত করি না। পরে ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্য দ্বারা কাহাকেও বিপদসাগরে নিক্ষেপ করিলে, তাহার অনুশোচনা হেতু যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা বিপন্নের দুঃখের সহিত তুলনা করিলে, সহস্র গুণ কষ্টকর বলিয়া বিবেচনা হয়।

শিষ্য। গুরো! অনেকে অপরকে কষ্টে পাতিত করিয়া আমোদ অনুভব করে, ইহাও দেখা দেখা যায়, তাহার কারণ কি?

গুরু। যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি রিপুপরবশ হইয়া প্রথমে পাপ-পথে পদার্পণ করিয়াছেন; তিনিই জানেন, পাপের অনুশোচনা কত কষ্ট-

কর। কিন্তু প্রথমকার পাপের অনুশোচনা যত কষ্টদায়িকা হয়, দ্বিতীয়বার তদপেক্ষা অল্প; তৃতীয়বার আরও অল্প হয়; ক্রমে ক্রমে পাপকর্ম্মের অনুশোচনায় আর তাহার দুঃখ হয় না। পরে তিনি তাহাতেই আমোদ অনুভব করেন। কিন্তু সেই পাপপথগামী ব্যক্তি একবার বিপদে পতিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে কখনও বিপন্ন হইয়াছিল এরূপ কোন ব্যক্তি, তাঁহার দৃষ্টিপথের পথিক হইলে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার জন্য, অনুশোচনা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে আসিয়া, মনস্তাপরূপ অনল জ্বালিয়া দেয়। আবার যদি আগত ব্যক্তি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া, হাস্য বা বিদ্রূপ করে, তাহা হইলে, সেই হাস্য ও বিদ্রূপ পবনরূপে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রের অনল আরও দ্বিগুণ শিখায় জ্বালাইয়া দগ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু আবার ঐ আগত ব্যক্তি হাস্য কিম্বা বিদ্রূপ না করিয়া, যদি তাঁহার উদ্ধার সাধন করে, তাহা হইলে, স্মৃতি তথায় উপস্থিত হইয়া ঘৃতাহুতি প্রদান করাতে, উক্ত অনল সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া, একেবারে তাঁহার হৃদয় ভস্মাবশেষ করে। তখন মুমূর্ষা আসিয়া, তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া শান্তিবিধানের পথ দেখাইয়া দেয়। তবে দেখ বৎস! অলীক আমোদ ও গ্লানিকে হৃদয়ে স্থান দিয়া, অধর্ম্ম করিতে হয়, ও অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া শেষে দুঃখ পাইতে হয়।

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

উষামঙ্গল।

নিশা অবসান,
পাখী করি' গান,
কা'র আগমনী
গাইল;
পূরব গগনে,
সুশুভ্র বরণে,
উষারাণী বুঝি,
আসিল।

যেই ধরাতল,
নিস্তব্ধ নিশ্চল,
ক্ষণকাল আগে,
আছিল;
উষার পরশে,
অতীব হরষে,
বিশ্বরাজ্য পুনঃ
জাগিল।

ললিত সুতানে,
সুমধুর গানে,
কোকিল পাপিয়া
ডাকিল।
বিশ্ব চরাচর,
হ'য়ে একস্বর,
উষা-স্তুতি-গান
গাহিল;—
"জগতের প্রাণ,
কর তুমি দান,
চেতন-রূপিণী
তুমি গো উষা!
"পুষ্প শতদল,
ফুল্ল নিরমল,
তোমার শিরসি
সাধের ভূষা;
"তোমার পরশে,
হাসে গো হরষে,
সুনীল অম্বর
কিরণ ল'য়ে।
"তুমি আস' বলি',
হাসে মেঘ গুলি,
গায়ে গায়ে পড়ি'
অধীর হ'য়ে;
"জীবন-দায়িনী,
মঙ্গল-রূপিণী,
জগতের হিতে
সতত রতা।
"তোমার কৃপায়,
নব প্রাণ পায়,
ফুটে ফুটে উঠে
কুসুম লতা;

"তোমারে হেরিয়া,
পুলকে পূরিয়া,
বলে দ্বিজগণে
যুগল করে:—
"জয় বিশ্বনাথ!
করি প্রণিপাত,
তোমার চরণে
ভকতি ভরে;
"অনাদি ঈশ্বর,
ব্রহ্ম পরাৎপর,
সত্যরূপ তুমি
অনন্ত কায়।
"জয় বিশ্বময়,
জয় জয় জয়,
হোক্ প্রাণলয়
তোমারি পায়;
নবীন জীবনে,
নবীন পরাণে,
নবীন ধরায়
গাইব আয়।
জয় উষারাণী,
বলিয়া অমনি,
কুসুম অঞ্জলি
দিবরে পায়;
এস উষা এস,
হেরি তব বেশ,
অলস পরাণ
উঠিল জাগি;
দাও সরলতা,
দাও পবিত্রতা,
এই দুই বর
তোমায় মাগি।"

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

সমালোচনা। *

"তত্ত্ব-কুসুম"—শ্রীশ্যামলাল মজুমদার প্রণীত। এখানি এক-খানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। মূল্য ।০ চারি আনামাত্র। পুস্তিকাখানি মন্দ হয় নাই।

"চিত্রদ্বয়"—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত প্রণীত। একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকা। মূল্য ৵০ দুই আনা। ইহাতে রাজস্থান-বর্ণিত "হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ" ও "ভ্রাতৃদ্বয়" নামক দুইটী পদ্য-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

"দারোগার দপ্তর" ২৪শ সংখ্যা—পুস্তকখানির নাম "আবীর-জান"। কলিকাতার কোনও এক বাইজীর লীলাখেলা। বর্ণনা বেশ হইয়াছে। "দারোগার দপ্তর" মাসে মাসে আমাদিগকে বেশ সুখী করিতেছে।

* সমালোচনার উদ্দেশ্য ঃ—

সমালোচনা অর্থে আমরা বুঝিয়া থাকি ঃ—সম্যক্‌রূপে আলোচনা। কাহারও কোনও দোষ থাকিলে, সাধারণ্যে তাহার প্রচারও গুণ থাকিলে প্রশংসা—ইহাই সমালোচনের উদ্দেশ্য! এ উদ্দেশ্য, কোনও স্বার্থে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে কি না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের মতে, স্বার্থের সংশ্রবে না থাকাই উচিত। আজিকালি আমরা দেখিয়া থাকি, যেখানে স্বার্থের বাড়াবাড়ি, সেখানেই সুখ্যাতির ছড়াছড়ি। যেখানে স্বার্থ নাই, সেখানে সুখ্যাতির ভাগ অতি অল্প, বরং নিন্দারই বাড়াবাড়ি। আমাদের পত্রিকায় যে সকল সমালোচনা স্থান পাইতেছে, তাহা আমাদের বিশ্বাস যে, দোষ গুণের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারেই ভাল, বা মন্দ হইতেছে। যে সকলে, গুণের ভাগ বেশী, দোষের ভাগ অল্প, তাহার সমালোচনা উত্তমই হইবে, এবং যাহার দোষের ভাগ বেশী, গুণের ভাগ অল্প, তাহার সমালোচনা নিন্দা-ব্যঞ্জক হইবে। এরূপ হওয়াই উচিত। আমাদের সমালোচনা দেখিয়া, কোনও কোনও সহযোগী, তৎপ্রশংসিত সেই সকল বিষয়ের দোষ-কীর্ত্তন অবলোকনে আমাদের উপর কুটিল কটাক্ষ করিতেছেন। করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমাদের রুচি যে, তাহাদের রুচির সহিত এক হইতে পারে না, কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, অন্ততঃ সেটা একবার তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত ছিল। সম্পাদক।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } বৈশাখ, ১৩০১ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গৌরচন্দ্রের স্মৃতি।

কাল-চক্রের আবর্ত্তনে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে ও আসিতেছে; কিন্তু যে দিনটী একবার যায়, সেই-দিনটী কি আর কখনও ফিরিয়া আইসে? শীতাবসানে আবার বসন্ত সমাগত, আবার বাসন্তী-পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র-কিরণে জগৎ প্লাবিত, প্রকৃতি হাস্যময়ী; কিন্তু হায়! ৩০৯ বৎসর পূর্ব্বে, যে বাসন্তী-পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র-গৌরচন্দ্র, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, হরি-প্রেম-চন্দ্রমায় দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত করতঃ, ধর্ম্মামৃত বর্ষণে ভারতবাসীর অন্তরে জীবনী-শক্তি ঢালিয়া দিয়াছিলেন, সেই বাসন্তী-পূর্ণচন্দ্র কি আর কখন উদিত হইবেন? আবার কি এই অমানিশার অন্তে, আমরা সেই পূর্ণচন্দ্র ভারত-গগনে সমুদিত দেখিতে পাইব? সে দিন চলিয়া গিয়াছে, সে সময় কালসাগর গ্রাস করিয়াছে, সেই পূর্ণচন্দ্র চির-অস্তগত হইয়াছেন। অস্তগত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গবাসীর—ভারতবাসীর মানসাকাশে নিয়ত সমুদিত ও পূর্ণবিরাজিত রহিয়াছেন। আজ এই চন্দ্র-গ্রহণ সময়ে, ভক্ত-হৃদয়ে সেই পূর্ব্বস্মৃতি—সেই মনোহর স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছে। যে তিথির, যে লগ্নে সেই মহান্ প্রেমদাতা নবদ্বীপে

অবতীর্ণ হইয়া, ভারতবাসীর ও পাপিষ্ঠের পাষাণ হৃদয় হরি-প্রেমে আপ্লুত করিয়াছিলেন, সমস্ত সমাজকে ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, আজ, ৩০৯ বৎসর পরে, আবার সেই তিথির, সেই চন্দ্রগ্রহণ-যোগ সমুপস্থিত। আজ সমস্ত ভক্তবৃন্দ হরি-প্রেমের মোহিনী-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, ধন, জন, সুখ, সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, কত ক্লেশ, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, উৎফুল্ল বদনে, মহানন্দে; হরিধ্বনিতে দেশ আন্দোলিত করিয়া, সেই বিশ্ব-প্রেমিকের জন্মভূমি দর্শনার্থ ধাবমান হইয়াছেন। সকলেরই যেন এক লক্ষ্য, যেন এক ধর্ম্ম-প্রাণে সকলেই অনুপ্রাণিত, যেন সকলেই এক সাধারণ প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ। নবদ্বীপ আজ ভক্তগণে পরিপূর্ণ। হরিধ্বনিতে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে দশদিক নিনাদিত, সকলেই ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত। এ দৃশ্য অতি রমণীয়, এ ভাব অতি পবিত্র, ইহা প্রত্যক্ষ করিলে কে বলিবে যে, হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইতেছে?

বিক্রমাদিত্যের ১৪০৭ শকে, ইংরাজী ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে ফাল্গুন পূর্ণিমার গ্রহণ-যোগে এই মহাপুরুষ ভূমিষ্ঠ হন। শ্রীহট্ট নিবাসী বৈদিকশ্রেণীয় জগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীর বাসের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারই ঔরসে, শচীদেবীর অষ্টমগর্ভে ইঁহার জন্ম। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে উক্ত আছে যে, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা করিয়া অন্তর্হিত হন, এবং প্রেমভক্তি প্রদান করিবার জন্য,—স্বয়ং প্রেমিক হইয়া, প্রেম শিখাইবার জন্য কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী রাধিকার কৃষ্ণ-প্রেমের প্রতিদান দিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই, রাধিকার ন্যায় তপ্ত-হেমকান্তি ধারণ করিয়া, নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে;——

"আপনি করিনু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥"

আদ্যখণ্ড (চৈতন্যচরিতামৃত)

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, যখন যে কোন সমাজে কোন নূতন সত্য প্রচারিত হইয়াছে, সেই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই সেই সত্যসূচক কোন কার্য্যের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। ঈশা জগতে যে সত্যপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই যোহন প্রভৃতি মহাত্মারা সেই সত্যের সূত্র পূর্ব্বেই প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের জন্মেরও কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, হরিনাম-মহাত্ম্য প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত মতে, অদ্বৈত, মহাবিষ্ণুর অংশরূপে ও নিত্যানন্দ বলরামের অংশরূপে অবতীর্ণ। মহাপুরুষের জন্মকালে এবং বাল্যলীলায় যেরূপ অলৌকিক ঘটনাবলীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, চৈতন্যদেবের জন্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ বহুতর অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। "চৈতন্যচরিতামৃতে" দেখা যায়, তিনি ত্রয়োদশ মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়াই হরিধ্বনি করিয়াছিলেন, এবং অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সমাগত হইয়া, সূতিকাগারে নারায়ণের সমুদয় চিহ্নবিশিষ্ট শিশুকে অবলোকন করিয়া, তৎকালোচিত নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন লোডীবংশীয় সেকেন্দার লোডী দিল্লীর বাদশাহ, এবং হোসেন সাহ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। এই পাঠান রাজত্বকালে, সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের যে কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, হিন্দুগণ যে কত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এই সময়ে বিধর্ম্মী কাজীরাই বিচারক ছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় বিচারের কথা, অস্মদ্দেশে সকলেই সম্যক্ অবগত আছেন। এই বিধর্ম্মীদের শাসনাধীনে, বঙ্গে হিন্দু-সমাজ যে ভয়ানক নিপীড়িত হইবে, যথেচ্ছাচার, পাশবাচার প্রাদুর্ভূত হইয়া সমাজকে বিশৃঙ্খলার আকর করিয়া তুলিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এই সময়ে সামাজিক সকল প্রথাই, যবনানুকরণে বিকৃতপ্রায় হইয়া উঠে, এবং জাতিভেদ ক্রমশঃ শিথিলতর

হইতে থাকে। এই সময়ে বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, প্রাদুর্ভূত হইয়া, নব্য-স্মৃতি প্রণয়ন করেন, তাঁহার ব্যবস্থা সমূহ আজিও অস্মদ্দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। এই সময়েই সামাজিক সুশৃঙ্খলাস্থাপনার্থ দেবীবর ঘটক ও উদয়নাচার্য্য, ব্রাহ্মণগণের মেলবন্ধন করেন। এই সময়েই বঙ্গদেশে আবার তান্ত্রিক মতের প্রাদুর্ভাব হয়; কিন্তু সেই পবিত্র শিবোক্তশাস্ত্র ব্যবহার দোষে, পাশবাচারে পরিণত হইয়া ‘পঞ্চমকারের’ শক্তিতে সমাজ ছারখার করিয়া ফেলিতে লাগিল; তন্ত্রোক্ত “প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বেবর্গা দ্বিজোত্তমা” এই বাক্যের অনুসরণে জাতিভেদের প্রগাঢ় বিলোপ-সাধন হইতে লাগিল; এবং যথেচ্ছাচার ক্রমশঃই প্রবলতর হইতে লাগিল। তখন রাজ-শাসনে সমাজ শাসিত নয়, কারণ রাজা বিধর্ম্মী যবন; হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করাই তাঁহার কার্য্য, তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যই সৎকার্য্য। এইরূপে যখন যবনগণের ভীষণ অত্যাচারে ও তান্ত্রিকগণের পাশবাচারে হিন্দুসমাজ উপপ্লুত হইতে লাগিল, যখন প্রেম-ভক্তির অভাবে মানবহৃদয় পাষাণ সদৃশ কঠিন হইয়া উঠিল, যখন পাষণ্ডগণের জয়োল্লাসে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইতে লাগিল, যখন অজ্ঞান-তিমিরে বঙ্গ-সমাজ তমসাচ্ছন্ন, তখন—সেই অমানিশার নিশীথে, হঠাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। তমসাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ, আবার পথ দেখিতে পাইলেন, আবার প্রেম-ভক্তিতে নির্জ্জীব সমাজ নবজীবন প্রাপ্ত হইল।

চৈতন্যদেবের ভূমিষ্ঠ হইবার পরই, আচার্য্য তাঁহার শরীরে মহাপুরুষের সর্ব্বলক্ষণ বর্ত্তমান দেখিয়া, তাঁহার “বিশ্বম্ভর” নাম রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার মাতা শচীদেবী ও অন্যান্য প্রতিবেশিনী তাঁহাকে “নিমাই” নামে অভিহিত করেন। যোগিনী ডাকিনীগণের উপদ্রব হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। এ প্রথা, এ সংস্কার, অদ্যাপি এ দেশে প্রচলিত আছে। আবার তাঁহার বর্ণ গৌর ছিল বলিয়া, কোন কোন রমণী তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বা গৌরহরিও বলিতে লাগিলেন। বাল্যকালে চৈতন্য, অত্যন্ত

চঞ্চল ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইনি বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সমসাময়িক ও সতীর্থ; উভয়েই নবদ্বীপ সন্নিকটে ‘বিদ্যালয়’ নামক গ্রাম-নিবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। পঠদ্দশাতেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, তাহার কয়েক বৎসর পরেই তিনি বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইলে, সনাতন রাজ-পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। দারপরিগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু সংসারের সুখ, ঐশ্বর্য্য, ভার্য্যাদি তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না; মায়াজালে তিনি নিপতিত হইলেন না। ভগবৎ-প্রেমে তাঁহার চিত্তবিভোর হইয়া উঠিল, সংসার তাঁহার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিল না। তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিয়া ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। গুরু নিমাইকে মন্ত্র দিলেন,—“হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, গতিরন্যথা।”

এইবার তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া, হরিনাম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন; দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে, ভ্রমণ করিয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। অচিরে, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি সকলেই একত্র হইলেন; দিন দিন তাঁহার দল বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার দেবোপম আকৃতি, সরলতাময় মধুর ভাব, এবং অমৃতোপম ধর্ম্মোপদেশে, হিন্দুর কথা দূরে থাকুক, যবন পর্য্যন্তও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইতে লাগিল। কথিত আছে, দাবিড় ও সাফর নামক দুইজন ম্লেচ্ছ, প্রভূত-ধনের অধিকারী হইয়াও সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কৌপীন পরিধান করিয়া চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারাই পরে “রূপ ও সনাতন” নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী কৃত “লঘুতোষিণী” গ্রন্থে, উক্ত ব্যক্তিদ্বয় ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, পরন্তু যবনাধীনে কার্য্য করিয়াই আচার ব্যবহারে তাঁহারা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, “যবন হরিদাস” নামক একজন

যবন, চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন, এই মহাত্মার কঠোর তপস্যা ও অসাধারণ হরিভক্তির কথা শ্রবণ করিলে, আজিও সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়াগ্রামে এই মহাত্মার আশ্রম ছিল, তথায় এখনও বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, 'হরিদাসের' নাম ঘোষণা করিতেছে।

কোন সমাজে কোন নূতন সত্য বা অভিনব মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, সমাজ প্রায়ই প্রচারকের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে, ইহা যেন সামাজিক অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। এই নিয়মানুসারেই চৈতন্যদেবকে প্রথমতঃ অনেক উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যিনি পরহিতে—বিশ্ব-হিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সামান্য উৎপীড়ন, যন্ত্রণা কি তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে? সামান্য মেঘে, সূর্য্যকে কতক্ষণ আচ্ছন্ন করিতে পারে?

কিছু দিনের পর, তিনি ছয় বৎসর আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং তৎপরবর্ত্তী অষ্টাদশবর্ষ, নীলাচলে বাস করেন; এই সময়েই তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু নামে অভিহিত হন। প্রত্যেক বর্ষে, রথ ও দোলযাত্রা উপলক্ষে ভক্তগণ নীলাচলে গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; তিনিও মধ্যে মধ্যে দেশে আসিয়া, সকলের সহিত মিলিত হইতেন। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পর, আর পত্নীর মুখাবলোকন করেন নাই। তাঁহার দেশপর্য্যটন ও নীলাচলে অবস্থানকালীন তৎকৃত অনেক অলৌকিক কার্য্যের উল্লেখ আছে, সে সকলের বিস্তারিত বিবরণ "চৈতন্যচরিতামৃতে" দ্রষ্টব্য।

এই নীলাচলে অবস্থানকালীন তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেমের পূর্ণবিকাশ উপস্থিত হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রেমোন্মত্ত হইয়া, বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও তন্ময় হইতে লাগিলেন। জগতের সর্ব্বত্র সেই গোপী-রমণের রমণীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন; সকল জলাশয়কেই যমুনা বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল; আর শব্দমাত্রই যেন তাঁহার কর্ণে বংশীবাদনের বংশীধ্বনি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এই সাত্ত্বিক প্রেমোন্মত্ততাই ভক্ত হৃদয়ের চরম উৎকর্ষ। আর, কম্পন স্বেদ, প্রেমাশ্রু ও বাহ্যজ্ঞান রাহিত্যই ইহার লক্ষণ। তিনি কখন কখনও গভীর নিশীথে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, রাজমার্গে কখনও বা অরণ্য-মধ্যে সংজ্ঞারহিত হইয়া পতিত থাকিতেন। কখনও "হা প্রাণনাথ!" বলিয়া উন্মত্তবৎ চীৎকার করিতে থাকিতেন; আবার কখনও বা পাগলের ন্যায় চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া, বিকট-বেশে এক দৃষ্টিতে, একদিকে চাহিয়া থাকিতেন। এই অবস্থায় একদিন রাত্রিতে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মধুর চন্দ্রমাচ্ছন্ন যমুনা সলিলভ্রমে সাগর বক্ষে ঝম্ফ দিয়াছিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে শিষ্যগণ বহু অন্বেষণে, এক ধীবরের জাল মধ্যে তাঁহার দেহ দেখিতে পান। এই তাঁহার শেষ দিন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে,—তিনি ধীবর-কর্তৃক উত্তোলিত হইয়া, পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়াছিলেন, এবং জগন্নাথদেবের মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আর বহির্গত হইলেন না। তাঁহার দেহ জগন্নাথের দেহে লীন হইয়া গেল।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভাগবতে কথিত আছে,—"ভগবান্ নারদরূপে অংশাবতার গ্রহণ করিয়া, জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। চৈতন্য এই ধর্ম্ম পুনরায় প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রচারেই তদীয় শিষ্যগণ সমবেত হইয়া, "বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের" উৎপত্তি করেন। কৃষ্ণভক্তগণ যে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, যে কৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন, ইনিও সেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, তাঁহারই নাম কীর্ত্তনে ও মাহাত্ম্যপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রেমিক, ভক্তের হৃদয়ে যে সকল ভাবের উদয় ও প্রকাশ হয়, সে সমস্তই তাঁহাতে প্রকাশিত হইয়া ছিল।"

চৈতন্যচরিতামৃতে, তিনি পূর্ণাবতার বলিয়া বর্ণিত হইলেও অস্মদ্দেশে পূর্ণাবতার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কলিযুগের প্রথমাবস্থায় বুদ্ধাবতার ও শেষাবস্থায় কল্কী অবতারের কথাই ভাগবতে উল্লিখিত আছে। চৈতন্যের অবতার সম্বন্ধে, নবদ্বীপে অনেক সভা ও বিচার

বাদানুবাদ হয়; কিন্তু পণ্ডিত-মণ্ডলী এবং কৃষ্ণনগরের রাজবংশের কেহ কখনই চৈতন্যদেবকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া, স্বীকার করেন নাই। কিম্বদন্তী আছে যে,—পূর্ব্বে কোন সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় হস্তলিপি হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত বাক্যটী লিখিত হইয়াছিল,—"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্ত ন চ পূর্ণ নচাংশকঃ" ইহার এক অর্থ এই যে, গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্তমাত্র, পূর্ণাবতার নহেন, অংশাবতারও নহেন। আবার অন্যার্থ—"গৌরাঙ্গ পূর্ণাবতার; অংশাবতার বা ভগবদ্ভক্ত নহেন।"

শাস্ত্র-সমূহ ও পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, তিনি যে সকলের আরাধ্য ও পূজনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। নবদ্বীপে মনোহর সুরম্য অট্টালিকা-বেষ্টিত মন্দির মধ্যে তাঁহার বিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজিত; অদূরে অন্য মন্দিরে শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মহা সমারোহে রীতিমত নৈমিত্তিক পূজা ও ভোগাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সকল বিগ্রহমূর্ত্তি ব্যতীত নবদ্বীপে, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতির অনেক মূর্ত্তি ও অনেক দেবালয় আছে। এই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়াই নবদ্বীপ মহাতীর্থ।

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

একটী উপায়।

রজত কাঞ্চন মুকুতা হীরকে—
কি খেলা খেলিবে আর!
ক্ষণিকের সুখে মজা'য়ে অন্তর,
চাহ কি ছলনা ছার?
দুরাশা-অর্ণবে ভাসি' চিরকাল,
কভু না পাইলে কূল;
সাধনের ধন হারাইলে মন,
হরি-কল্প-তরু মূল!

কি খেলিতে এলে, খেলিলে কি খেলা,
ভাবিয়ে দেখ না কেন?—
সংসার-ছলনে সব(ই) ভুলে গেলে,
অবহেলি' সে চরণ!
তোমার কারণ, হায় যেইজন,
বসিয়ে অনন্ত কোলে,
সুধারাশি রাশি ঢালেন নিয়ত,
মরি কিবা সুকৌশলে;—
ছি ছি ভ্রান্তমন! তুমি কি না তাঁয়,
অনাদর করি' সুখে,
গরল-কলসে বাঁধি গলে সদা,
"সে"-গুণ গাইছ মুখে!
নাহিত বদনে বিভু-গুণ-গান,—
অবিদ্যা-অর্চ্চনে রত;
সময়-প্রবাহ চলিছে, রে চিত!
অবজ্ঞা করিয়ে' কত!
দেখ্ দেখ্ চাহি, যুড়ি যুগ্মকর,
নিবেদি তুহারি পায়,
সে রাঙাচরণ বিনে, মূর্খ মন!
উপায় না দেখি হায়!

শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়।

ভালবাসা।

আমি যাহাকে ভালবাসি, সে যদি আমায় উপেক্ষা করে, আমার 'বুকভরা আশায় শ্মশানভরা ছাই' ঢালিয়া দেয়, সে কষ্ট রাখিতে স্থান সংসারে কোথাও আছে কি? কেবল ভালবাসার খাতিরে ভালবাসা হইলে, মানুষ প্রতিদানে হতাশ হইয়াও কোন-

রূপ কষ্টানুভব করে না; কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-স্পৃহা-জনিত ভালবাসাই মনুষ্যজীবনকে নিরাশায় অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

ভালবাসা এক পবিত্র সুনির্ম্মল স্রোতস্বিনী। ইহা মরু-সদৃশ মনুষ্য-জীবনকে উর্ব্বর করে,—মূল্যবান্ করে। যে ভালবাসায় সে শক্তি নাই, তাহা ভালবাসা নয়,—ইন্দ্রিয়-লালসা। প্রথম যৌবনের প্রণয় বড়ই ভয়ঙ্কর, ইহা কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-নিবৃত্তির উপায় অন্বেষণ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ আমাদের সর্ব্বস্ব নহে। লালসাপূর্ণ ভালবাসা—স্বেচ্ছাচারিতা; সুতরাং পবিত্রতাশূন্য। যৌবনের স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, কেহই সুখী হয় নাই; হইতেও পারে না।

পবিত্রতার অভাবই নরক। যত কিছু সুন্দর ও পবিত্র, তৎসমুদয়ই স্বর্গের। তাই কবি অনন্তমুখে গাহিতেছেন, "Love is Heaven and Heaven is Love." ভালবাসার বীজ প্রথমতঃ অসীম সংসারের সীমাবদ্ধ মানব-হৃদয়ে উপ্ত হয়। ক্রমে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তৎপরে বিশ্বের মূলীভূত যে ঐশীপ্রেম, তাহাতে লীন হয়। সান্তের ও অনন্তের একীকরণ কেবল এইখানে। 'বিল্বমঙ্গলের' ভালবাসা সর্ব্বাগ্রে ঘৃণিতা বেশ্যা চিন্তামণির প্রতি সমর্পিত হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গল বেশ্যা চিন্তামণি হইতে কালে জগৎ-চিন্তামণির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। আত্ম-বিস্মৃতি না হইলে, হৃদয়, মন, সর্ব্বস্ব, সঁপিয়া একজনে প্রেম করা, মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আত্ম-বিস্মৃতি জন্মিলেই আমরা আমাদের একান্ত বাঞ্ছিত প্রণয়াস্পদকে বাহিরে, ভিতরে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। "কালমেঘ কালচুল, হেরি' সদা প্রাণাকুল, কৃষ্ণরূপে রাধার সই জীবন মরণ।"—রাধার এই উক্তি, আত্ম-বিস্মৃতির কি সুন্দর উদাহরণ! কৃষ্ণ-প্রেমে রাধার তন্ময়ত্বভাব না জন্মিলে, আমরা রাধিকার মুখে, এমন পবিত্র আক্ষেপ-সূচক বাক্য শুনিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। যে প্রেমে, পবিত্রতার স্রোত খরতরবেগে প্রবাহিত, সমাজ-বন্ধনভয়, সে প্রেমের স্বাভাবিকী গতিকে রোধ করিতে পারে কি?—কখনই না।

তোমার প্রতি আমার লোভ-লোলুপ দৃষ্টি নাই। তুমি সমাজের ভয়ে অত জড় সড় হইতেছ কি নিমিত্ত? সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হইলে? সমাজকে ভয় করা আবশ্যক। কিন্তু আমরা তদ্বিরুদ্ধে কোন কর্ম্মই করিতেছি না। ভালবাসিতে পার ভালই, না পার, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিও না, "পাপ যত ভালবাসা অসাধু প্রেমিক।"

তুমি আমায় ধরা দাও, আর নাই দাও, তাহাতে আমার ভালবাসা বিন্দু পরিমাণেও হ্রাস হইবে না। কারণ,——

"যে টুকু সৌন্দর্য্য, যে টুকু তোমার।
আমাতে তাহার বিকাশ জাগে।
আমাতে ধরার সকলেতে আর,
তোমারি সৌন্দর্য্য নেহারি আগে।"

রাখাল-বালক-রূপী শ্রীকৃষ্ণ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিলে, বিল্বমঙ্গল যেমন বলিয়াছিলেন,—

"হস্ত-নিক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাষি পৌরুষং পলয়ামি তে॥"

সেইরূপ তুমি আমায় স্পর্শের বহির্ভূতা হইলেও, আমায় হৃদয় হইতে মুছিয়া যাইতে পারিবে কি?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠগী জীবনী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ঠিক রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, পিতা আমাদের ডাকিয়া ঘুম হইতে তুলিলেন,—আমাদের শেষযাত্রা আরম্ভ হইল। আমি আমার মা'র সঙ্গে পাল্কীতেই রহিলাম। আহা! কি জানি, মাতার প্রাণ বুঝি সমস্ত জানিতে পারিয়াছিল—বুঝি তাঁ'র অন্তরাত্মা বুঝিতে পারিয়াছিল

যে, আর তিনি তাঁ'র প্রাণসম পুত্রের মুখচন্দ্র দেখিতে পাইবেন না—তাই তিনি বারম্বার আমায় চুম্বন করিতেছিলেন।

আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছিল, কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়, চাঁদের যেন সেরূপ আলো ছিল না, মেঘে যেন কতকটা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাতও হইতেছিল—তাহাতে আমাদের পাল্কীখানিও বড় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। যখন আমরা এই রকম করিয়া কষ্টে প্রায়ই একক্রোশ পথ গিয়াছি, তখন পাল্কীর বেহারা হঠাৎ পাল্কীখানি মাটীতে নামাইয়া বলিল,—"আর আমরা এমন করিয়া চলিতে পারিব না। অন্ধকারে মৃত্তিকায় পদ বসিয়া যাইতেছে, চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, এই কয়েক ঘণ্টা এইখানে অবস্থান করিয়া কল্য প্রাতঃকালে না হয়, যাওয়া যাইবে?"

আমার পিতা বাহকদিগের সহিত ভয়ানক ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাহা দেখিয়া শুনিয়া, কাকুতি মিনতি করে, পাল্কীর বাহিরে আসিলাম, সেই আগন্তুক সৈনিক পুরুষটীর সহিত অশ্বারোহণে যাইতে চাহিলাম। তিনি প্রথমে তাহাতে অসম্মতভাব দেখাইলেন—কিন্তু সে সমস্তই মৌখিক। তিনি শেষকালে যেন অনিচ্ছাসত্বেও কেবল আমার আবদারের জন্যই আমায় ঘোড়ায় তুলিয়া লইলেন। পিতার সহিত পাল্কীর বেহারাদের বাদ বিসম্বাদ তখনও চলিতে লাগিল।

আমি ঘোড়ার উপর উঠিয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম যে, "আমাদের সঙ্গে যে সকল সৈনিক পুরুষগণ ছিলেন, তাঁহাদের ত আর দেখিতে পাইতেছি না।"

আমার কথা শুনিয়া তাঁহারা যেন সাবধান হইল—তিনি আগন্তককে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অগ্রাহ্যভাবে উত্তর দিলেন, "কে জানে কোথায় গিয়াছে—বোধ হয়, এতক্ষণ তাহারা সহরে পৌঁছছিয়াছে, আমরা যে এখানে বিপদে পড়িয়াছি, তাহা ত আর তাহারা জানে না—কাজেই তাহারা অগ্রে গিয়া পড়িয়াছে—আমরাও এখনই গিয়া তাহাদের ধরিব।"

যাহা হউক, আবার আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইল। শেষকালে আমরা এক নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; নদীটী ছোট, পরপারে যাইবার জন্য একটী ছোট কাষ্ঠের সেতু আছে। সেই সেতুর উপর আমায় উঠাইয়া দিয়া আগন্তুক ঘোড়ার উপর হইতে অবতরণ করতঃ আমায় বলিলেন,—"তুমি নির্ভয়ে ঘোড়ার উপর বসিয়া থাক, ঘোড়াটী আপনি তোমায় ওপারে লইয়া যাইবে—তোমায় হাঁকাইতে হইবে না। আমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, আমি নদীতে নামিয়া একটু ঠাণ্ডাজল খাইয়া আসিতেছি।" আমি তাঁহার কথাতেই সরল অন্তরে বিশ্বাস করিলাম। যেমন পারিলাম, সেইরূপ করিয়া ঘোড়াটীকে চালাইতে লাগিলাম। সেতুর পর-পার যেন ভয়ানক জঙ্গল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যখন আমি এই রকম করিয়া সেতুর ঠিক মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি,—এমন সময় পশ্চাতে মাতা ও পিতার ভয়ানক চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম—তাহার পরেই আবার হঠাৎ সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। আবার ভয়ানক ঝটা-পটীর শব্দ শুনিতে লাগিলাম। ভয়ে আমার আত্মা-পুরুষ উড়িয়া গেল—পশ্চাতে যেমন চাহিয়া দেখিতে যাইব, অমনি ঘোড়ার উপর ঝোঁক না রাখিতে পারিয়া, দড়াম্ করিয়া নীচে পড়িয়া গেলাম—মস্তক কাটিয়া গেল—অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া, সেইস্থানে সেতুর উপর পড়িয়া রহিলাম। সে কাটার দাগ এখনও আমার মস্তকে রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে চাহিয়া দেখিলাম, আমার মাতার পাল্কী ও আমাদের গরুড় গাড়ী লুট হইতেছে। আমি তাহা দেখিয়াই অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম। চীৎকার শুনিয়া লুণ্ঠনকারীদের মধ্য হইতে একজন দৌড়িয়া আসিল। এ লোকটা আর কেহ নহে—সেই—প্রথমদিন আগন্তকের সঙ্গে একটা কুশ্রী চেহারার লোক আসিয়াছিল, যাহাকে দেখিয়া প্রথমদিনই আমার হরিভক্তি উড়িয়া গিয়াছিল—এ সেই ব্যক্তি। সে আমার নিকটে আসিয়া বলিল—"ওঃ! তোকে আমরা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম—বদমাইস ছোক্‌রা! এমন করে চীৎকার কচ্ছিস্? দাঁড়া তোর চীৎকার

করা বার কচ্ছি।" এই বলিয়া সে একখানা কড়গোছের রুমাল আমার গলায় জড়াইয়া দুই হাতে দুইদিক হইতে এমন টানিতে লাগিল যে, আমার প্রায় শ্বাস-প্রশ্বাস শক্তি বন্ধ হইয়া আসিল। এমন সময় আর একজন লোক, সেইস্থানে দৌড়াইয়া আসিল,—ইনিই সেই আগন্তুক সৈনিক পুরুষ। তিনি আমার এই অবস্থা দেখিয়া, সেই কুশ্রী চেহারার ব্যক্তির হাত ধরিয়া ফেলিলেন, এবং খুব ক্রোধস্বরে বলিলেন—"খবরদার! তুই উহাকে স্পর্শ করিস্ না!" এই কথায় তাহাদের দুইজনে পরস্পর ঝগড়া হইল, দুইজনেই কটিদেশ হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিল। তাহার পর কি হইল, আর আমার মনে নাই। কেন না, এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া আমার এত ভয় হইয়াছিল যে, আমার জ্ঞান-চৈতন্য-রহিত হইয়া, আমার বোধ হয়, আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম।

যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম—যেন কে আমার মুখে ও চক্ষুতে জলের ঝাপ্টা দিয়া চেতন করিবার চেষ্টা করিতেছে। চাহিয়া প্রথমে আমি কি দেখিলাম? ওঃ সে ভয়ানক দৃশ্য! এখনও মনে হইলে, আমার শরীর শিহরিয়া উঠে, মস্তক ঘুরিয়া যায়—চারিদিক যেন অন্ধকার দেখি। দেখিলাম, আমার পিতা, মাতা, পাল্কীর বেহারাগণ, চাঁপাদাসী সকলেই হাত পা ছড়াইয়া দাঁত মুখ খিঁচিয়া চীৎপাত হইয়া পড়িয়া আছে!!—দেখিয়া আমার মনে হইল, কি ভয়ানক যন্ত্রণার সহিত তাঁহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে! সে সময়ের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা যদিও আমার ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু সে দৃশ্য যে অতি ভয়ানক বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমার এই পর্য্যন্ত স্মরণ হয় যে, আমি মৃতমাতার বিকৃত বদন সন্দর্শনে তাঁহার বক্ষের উপর পতিত হইয়া, ভয়ানক ক্রন্দন করিতে আর মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিলাম। এখনও আমার সে কথা স্মরণ হইলে, আমি চমকিত ও শিহরিত হই! আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই ভয়ানক হত্যাকাহিনী, বহুদিন

পরে আমি একজন বৃদ্ধ ঠগীর নিকট শুনিয়াছিলাম। যথাসময়ে আমি সে ঘটনার উল্লেখ করিব। [ক্রমশঃ]

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

দুঃখিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(হরলাল দাদার কথা)

আমার নাম হরলাল। আমি এখন সৌদামিনীকে দেখিয়া পাগল হইয়াছি! কেমন করিয়া সে আমার হইবে?—কেমন করিয়া তাহার বদনমণ্ডল একবার দেখিব? কেমন করিয়া—কোন সুযোগে তাহার অমৃতমাখা কথা শুনিব?—ইহাই দিনরাত্রি আমার চিন্তার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। আমি কেমন এক প্রকার স্থির হইতে পারিতেছি না। সদাসর্ব্বদা যেন আমি কেমন হইয়া থাকি; ভাল করিয়া আমার এ অবস্থা আপনাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। আমার ন্যায় যদি কেহ পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে থাকেন, তবে তিনি এ অবস্থা নিশ্চয় অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেন।

প্রথম যে দিন সৌদামিনী আমাদের বাড়ীতে আইসে, সে দিন সে আমার ভগিনীর পরামর্শ-ক্রমে আমার সহিত একবারমাত্র অসঙ্কুচিতভাবে কথা কহিয়াছিল। তখন আমি তাহার কথা শুনিয়াছিলাম, তাহার মুখচন্দ্র দেখিয়াছিলাম।

আমি সেই অবধি তাহাকে ভগিনীর ন্যায় দেখিতাম। ক্রমে আমি শুনিলাম,—"সৌদামিনী বিধবা"। আমি এই সংবাদে বড়ই কষ্ট পাইলাম। মনে মনে কহিলাম, "হায় বিধাতঃ! এমন সৌন্দর্য্য গোপনে—অযতনে শুখাইয়া যাইবে বলিয়া, কি সৃজন করিয়াছিলে?"

ক্রমে যতই আমি সৌদামিনীকে দেখিতে লাগিলাম,—যতই তাহার কষ্ট ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার মন যেন কেমন

এক প্রকার হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহার কষ্ট কিসে নিবারিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। "বিধবা বিবাহ" ভিন্ন আর অন্য উপায় দেখিতে পাইলাম না। একদা আমার ভগিনীর (সৌদামিনীর বিমাতা) সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া, সৌদামিনীকে সে কথা বলিয়াছিলাম। সৌদামিনী সে কথা শুনিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল, কোনও কথা বলিল না। সেই অবধি সৌদামিনী আর আমার সহিত কথা কহিত না, আমিও তাহার নিকট যাইতাম না।

আমার পাপ মন, অনেক পাপকার্য্য করিয়া কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে; পাপকার্য্যে ভয় ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। এখন আমার মন সৌদামিনীকে আমার আপনার করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। কি করিব? কেমন করিয়া সৌদামিনীকে পাইব?—এই পাপ-চিন্তায় আমার মন সদাসর্ব্বদা উদ্বিগ্ন।

সৌদামিনীকে পাইতে আমি কি না করিব? সকলই করিব, প্রাণ দিতে হয় তা'ও দিব! তবুও তাহাকে ছাড়িতে পারিব না। আমার আশা ফলবতী হইবার এক অন্তরায়—আমার ছোট ভগিনী। সে আমাকে ভালরূপ জানে, সেই জন্য সৌদামিনীকে আমার নিকটে আসিতে দেয় না। আমি কখনও তাহার নিকটে যাইলে, শান্তি তাহাকে আমার নয়ন পথের অন্তরালে লইয়া যাইতে চেষ্টা পায়। আমি কি করিব? কেমন করিয়া সৌদামিনীকে পাইব? বুঝিতে পারিতেছি না।

একটী উপায় আছে। সেই সুযোগ পাইতে হইলে আমায় কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। চারুবাবু অবশ্য পূজার ছুটির সময় শান্তিকে তাহার দেশে লইয়া যাইবে, তখন আমি নিশ্চয় সৌদামিনীকে হাতে পাইব। তখন তাহাকে পায়ে ধরিয়া আমার হইতে সাধিব। তাহাতেও না হয়, বল, কৌশল যাহা আবশ্যক হইবে, তাহাই অবলম্বন করিতে আমি নিশ্চয়ই প্রবৃত্ত হইব।

প্রবৃত্ত ত হইব, কিন্তু এখন উপায় কি? আমি যে ঠিক থাকিতে

পারিতেছি না। মন যে কেমন করিতেছে! একদিন বসিয়া বসিয়া এইরূপ নানা ভাবনা ভাবিতেছি, এমন সময় সৌদামিনী আমার নিকট দিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণকালের মধ্যে আমার হৃদয় যেন বিদ্যুদ্বেগে অণুপ্রাণিত হইয়া উঠিল; আমি মনে করিলাম, তাহাকে ধরি। ভয়, লজ্জা, আমাকে ছাড়িয়া, তখন কোথায় পলাইয়া গেল! উঠিলাম, দৌড়িয়া যেমন তাহাকে ধরিতে যাইব, অমনি ঘরের চৌকাঠে পা লাগিয়া পড়িয়া গেলাম; মস্তকে দারুণ আঘাত লাগিল—আমি সংজ্ঞা হারাইলাম।

সংজ্ঞা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে, আমাতে আর আমি রহিলাম না। প্রাণ আমার যেন স্বর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিল, চক্ষু যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। দেখি,—সৌদামিনী ও শান্তি দুইজনে আমার দুইদিকে বসিয়া আমার শুশ্রূষা করিতেছে। সৌদামিনীর বদনমণ্ডল আজ অবগুণ্ঠনে আবৃত নাই, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যেন আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি যখন চক্ষু একবার উন্মীলিত করিলাম, তখন উক্তরূপ দেখিয়া, আমি আবার নয়ন মুদিত করিলাম। মনে মনে সেই স্বর্গীয়ভাব ভাবিতে লাগিলাম।

দূর হউক, চক্ষু চাহিয়া যতক্ষণ পারি দেখি,—বিবেচনা করিয়া আবার চক্ষু উন্মীলন করিলাম। আবার সেই স্বর্গীয় শোভা আমার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইল। আমি মুহূর্ত্তমাত্র সেই সুখভোগ করিতে না করিতেই আমার সর্ব্বসুখের অন্তরায় সেই শান্তি, আমায় চক্ষু চাহিতে দেখিয়া বলিল,—"সৌদা! যাও, ও ঘরটা গুছাইয়া রাখিয়া আইস, দাদা ত এখন অনেক সুস্থ হইয়াছেন। ভাবনা কি?"

এই কথা শুনিয়া সৌদামিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। আমার হৃদয়াকাশে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল। আমি মনে মনে কতবার যে শান্তির মৃত্যুবাসনা করিলাম, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমার যাবতীয় কষ্টের মূল শান্তি যত শীঘ্র দূর হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইলাম। [ক্রমশঃ]

অবসান।

হেথা হ'তে চলি' যাও, সুখ-আশা মিছে।
কি দিব? কি আছে আর? সকলি গিয়েছে!
গেছে সুখ-সাধ-আশা,
বুক-ভরা ভালবাসা,
বাসি অশ্রু,—প্রাণ, শুধু পড়িয়া রয়েছে।
প্রাণের রাজত্ব যেথা,
বাসি প্রাণহীন সেথা,
আদর পাইবে না ত, ঠেলে-ফেলা আছে!
তোমারও নূতন চাই,
পুরাতনে তৃপ্তি নাই,
যেখানে নূতন পাও, যাও তা'র কাছে।
কি দিব? কি আছে আর? সকলি গিয়াছে।

শ্রীমতী কিরণশশী বসু।

আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ

"পাগলের প্রলাপ"।

গদ্যে নহে, পদ্যে। পাঠক হাসিবেন না, প্রথমে একথা পড়িবার অনেক কারণ আছে। আজকাল লোকের যে রুচি, আর আমার যে বক্তব্য বিষয়, তাহাতে পাঠক মহাশয় নাম শুনিয়াই ইতস্ততঃ করিবেন। আর যদিও অনিচ্ছার সহিত পড়িতে যান, তাহার উপর বাঙ্গালা গদ্যের নাম শুনিয়াই, পড়া দূরে থাকুক, পশ্চাৎ ফিরাইয়া চৌদ্দ হাত দূরে অবস্থান করিবেন। সুতরাং প্রথম হইতে রুচি ফিরাইবার জন্য বলিতেছি, 'গদ্যে নহে, পদ্যে।' পাঠক মহাশয় আসুন, অরুচির কোন কারণ নাই। আরও দেখুন, সংস্কৃত শ্লোক

নয় যে, আপনার মন উঠিবে না। ল্যাটিন্ বা গ্রীক্ নয়, যে নাম শুনিয়া চমকিত হইবেন, পার্শীও নয়, আরবীও নয়, উর্দ্দুও নয়, হিন্দিও নয়; জর্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, মার্হাট্টা, গুজরাটী প্রভৃতি কিছুই নয়। কেবল বাঙ্গালাও নয়, কেবল ইংরাজীও নয়। নূতন ভাষা! ভাষার নাম জানি না, তবে এইমাত্র জানি যে, হে উনবিংশ শতাব্দীর সুরুচিশালী বাঙ্গালি পাঠক! হে 'পঞ্চশস্য' মিশ্রণাভিলাষী কলির কথক! ইহা আপনারই প্রীতিদায়িনী—আপনার শয়নে, স্বপনে, চলনে, আচার ব্যবহারে, আহারে, পানে, সর্ব্বত্র সতত সহচারিণী, সুরসশালিনী বাণী-বিন্যাসে বিরচিত। পড়ুন পাঠক! আপনারা পিছাইবেন না।

আর এক কথা,—শুনিতে পাই, আজকাল পাঠকগণ প্রণেতার আকার-প্রকার, গুণপনাদির পরিচয় না পাইলে তাঁহার পুস্তক বা প্রবন্ধ পড়িতে চাহেন না। সর্ব্বনাশ! আমি যদি আমার পরিচয় না দিই, তবে কি আমাকে বা আমার লেখাকে পায়ে ঠেলিবেন? ওহো বিড়ম্বনা! না পাঠক, আপনি এতদূর নির্দ্দয় হৃদয় হইলে চলিবে না। আমি আপনাদের জন্য এতদূর করিলাম, আর আপনার নিকট কলিকামাত্রও কৃপা না পাইলে, আমার সংসার চলে কই? তবে যদি নিতান্তই পরিচয় চান, আমি এইমাত্র দিতে পারি যে, আমি "পাগল"—কেন না লোকে বলে! 'পাগল' শব্দের অর্থও আমি জানি, 'পাগল' শব্দ কোথায় প্রযোজ্য তাহাও জানি; কিন্তু আমি নিজে পাগল কি না, তাহা জানি না। আমি "পাগল"—লোকে বলে তাই আমি "পাগল"। কারণ একা তোমার বা আমার কথায় কি আসে যায়?—দশে যাহাকে যেরূপ বলে সে তাহাই হয়; দশে আমায় "পাপল" বলে সুতরাং আমি "পাগল"।

এখন কথা এই—"দশে" কে? কে? রাম, শ্যাম, হরি, যাদব, মাধব ইত্যাদি কেহই আমাকে পাগল বলেন না। তবে বলেন, নরেনবাবু, হরেনবাবু, সতীশবাবু, ক্ষিতীশবাবু ইত্যাদি। কারণ আমিও এক সময় তাঁহাদের মত এক বাবু ছিলাম; কিন্তু এখন আমায় 'বাবু' বলিলে

আমি রাগিয়া উঠি; সুতরাং তাঁহাদের মতে আমার স্থান 'পাগ্‌লা গারদে'। স্বীকার করিলাম, আমি "পাগল"। আমি বাবু-বিদ্বেষী "পাগল" আমি "প্রলাপ" বকি। পাঠক! আমি কেমন পাগল, আমার কেমন প্রলাপ? অনুগ্রহ প্রকাশে পরবর্ত্তী পংক্তিগুলির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিবেন কি? যদি ভাল বোধ হয়, তবে আশা করি, দয়া করিয়া একখানি সুপারিশ পত্র দিবেন, যদি বিরক্তি বোধ হয়, "পাগল" বলিয়া ক্ষমা করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি——

[১]

পাশ্চাত্য গগন হ'তে সভ্যতা তপন,
প্রখর উত্তাপে এবে,
তাপিত করিছে সবে;—
কি ভীষণ ওয়েষ্টের Civilization!
Hindu-society পুনঃ হল Organis'd
অশনে, বসনে সবে Anglicis'd!

[২]

নাহিক প্রবৃত্তি কা'র জাতীয়ভাষাতে
ইংরাজের Language,
প'ড়ে পায় পূর্ণতেজ!
অরুচি জন্মিল বাবু বাঙ্গালীর ভাতে!
বিস্কুট, বীফ্, ব্রেড, মটন্, ভোজন!
রম্, সেরি, শ্যাম্পেন্ পানীয় গ্রহণ!

[৩]

গেল ধুতি চাদরের ব্যবহার উঠে,
পেণ্টুলেন, হ্যাট্, কোট,
চলনের কিবা চোট্!
শোভিত চরণ কিবা ডসনের বুটে!
রোধিতে ভাস্কর-গতি মনের বাসনা,
হায় বিধি Tail-less একি বিড়ম্বনা!

[৪]

সুচিকণ শোভে আহা কিবা শ্মশ্রুজাল
মোহিত সে শোভা হেরি,
শিরেতে বঙ্কিম টেরি,
শোভে যেন সুবিস্তৃত মর্হাট্টা-কেনাল
আরো যেন কটাক্ষের ইলেক্ট্রীলাইটে
শোভে হ্যারিসন্‌রোড কিদিন নাইটে

[৫]

Hair কাটিতে চাই Hair-cutter
পশ্চাতে নাহিক চুল,
(নাপিতের বুঝি ভুল,)
সম্মুখে সুলম্ব-চুলে ঢেউ খেলে তার;
ভগবতী ভাগীরথী ভুলি ভোলানাথে
সানন্দে বিহরে বুঝি বাবুদের মাথে!

[৬]

অদ্‌ভুত কত দেখি বাবুদের কাছে
সিগারেট বার্ডসাই,
(আরো কত ক'ব ছাই,)
বাবুদের সুবদনে সতত বিরাজে,
দেখিয়া তা'দের এত আদরআব্দার,
Hubble-bubble ভায়া কেঁদে হল সার।

[৭]

বিলাসে বাবুর দেখি অতীব মনন,
পমেটম, ল্যাভেণ্ডার,
আরো রোজ্ ওয়াটার,
অটোডি-রোজের কথা Exaggeration
হাতে Hand-kerchief সুগন্ধি-চর্চ্চিত,
বিলাসিনী বিনোদিনী করিতে মোহিত।

[৮]

চরণে ষ্টকিন্, নাই শীত গ্রীষ্মজ্ঞান!
হৃদি' পরে চেন ঘড়ী,
হাতে শোভে দিব্য ছড়ি,
চর্ম্মচক্ষে বাবু ভায়া দেখিতে না পান
সদাই আঁখিতে আঁটা পাথরের ঠুসি,
প্রতিশোধে সদা Ready ব্রহ্মঅস্ত্র ঘুসি!

[৯]

বর্ষাকালে বৃষ্টিজলে সৃষ্টি ভেসে যায়,
চিৎপুর চাঁপাতলা,
যোড়াসাঁকো, নিমতলা,
ডুবে গেল পথ চলা হ'ল মহাদায়;
চিকণ বার্ণিশ বুট অতি মনোহর,
ডুবাইতে জালবাবু বিষণ্ণ অন্তর;—

[১০]

একবার মনে ভাবে খুলে ল'য়ে যাই,
ঠেকেছেন মহাদায়,
বাবু চারিভিতে চায়,
যে দিকেই চায় লোক একি রে বালাই
সাত পাঁচ ভাবি জুতা জলেতে নামায়;
ঘরে গিয়া গুর শোকে সুখ নাহি পায়!

[১১]

বাবুদের পরিচয় জানা বড় দায়,
কা'রো নাম জিজ্ঞাসিলে,
জাত বুলি যায় ভুলে,
বিদেশী সঙ্কেতে সদা প্রশ্নে দেন সায়;
কেহবা K.N. Sen, কেহ P. P. Pal
জানিতে বাবুর নাম বিষম জঞ্জাল!

[১২]

বাবুদের ভাষা বুঝা কঠিন ব্যাপার;
আধ ইংরাজীর বোল,
সে বিষম গণ্ডগোল,
পিতায় ডাকিতে বাবু বলেন Father
ক্ষুধায় মাতায় ডাকে Dear Mother!
"I feel hungry soon bring the dinner!"

[১৩]

অবাক জননী শুনি' তনয় বচন!—
"বল্ বাছা বাঙ্গলা বোল,
বুঝি না ত এ সকল"
ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলে বাবু সন্তান তখন,—
"থাকিতে যদ্যপি বাপু সাহেবের কাছে
জানিতে এ সব বোলে কত মধু আছে!"

[১৪]

গুরুজন-নমস্কারে ভাবে নানাখানা
কলার ইস্তিরি করা,
কি দায় প্রণাম করা!
কেমনে নমিবে সদা বাবুর ভাবনা!
এমন ইস্তিরি আহা হইলে Damage,
Specially লেডীর চক্ষে হইবে Savage!

শ্রীকুশীলাল, কাপাসী।

কলিকাতার চিত্র।

[একখানি সংগৃহীত ফটোগ্রাফ্]

"দিল্‌মে এসা ভাওনা সে ভাই,
কল্‌কাত্তামে আয়া ;
ক্যাসা ক্যাসা ম্যজা হাম্
হিঁয়া দেখ্‌নে পায়া।
ব্রেহ্ম সমাজ, হরি সমাজ
গির্জ্জা মস্‌জিদ্ ;
এক লোটেমে দুধ-পানি
মিল্‌তা সব চিজ্।
বাঙ্গালিকো ল্যাড়্‌কা সব
ক্যাসা ম্যজা পাতা ;
ঢুঁড়্‌নে ঢুঁড়্‌নে চাখ্‌নে চাখ্‌নে
সব ঘ্যর্‌মে যাতা।
টম্‌সেন, কেশব সেন,
আওর উইল সেন—
কল্‌কাত্তাকো মাট্টি কর্‌তা
এই তিনঠো সেন।
ঘ্যর্ ছোড়্‌কে কেত্তা মেইয়া
সাজ্‌তা যেন ছবি ;
বারাণ্ডাতে বৈঠে বৈঠে
ক্যর্‌তা বেয়াদবি !
ছোটা বড়া আদ্‌মি সব্
বাহির ক্যর্‌কে দাঁত ;
ঝাপট্ মার্‌কে ঝাড়্‌তা সব্
আংরেজিকে বাৎ।
উড়িয়া আদ্‌মি ব্যল্‌তা জোরে,
"কাম হিয়ার বাবু !"
কল্‌কাত্তেকা কাম্ দ্যেখ্‌নেসে
হাম্‌বি হোতা কাবু।
আদ্‌মি সব্ একঠো কৌড়ি
ঘ্যর্‌মে নাহি লেতা,
কল্‌কাত্তাকে প্যয়সা সব্
কল্‌কাত্তামে দেতা।
গাঁজা গুলি চরস্ চণ্ডু,
সরাব্‌মে হ্যায় ভোর,
কল্‌কাত্তাকো পোনের আনা
আদ্‌মি ন্যেশা খোর।
হিঁয়া কলেজ, হুঁয়া কলেজ
কলেজ বি ঠাঁই ঠাঁই ;
কলেজ মে হাম্ কামতো ভাইয়া
কুচ্‌বি দেখা নাই।
ভিতর মে হ্যায় আদত কাচ্চা,
বাহির মে হ্যায় পাক্কা ;
বাৎমে দেখা আচ্ছা নিরেট্
কাম্‌নে দেখা ফাক্কা।
যে দিক্‌মে হাম্ আঁখ্ নিকালা,
দেখা জুয়াচোর,
সাচ্চা বাৎবি মিল্‌তা নাহি
ঝুট্টা বাৎমে ভোর।
শ্রীউমেশচন্দ্র বৈতালিক।"

শোক-পত্র।

* কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় ও বঙ্গের সার ওয়াল্টার রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যু উপলক্ষে :—

রাজকৃষ্ণ।

যাঁর কবিগাথাচয়,
কীর্ত্তিমাল্যে করি' চয়,
বঙ্গের গৃহ সকলে আছে সুশোভন।
সেই 'রাজকৃষ্ণ' নাই,
বঙ্গের কপালে ছাই,
তাই হের তাঁর আজ শূন্যসিংহাসন।
ভাল ছেলে তোর ভালে,
টেঁকে না মা কোন কালে,
তাই সে দুরন্তকাল তাহারে হরিল,
বঙ্গভাষা, বঙ্গভূমি,
কাঁদ কাঁদ কাঁদ তুমি,
শমন তোমার বক্ষে আগুণ জ্বালিল।
মোদের কি আছে বল,
সম্বল চক্ষের জল,
তাই বা কতই আছে করিব ক্রন্দন,
নিভে না হৃদয়জ্বালা,
পুড়ি' হই ঝালাপালা,
সকলেই শোক-তপ্ত কে করে সান্ত্বন ?

—

বঙ্কিমচন্দ্র।

শোকের উপর শোক,
কিসে বল বাঁচে লোক,
শ্রীবঙ্কিম ইহলোক করি' পরিহার।
বঙ্গভূমে কাঁদাইয়ে,
বঙ্গবাসী তেয়াগিয়ে,
আনন্দে আনন্দধামে করেন বিহার।
কবির বিহনে যত,
বঙ্কিম বিহনে তত,
বঙ্গবাসী ধন-শূন্য হ'য়ে আছে প'ড়ে।
কেন রে দুরন্তকাল !
বঙ্গ'পরে যত ঝাল,
ঝাড়িয়া রতনে যত লয়ে যাস্ কেড়ে ?
দয়া নাহি তোর প্রাণে,
তাই বুঝি প্রতিক্ষণে,
এমন করিয়া তুই হরিস্ রতন ?
নাহি কথা তোর সনে,
মাগি সেইজন স্থানে,
স্বর্গধামে তাঁহা দোঁহে করিতে যতন।

—

* আমাদের চৈত্রমাসের "বীণাপাণি" প্রচারিত হইবার পর, এই শোকাবহ ঘটনাদ্বয় সংঘটিত হয়, তজ্জন্য গত মাসে আমরা উক্ত মহাজনদ্বয়ের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই।—সম্পাদক।

সমালোচনা।

'পুরোহিত'—মাসিক পত্র ও সমালোচন। পঞ্চম সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। আজকাল যত মাসিকপত্র পত্রিকা দেখিতেছি, তন্মধ্যে এইখানি অতি উচ্চদরের হইয়াছে। অনেক কৃতীলেখকের লেখনী-প্রসূত গভীর-ভাবপূর্ণ প্রবন্ধে ইহা পরিপূরিত হইতেছে। "আষাঢ়ে বৈদ্যের হাঁসাড়ে কাণ্ড" নামক একটী সুদীর্ঘ, অথচ অসার প্রবন্ধ "পুরোহিতে" স্থান পাইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, "পুরোহিত" জীবিত থাকিয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে সুপুরোহিতের কার্য্য করিতে থাকুক, ইহাই প্রার্থনা।

'গৃহস্থ-সুহৃদ'—ত্রৈমাসিক পত্র, ১ম সংখ্যা প্রথমবর্ষ, প্রথম ভাগ। কবে প্রচারিত হইয়াছে জানি না, পত্রের কোন স্থলে তাহার উল্লেখ নাই—থাকা উচিত ছিল। যাহা হউক, লিখিত বিষয় পাঠে গৃহস্থমণ্ডলীর উপকার দেখিতে পারে।

'জনা'—গত রবিবার আমরা "মিনার্ভা" রঙ্গমঞ্চে "জনার" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় মন্দ হয় নাই। জনা, প্রবীর ও বিদূষক ইহাদেরই অভিনয় বিলক্ষণ প্রশংসাযোগ্য। ক্ষত্র-দুহিতা জনার তেজ, প্রবীরের মাতৃ-ভক্তি, চক্রীর চক্র ইত্যাদি দেখিবার অনেক জিনিস "জনায়" আছে। অভিনয়ে ব্যবহৃত দৃশ্যপটগুলি অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। সাধারণের নিকট কবি ও চিত্রকরের আদর প্রার্থনীয়।

'মুই হ্যাঁদু'—গত বড় দিনের সময় হইতে "রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে" "মুইহ্যাঁদু" নামক নাট্যরঙ্গ খানির অভিনয় হইতেছে। "মুইহ্যাঁদু" ভণ্ড-হিন্দুদলের একখানি "ফটো";—ফটোখানি অতি বিচিত্র হইলেও ইহাতে দেখিয়া শিখিবার অনেক জিনিস আছে। দুঃখের বিষয় যে, কতিপয় কথা বড় খুলিয়া খুলিয়া বলা হইয়াছে। সে গুলি ঈশারায় চালাইয়া লইলে ভাল হইত। রঙ্গালয়, যাহাদিগের জন্য এই "রঙ্গপাদুকা" ব্যবহার করিতেছেন, তাহারা যদি কিছু শিক্ষা না করিয়া থাকেন, তবে তাহারা নেহাত বেহায়া—সমাজের এক একটী অধম জীব।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ সাল। ৭ম সংখ্যা।

দরিদ্রের নিবেদন।

প্রত্যেক বিষয়েরই একটা নির্দ্ধারিত কাল আছে। কোনও ফলই, নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে কিম্বা পরে ফলে না। যে বস্তুতে প্রকৃতি-নিয়মের এই ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, সে বস্তু আশানুরূপ ফল-প্রদানে সম্পূর্ণ অশক্ত। 'কিলাইয়া কাঁঠাল পাকান'র কথা, বোধ করি, অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু অকাল-পক্কফল সুস্বাদু হয় না, অপিচ অল্পেতেই নষ্ট হইয়া যায়।

আজকাল সাহিত্য-সংসারে এইরূপ অকাল-পক্ক গ্রন্থাকর্ত্তার সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অকাল-পক্ক এইজন্য যে, ইহাদের শিক্ষিত বা অর্জ্জিত জ্ঞানের গুরুত্ববোধ, এখনও বয়স-সাপেক্ষ। ইহাদের মধ্যে দুই একজন প্রতিভাশালী-লেখক থাকিলে, তাঁহারও উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিয়া থাকা উচিত। বয়সের পরিপক্কতা, প্রতিভাকে আরও উজ্জ্বল করে; অকাল-পক্ক প্রতিভা, কোন স্থায়ী কার্য্যের জননী হইতে পারে না। ফিল্ডিং চল্লিশ ও পঞ্চাশের মধ্যবর্ত্তী সময়ে Tom Jones লিখিয়াছিলেন। রিচার্ডসন্ Clarissa প্রণয়ন-কালে যাটি বৎসরের কিঞ্চিদধিক বয়স্ক ছিলেন। যখন স্কট Waverly

Novels নামধেয়-গ্রন্থ-নিচয় লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি চল্লিশের কিঞ্চিদধিক বয়স্ক ছিলেন। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত-সমুচ্চয়, প্রমাণ করিতেছে—সর্ব্বপ্রকার প্রতিভারই পূর্ণ-বিকাশ, সময় বা বয়স সাপেক্ষ।

কিন্তু, আমাদের দুরদৃষ্ট-বশতঃ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়রূপ 'পাউণ্ড' হইতে বাহির না হইতে, কেহ বা উহাতে প্রবেশ না করিতেই 'গ্রন্থকর্ত্তা' বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে অতিশয় আগ্রহান্বিত হয়েন। বিশ্ব-বিদ্যালয়রূপ 'পাউণ্ডে' অবস্থানকালে, তাহারা যাহা চর্ব্বণ করে, কতকগুলি তাহাই পুনরুদ্গীরণ করে; আর 'পাউণ্ড' দর্শন যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, তাহারা আশে-পাশে যাহা কিছু পায়, তাহাই উদরস্থ করতঃ রোমন্থন করিতে থাকে। সুতরাং ইহাদের প্রণীত গ্রন্থ-সমূহে গভীর গবেষণা, বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। ভাষা ও ব্যাকরণ-গত দোষ ত 'টাইটেল-পেজ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সম্পূর্ণ' পর্য্যন্ত। এক কথায়, যাহার ণত্ববিধান, ষত্ববিধান বোধ হয় নাই, তিনিও একজন অদ্বিতীয় গ্রন্থকার, তাহার পুস্তকও জগৎকে অমূল্য শিক্ষাদান করিতে সর্ব্বদা মুক্ত-হস্ত!

এই সমুদয় গ্রন্থকারের চর্ব্বিত-চর্ব্বণের দুর্গন্ধে অহরহ জ্বালাতন হইয়াই, অনুমান করি, বাঙ্গালা-সাহিত্যবাজারের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যব-সায়ীগণ ভাল জিনিসের আমদানী এক রকম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

অনেকে বলেন যে, অধিক পড়াশুনা করিলে, প্রতিভার পরকীয় মত-ভারে প্রপীড়িত হওয়া প্রযুক্ত, বিশেষত্ব (Individuality) রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। এরূপ সিদ্ধান্ত যে স্বকপোল-কল্পিত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্য-কারগণ এতাধিক অধ্যয়ন-পরায়ণ ছিলেন যে, শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। রীতিমত শিক্ষা ব্যতীত প্রতিভার স্ফুরণ অসম্ভব। মানব আজীবন শিক্ষাধীন, তাহার সহজাত প্রায় কিছুই নাই। পুস্তক পাঠের সহিত প্রকৃতি-অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। নহিলে, প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সাধ্যের আয়ত্ত নহে।

স্বাধীন-চিন্তাশক্তি দ্বারা, লব্ধ-জ্ঞান-শিক্ষা হইতে নূতন কিছু আবিষ্কার করাই প্রতিভার কার্য্য। যাহার সে শক্তি নাই, তিনি কখনই প্রতিভাশালী নহেন। অনেকে বি-এ, এম্-এ পাশ, মনুষ্য-জীবনের শিক্ষার চরমসীমা মনে করিয়া, গর্ব্বে স্ফীত হয়েন,—'ধরাকে সরা জ্ঞান' করেন। এরূপ ধারণা মূর্খতার একশেষ! বি-এ, এম্-এ পাশ অনন্ত-জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিবার উপায়স্বরূপ। উক্ত উপাধিধারী কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে, সেই উপায় অবলম্বন পুরঃসর, অধিকতর পরিমাণে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু তা'ই বলিয়া, উহাকে জীবনের চরমোন্নতি মনে করিতে পারেন না, অনন্তজীবন—অনন্ত উন্নতি-আকাঙ্ক্ষা। উন্নতি-লিপ্সার সহিত শিক্ষা ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ।

যে দিন মানবজীবন, উন্নতি-আকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইবে, সেইদিন সে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে—শিক্ষার আর প্রয়োজন হইবে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি আমি জগতের কি জানি? প্রাচীনজগতও পৃথিবীর সমস্ত তত্ত্ব অবগত ছিল না। নিউটনের ন্যায় জ্ঞানীও বলিয়াছিলেন, "I appear like a child picking up pebbles on the sea-shore whilst the great ocean of Truth lay unexplored before me" তখন এতাধিক সীমাবদ্ধ স্বল্প জ্ঞান লইয়া, জগৎ-সংসারকে শিক্ষা দিতে যাওয়া, আমাদের ঘোর অজ্ঞানতারই পরিচয়। আর বিশেষতঃ যেখানে নিজের শিক্ষা-গ্রহণই সমধিক প্রয়োজন, সেখানে অপরকে শিক্ষা দিব কি?

তবে, একটা সুখের বিষয় এই যে, অনেকগুলি বঙ্গ-সন্তান মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদের এই সেবা সম্পূর্ণ না হইলেও, কতকটা আন্তরিকতা বিবর্জ্জিত। যাহা আন্তরিকতাশূন্য, তাহা কোনদিন স্থায়ী হয় না, হইতেছেও তাই। মাতৃভাষার সেবা একান্ত বাঞ্ছনীয় হইলে, সিদ্ধি-লাভের জন্য কঠোর সাধনা চাই। জ্ঞানানুশীলন উদ্দেশ্য হইলে, ভোগ-বিলাসে নিস্পৃহ হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিলাস-সাগরে মগ্ন থাকিয়া, সময় ক্ষেপণ করিব, মানসিক উৎকর্ষ-সাধনে উদাসীন

থাকিব, অথচ বই লিখিয়া জগৎ-সংসারকে উন্নত করিব, ইহাই এক্ষণকার অধিকাংশ লেখকের আশা। বস্তুতঃ, "যে লিখে, সে পড়ে না, যে পড়ে, সে লিখে না"। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি অসম্ভব, এ জ্ঞান ইহাদের আদৌ নাই। ইহারা শাখামৃগবৎ লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রেই বৃক্ষের অগ্রভাগ ধরিতে চাহেন। সুতরাং অল্প দূর উঠিয়াই অসমর্থতা নিবন্ধন অধঃপতিত হইবেন, বিচিত্র কি? ইহারা জলবিম্ব অপেক্ষাও অল্প-প্রাণ। জলবুদ্বুদ যে টুকু শিক্ষা দেয়, ইহাদের নিকটে সে টুকু আশা করাও, দুরাশামাত্র।

অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে অধিকাংশ বাঙ্গালীর ধৈর্য্যগুণ বড় বিরল—বাঙ্গালী হাতে হাতে ফল চায়! একখানি পুস্তক সম্পূর্ণ না হইতেই ছাপাইবার জন্য অস্থির হয়েন! মুদ্রাঙ্কণের পূর্ব্বে কিংবা পরে, দুই চারিজন বন্ধুর 'মন-রাখা সমালোচনা পাইলে, আর ত কথাই নাই। দুই চারিজন বন্ধুর রুচি আর জগতের রুচি তুল্যজ্ঞান করা, নিঃসন্দেহ বাতুলের কার্য্য। বিশেষতঃ, কালে যে মত বা রুচি, পরিবর্ত্তিত হওয়ার বেশী সম্ভাবনা, তাহা জগৎ-সমক্ষে প্রচার করায় কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। এইজন্য কোন কঠিন বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ব করিতে হইলে, নীরব সাধনার প্রয়োজন। যে সকল ব্যক্তি সাহিত্য-সংসারের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া, পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই দুষ্করসাধন-প্রিয়, অতিশয় শ্রম-পটু ও ধৈর্য্যশীল। দুষ্কর-সাধনা, শ্রমপটুতা, এবং অপরাজিত-সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে, কোনও বিষয়ে শ্রেয়োলাভ করার ইচ্ছা, আর পঙ্গুর পর্ব্বত-লঙ্ঘনেচ্ছা, উভয়ই তুল্য। সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত বেকন, তাঁহার "Novum Organum" সাধারণ্যে প্রচার করিবার পূর্ব্বে সংশোধন-কল্পে দ্বাদশবার পুনর্লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। "Analogy and Religion" নামক পুস্তক পরিসমাপ্ত করিতে বিশপ্-বাট্লারের ত্রিশবৎসর লাগিয়াছিল। এডামস্মিথ—তাঁহার "Wealth of Nation" নামক পুস্তক প্রণয়ন-কালে, প্রতিদিন দশঘণ্টা হিসাবে দশ বৎসর ব্যয় করিয়াছিলেন। জনলক্ তাঁহার "Human Understanding" অভিধেয়-

পুস্তক-বিরচন-ব্যপদেশে চৌদ্দবৎসর অবিশ্রান্ত-পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে, এমন পাষাণসদৃশ সহিষ্ণু, কঠোর সাধন-প্রিয়, শ্রমশীল মনুষ্য কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যল্প। তাঁহারা অবশ্যই এই সকল নগণ্য জল-বুদ্বুদের অনেক উচ্চে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং ভরসা করি, উত্তরকালেও করিবেন। পরিশেষে আধুনিক উড্ডীয়মান-লেখকগণের শ্রীচরণে আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা কিছুদিনের জন্য আপন আপন লেখনীর মুখ-রশ্মি সংযত করুন, এবং জগৎ-সংসারকে শিক্ষা-বিতরণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, নিজেরা তাহার নিকট শিক্ষা করিতে আরম্ভ করুন। এই অবসরে, সাহিত্য-বাজারের দরিদ্র ক্রেতাগণ. কিছু পয়সা সংগ্রহ করিয়া লউন; এবং ব্যবসায়ীরা ঝুটামালের পরিবর্ত্তে খাঁটী জিনিসের আমদানী করিতে প্রস্তুত হউন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্‌নো ফুল।

[১]

কেন রে সাধের ফুল! ফুটে ছিলি তুই,
বুঝিল না কেহ তোর মরমের কথা,
নিদয় মানবে তোরে বৃন্ত-চ্যুত করি',
সরল পরাণে তোর কত দিল ব্যথা!

[২]

কি আশে ফুটিলি ফুল! কি হইল তোর,
হৃদয়ের কথা তোর রহিল হৃদয়ে,
সরমে ফুটিতে তাহা না পারিলি তুই,
মনের বাসনা গেল মনেতে মিলায়ে।

[৩]

জনম অবধি কত সহিলি বেদন,
না দেখিলি সুখ-মুখ দিনেকের তরে,

শিশিরের ছলে কত করিলি রোদন,
মাখিলি রেণুর ছলে বিভূতি শরীরে।

[৪]

যা'র তরে এত কোরে মরিলিলো তুই,
সে ত কই হেরিল না ফিরায়ে নয়ন,
সুধুই ফুটিলি ফুল সুধুই শুখালি,
নিদয় মানব-স্পর্শে পাইলি বেদন।

[৫]

কে পারে বুঝিতে ফুল! হৃদয় যাতনা,
সকলে জানে কি তোরে করিতে যতন?
সকলে বুঝে কি কভু ব্যথিতের ব্যথা?
পারে লো বুঝিতে সেই ব্যথিত যে জন।

[৬]

ফুটেছিলি যবে ফুল! আমোদের ভরে,
মধুর সৌরভ আহা! ছড়ায়ে ধরায়,
সাধিত গুঞ্জনস্বরে কত শত অলি,
করিত ব্যজন তা'রা আপন পাখায়।

[৭]

আজি ফুল সুখাইয়া গিয়াছিস্ ব'লে,
আর নাহি আসে তা'রা ফিরে দেখিবারে,
তবে কেন মিছে ফুল! ফোট বারে বার,
তারে ত না পাও ফুল! ফুট যা'র তরে।

[৮]

বুঝেছি নিদয় সেই ভালবাস যা'রে,
ফুট না রে আর ফুল! ফুট না, ফুট না,
ফুটিয়া সৌরভ-ছলে কত ডাক তারে,
ভাবিয়া শুখায়ে যাও, তবু সে আসে না।

শ্রীহরিগোপাল গুপ্ত।

বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার কারণ কি?

বাঙ্গালী কি চিরকালই এইরূপ "ভেতো বাঙ্গালী" বলিয়া উপেক্ষণীয় হইয়া আসিতেছে? বঙ্গীয় অনেক মহাত্মা অনেকবার এই প্রশ্নের অবতারণা করতঃ ইহার কারণ-নির্ণয়ে অনেকানেক যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন——"বাল্য বিবাহই" আমাদের এই শোচনীয় শারীরিক অবনতির কারণ, অপক্ক-শুক্র-শোণিতোৎপন্ন সন্তান কখনই বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় হইতে পারে না। কিন্তু যাহাকে আমরা এখন বাল্য-বিবাহ বলিতেছি, (যাহা অবশ্য শীতপ্রধান দেশীয় মতের অনুসরণে) তাহা ত আজিকার নূতন পদ্ধতি নহে, তাহা বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে—তাহাই ত আমাদের পূজনীয় সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণের অভিমত। যাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অসীম, যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ, যাঁহারা সুদূর অতীত-কালে বর্ত্তমান থাকিয়া, স্বীয় প্রজ্ঞা-রশ্মি-প্রভাবে ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করতঃ, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, এই কলির উপযুক্ত যে সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়মই রাখিয়াছেন! তাঁহারা কি অশেষ-তত্ত্বদর্শী হইয়াও এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই? তাঁহারা কি ভ্রান্ত? ক্ষুদ্রমতি আমরা, কেমন করিয়া তাঁহা-দিগকে ভ্রান্ত বলিতে সাহস করি? কি জানি কেন তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিতে গেলে, ভয়ে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে, বাস্তবিক মনে আঘাত লাগে। আজকাল বঙ্গীয় কোন কোন সমাজ হইতে বাল্যবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, সেই নব্য-সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণ কি এ অসভ্য সামাজিক অপেক্ষা শারীরিক উন্নতিসাধনে সক্ষম হইয়াছে? পরন্তু "তথৈবচ"! আমাদেরও যেই দশা, আর সেই নব্যবাবুদেরও তাই। বেশীর ভাগ তাঁহাদিগের সন্তানগণের যৌবনের প্রারম্ভেই চক্ষে চস্‌মা! অপর বাল্য-বিবাহোৎপন্ন অনেক সন্তানকেই সুস্থ, অপেক্ষাকৃত সবল, দীর্ঘজীবী দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বাল্য-

বিবাহ, বহুকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে, অথচ আমাদের দুই তিন পুরুষ উর্দ্ধতন ব্যক্তিগণ যে, আমাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও অনেক প্রাচীন লোক, অধুনাতন বঙ্গীয় যুবক অপেক্ষা অধিক সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকিয়া, সেই কথার প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছেন। "সে-কেলে পাকাহাড়" একথা ত অনেকেই বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় পশুপক্ষীও দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায়; তাহার কারণ কি? তাহাদের মধ্যে অবশ্যই বাল্য-বিবাহ-প্রথা-প্রচলিত নাই ত? অতএব আমাদের দেশের প্রচলিত বাল্য-বিবাহ আমাদের দৌর্ব্বল্যের কারণ নহে।

কেহ কেহ বাঙ্গালীর খাদ্যের অসারত্বকেই দৌর্ব্বল্যের কারণ স্থির করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে শীতপ্রধান-দেশীয় লোকেরা মাংস খাইয়া সবল, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ, আয়র্লণ্ডের লোকেরা আলু খাইয়া বীরপুরুষ, বাঙ্গালীরা এ সকল পুষ্টিকর দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ভাত খাইয়া এত দুর্ব্বল। শারীরতত্ত্বজ্ঞ ইউরোপীয় ও দেশীয় পণ্ডিতগণ বলেন,—খাদ্যাখাদ্য দেশভেদে জলবায়ু-ভেদে পৃথক্ পৃথক্। যে খাদ্য শীতপ্রধান দেশের উপযোগী, তাহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে অনিষ্টকর।—সুতরাং খাদ্য বিষয়ে জাতি বা স্থান বিশেষের অনুকরণ যে অনিষ্টের মূল, তাহাত স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। আমাদের খাদ্য কেবলমাত্র ভাত নহে, তাহার সহিত উদ্ভিজ্জ-তরকারী, মৎস্য, দাউল প্রভৃতিও আছে। খাদ্যে ষ্টার্চ, গ্লুটেন্ প্রভৃতি যে সকল পুষ্টিকর উপাদান থাকা আবশ্যক, তাহা যে ভাতে ও উদ্ভিজ্জদ্রব্যে নাই, কেবল মাংসে, রুটিতে এবং মদেই আছে, তাহা কে বলিল? আমাদের ভাত ও উদ্ভিজ্জাদিতে যে পরিমাণে উক্ত উপাদান সকল আছে, তাহাই যে আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত এবং যথেষ্ট,—একথা অনেকানেক বৈদেশিক ডাক্তারগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। এদেশে মাংসাহার অপেক্ষা উদ্ভিজ্জাদি, ফল-মূল আহার যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ভাত ও ফল

খাইয়া যে কত মহাত্মা সুদীর্ঘজীবন স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। দুগ্ধে একাধারে শরীর গঠনোপযোগী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বর্ত্তমান আছে, সেরূপ আর কোন বস্তুতেই নাই। যে দেশের অনেকেই সেই দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন, সেই দেশের লোকের খাদ্য যে অসার, তাহা কিরূপে বলিব? যে সকল বৈদেশিক, এদেশে আসিয়া আহারে ব্যবহারে, দেশীয় প্রথার অনুবর্ত্তী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জনকে সবল, সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেখা যায়?

কেহ কেহ অনুমান করেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর; অল্পায়াসে প্রচুর শস্য জন্মে, সুতরাং অধিক পরিশ্রমের আবশ্যক না হওয়ায়, পরিশ্রমের অভাবে আমাদের শরীর বলবান্ হয় না; তা'ই আমরা দুর্ব্বল ও রুগ্ন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এই উর্ব্বরদেশেই বাস করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ত পাশ্চাত্য ব্যায়ামাদিরূপ কোন বিশেষ ব্যাপারে শরীর চালনা করিতেন না, তথাপি তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং পরিশ্রমের কথার প্রয়োজন নাই। কোন কোন মহাত্মা এদেশের জল-বায়ুই দুর্ব্বলতার কারণ স্থির করেন; এদেশের বায়ু উষ্ণ বলিয়া অল্পশ্রমেই শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং পরিশ্রমের অভাবেই আমরা এত দুর্ব্বল হইয়াছি। কিন্তু যে দেশের বায়ু যেরূপ, তদনুযায়ী পরিশ্রমই সে দেশের পক্ষে যথেষ্ট, তাহার অতিরিক্ত অবশ্যই অনুপযুক্ত, সুতরাং পরিত্যজ্য। আরও দেখা যায়, বঙ্গদেশের ন্যায় উত্তপ্তদেশ পৃথিবীতে আরও অনেক আছে। অধিক দূরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আরবদেশ বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তপ্ত, কিন্তু আরবীয়েরা বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক সবল, তাহাদের বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসে সুন্দর গ্রথিত রহিয়াছে। এইরূপ অনেক উত্তপ্ত প্রদেশ আছে, কিন্তু তথাকার লোকেরা ত বাঙ্গালীর ন্যায় দুর্ব্বল ও রুগ্ন নহে!

তবে কেন বাঙ্গালী ক্রমশঃই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছেন?

অধিকদিনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী এত দুর্ব্বল ও রুগ্ন ছিলেন না, তাঁহার এরূপ হইবার কারণ কি? বাঙ্গালীর যথেচ্ছাচার, ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবহেলা এবং শাস্ত্রীয় প্রথার অবমাননাই, এই দৌর্ব্বল্যের—এই রুগ্নতার মূল। আহারে ব্যবহারে, পদে পদে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের ব্যবস্থার অবমাননা করিয়াই, আমরা সকল সুখের মূল—স্বাস্থ্য-রত্নে বঞ্চিত হইতেছি। মহান্ ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণ, দেশ, কাল, পাত্র, বার, তিথি, বয়ঃক্রম অনুসারে আমাদের মঙ্গলজনক যে সকল ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কয়জন প্রতিপালন করেন? প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, বরং পাশ্চাত্য-রীতির অনুসরণ করিয়া, এই সকল ব্যবহারকে অবমাননা করতঃ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন। এখন আহার বিষয়ক শাস্ত্রীয় নিয়ম আমাদের সুসভ্য সমাজ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। খাদ্য, আমাদের জলবায়ুর অনুরূপ হউক আর নাই হউক, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুবর্ত্তী হইয়া না চলিলেই আমরা অসভ্যে পরিণত হই! আমাদের শাস্ত্র-কর্ত্তারা বার, তিথি, মাস ও ঋতু বিশেষে যে প্রকার আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই যে আমাদের স্বাস্থ্যপ্রদ। সেই সকল নিয়ম যে কতদূর উপকারী, সেই সকল নিয়মের মূলে যে কত বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিহিত আছে, তাহা অনেক বিদেশবাসী বৈজ্ঞানিক মহাত্মারাও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশীয়গণ তাহা স্বীকার করিতে কদাচ ইচ্ছুক নহেন। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃস্নান এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ে আহ্নিকপূজা এবং লঘুপাক কিঞ্চিৎ জলযোগ, প্রভৃতি নিয়মের মূলে যে কি সুন্দর যুক্তি সকল লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা একটু প্রণিধানপূর্ব্বক শাস্ত্রীয়গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেই, বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁহাদের তাহা জানিবার ইচ্ছা নাই, অথবা তাহাতে আদৌ ভক্তিশ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদের দশা যে এরূপ শোচনীয় হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে, স্নানাহ্নিক ও জলযোগের পর

পূর্ব্বাহ্নেই বিষয়-কার্য্য করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল; আহারান্তে বিশ্রাম যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অত্যাবশ্যক, তাহা সেই হবিষ্যাশী মহাত্মাগণ উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তা'ই আজিও "ভুক্তা রাজবদাচরেৎ" বাক্যটী এই দেশেই শুনা যায়। শীতপ্রধান দেশে উত্তেজক খাদ্যাদি আহারান্তে, পরিশ্রম করা উপযুক্ত বলিয়া, অনুকরণে এদেশেও যে সেই রীতি প্রচলিত হইবে, তাহার কোন অর্থই নাই। প্রত্যুত এই সকল পাশ্চাত্য-নিয়মের প্রচলনই যে অনেক কার্য্যকারকের (Officer) ও বিদ্যালয়ের ছাত্রের স্বাস্থ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তাহা কেহই দেখিয়াও দেখিতেছেন না!!

বহুদর্শী শাস্ত্রকারগণ যে শরীর-তত্ত্ব, কত উত্তমরূপে বুঝিতেন, তাহা তাঁহাদের প্রত্যেক বিধি-ব্যবস্থাতেই প্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত গর্ভাধান বা স্ত্রী-সংসর্গ প্রথা যে কতদূর যুক্তি-মূলক, তাহা মনস্বীমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কোন্ ঋতু, কোন্ তিথি বা কিরূপ অবস্থায় স্ত্রী-সংসর্গ আমাদের দেশের উপযুক্ত, এবং সুস্থ ও সবল সন্তান উৎপাদক, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া, সেই সকল মহোপকারী নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আজ বাঙ্গালী ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানে অগ্রসর হইয়াও, নানাবিধ বিদ্যালোকে আলোকিত হইয়াও, সেই সকল সুনিয়মে কেন অবহেলা করিয়া থাকেন, তাহা কে বলিতে পারে? এই সকল ব্যভিচারে—এই সকল অত্যাচারে, এখন অকাল-বার্দ্ধক্যের এত প্রাদুর্ভাব! তা'ই আজ বঙ্গীয় নব্যযুবক, দৃষ্টির সুবিধার্থে চস্মাধারী, এবং সর্ব্বদাই গরম কাপড়ে আবৃত থাকিয়াও শরীর লইয়া ব্যতিব্যস্ত!!

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীও বালকগণের দৌর্ব্বল্যের কারণ। পঠদ্দশায় বালক ও যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য (পাশ) হইবার আশায়, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। যে প্রণালীতে তাঁহাদের শিক্ষা চলিতেছে, তাহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়া পড়ে; সুতরাং তাঁহারা সকল সুখের নিদান, স্বাস্থ্য-রত্নে

বঞ্চিত হইয়া কেবল কতকগুলি উপাধিলাভ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অধুনাতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ অনেক যুবকই ক্লশ ও রুগ্ন; অনেকের হয় ত বহুকষ্টোপার্জ্জিত বিদ্যারত্ন কোন ব্যবহারে আসিতে পায় না, কারণ শরীর সুস্থ না থাকিলে মনও সুস্থ থাকে না; যাহার মন সুস্থ নহে, জগৎ তাহার নিকট কি উপকার প্রত্যাশা করিতে পারে?

বৈদেশিক ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালীও বঙ্গবাসীর স্বাস্থ্য-হানির অন্যতম কারণ। আমাদের দেশের লোকের ধাতু, প্রকৃতি অনুসারে দেশীয় শরীর-তত্ত্ববিৎ মহোদয়গণ দ্বারা যে সকল ঔষধ ও পথ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে উপকারী না হইয়া, বিদেশীয়, আমাদের ধাতু ও প্রকৃতি অনভিজ্ঞ লোকের নির্দ্ধারিত ঔষধ, যে আমাদের উপকারী হইবে একথা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? বৈদেশিক চিকিৎসা আপাততঃ কোন কোন রোগে আশু-ফল-প্রদ হয় বটে, কিন্তু শেষে সেই সকল ঔষধে আমাদের স্বাস্থ্য যে কিরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, তাহা অধুনা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। যে পথ্য শীতপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে প্রযোজ্য, তাহা যে আমাদের ইষ্টজনক হইবে, তাহা কিরূপে বলা যায়?

এই প্রকার আহার, বিহার, ব্যবহার, প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমরা বৈদেশিক-রীতি অবলম্বন করিতেছি, এবং তাহার ফলেই অমূল্যধন স্বাস্থ্যরত্নে বঞ্চিত হইয়া, বিবিধ দৈহিক কষ্টে দিনপাত করিতেছি। এখন আর সমাজ-শাসন নাই, শাস্ত্রে আর কাহারও প্রবৃত্তি নাই, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে এখন আমরা আলোকিত হইয়াছি। তা'ই আমরা আমাদের পূজনীয় শাস্ত্রকারগণের ভ্রম দেখিতে পাই, তাঁহারা যে অতি মূর্খ ছিলেন, তাহাই প্রমাণ করিতে যাই, এবং সেই ফলে সেই পাপে আমাদের এই অধোগতি উপস্থিত হইয়াছে! আমরা আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতেছি, আমাদের কষ্ট কে মোচন করিতে পারিবে? যতদিন হিন্দুমাত্রেই স্বধর্ম্ম-নিরত না হইবেন, যতদিন শুদ্ধাচারী হইতে না শিখিবেন, যতদিন মহামতি শাস্ত্রকর্ত্তাগণের বাক্যের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে না শিখিবেন, যতদিন তাঁহাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য না করিবেন, ততদিন আমাদের এই শারীরিক অবনতি দূরীভূত হইবে না।

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

ঠগী জীবনী।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

আমার জ্ঞান হইলে দেখিলাম যে, যিনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহারই সম্মুখে নীত হইয়াছি। তিনি আমাকে ধরিয়া, এমন কি এক প্রকার ক্রোড়ে করিয়া, চতুর্দ্দিকে বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থানে ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়া আমার ঘাড়ে এমন বেদনা হইয়াছিল যে, আমি মুখ তুলিতে পারিতেছিলাম না। ক্রমে যখন আমার বেশ জ্ঞান হইতে লাগিল, তখন, সেই বাটী হইতে বাহির হওয়া, ভগিনীর নিকট বিদায় লওয়া, পথে সেই আগন্তুক সৈনিক পুরুষের সহিত প্রথম পরিচয়, সেই ভয়ানক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি সকল কথাই, একে একে আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। আমি আবার অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। কিন্তু সচেতন অবস্থাই হউক, আর অচেতন অবস্থাই হউক, সেই অজ্ঞাত পুরুষটী আমাকে বহন করিয়া ক্রমাগতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথি-মধ্যে আমার অনেকবার জ্ঞান হইয়াছিল, অনেকবার অচেতনও হইয়াছিলাম; কিন্তু যতবার জ্ঞান হইয়াছিল, ততবারই অতি অল্পক্ষণের জন্যই আমি সচেতন ছিলাম, এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সম্পূর্ণ অনুভূত হইয়াছিল যে, যিনি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে যে কয়েকজন সঙ্গী ছিল, তাহারা সকলেই আমাকে লইয়া, ক্রমাগত বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া দ্রুতভাবে গমন করিতেছিল। যখন তাহারা থামিল, তখন

পূর্ণ সূর্য্যোদয় হইয়াছে। অনুচরগণের মধ্যে দুই তিনজন মিলিয়া সেইখানে একটী বৃক্ষতলে, আমার জন্য শয্যা-রচনা করতঃ আমায় তথায় শয়ন করাইল। আমার জীবন-রক্ষাকারী সেই আগন্তুক সৈনিক পুরুষটী, আমার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলাম, এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে তিনিও নিযুক্ত ছিলেন। বাল্য-সুলভ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া, তাঁহাকে সেইখানেই কত গালি দিলাম, এবং শেষে আমাকেও হত্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে বলিলাম,—"আমার বাপ, মা, সকলকে মারিয়া ফেলিলে, তবে আর আমায় জীবিত রাখিয়াছ কেন? আমাকেও মারিয়া ফেল।" তিনি আমায় সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যতই তিনি বুঝাইতে লাগিলেন, ততই আমার ক্রন্দনের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; ততই আমি তাঁহাকে আমারও প্রাণ-বিনাশের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম,—যত প্রকারের গালি জানিতাম—তাহাই তাহাদিগের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলাম।

অনুচরগণের মধ্যে গণেশ বলিয়া একটা অতি কদাকার লোক ছিল। সে আমার এত গালি গালাজ সহ্য করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত রাগতস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আরে ইস্‌মাইল! এ ছোঁড়া বলে কি? এইটুকু ছেলে, এত গাল দিচ্চে, আর তোমরা সচ্ছন্দে সহ্য কর্‌ছো? আমার ইচ্ছে কচ্চে, এক্ষণি এ ছোঁড়ার গলায় দড়ি দিয়ে, একেবারে নিকেশ করে দিই। তোমরা সব স্ত্রীলোক না কি? এত সহ্য কর্‌বে কেন? তোমাদের যদি এত ভয় হয়, তবে আমিই এখনি এটাকে নিকেশ করে দিচ্চি দাঁড়াও।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে লোকটা আমার নিকটে আসিল। আমিও তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহাকে আরও কত গালি দিলাম—তাহার গাত্রে ও মুখে থুতু দিলাম।

গণেশ ইহাতে আরও রাগান্বিত হইয়া, আমাকে জন্মের মত নিকেশ করিয়া দিবার জন্য, আমার নিকটে আসিল; কিন্তু ইস্‌মাইল মধ্যে পড়িয়া তাহাকে বাধা দিয়া, পুনরায় আমার জীবনরক্ষা করিল। এইরূপে বাধা দেওয়াতে, গণেশ ও ইস্‌মাইলে অত্যন্ত ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। কিন্তু ইস্‌মাইল তাহার কথা ততটা গ্রাহ্য না করিয়া, আমাকে সেখান হইতে তুলিয়া কিছু দূরে আর একটী বৃক্ষের তলায় লইয়া গেল। সেখানে তাহাদিগের অনুচরগণের মধ্যে অন্য জনকয়েক একত্র মিলিয়া, পাক-শাক করিতেছিল। ইস্‌মাইল এই লোকগুলির নিকটে আমাকে রাখিয়া, আমার রক্ষাভার তাহাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যাহাদিগের নিকট আমাকে রাখিয়া গেল, তাহারা আমাকে কথা কহাইবার জন্য, অনেকবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে তখন এত বেদনা হইয়াছিল, ও নাড়া-চাড়িতে ক্রমে তাহা এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, আর আমার কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। কথা কহিতে চেষ্টা করাতে আমার ক্রন্দন আসিতে লাগিল, আমি অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলাম।

এইরূপ অবস্থায় অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিয়া, শেষে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা সমাগমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, আমি উঠিয়া বসিলাম। ইস্‌মাইল আমাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া আমার নিকটে আসিয়া, আমাকে কত প্রবোধ দিতে লাগিল, ও কত আদর যত্ন করিল। নানাবিধ কথায় আমায় বুঝাইয়া বলিল—"দেখ! আমায় দেখিয়া তুমি ভয় করিও না—আমাকে তোমার পিতার মত জ্ঞান করিও। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই—করিবও না। তোমার পিতা মাতাকে যাহারা হত্যা করিয়াছে, আমি তাহাদিগের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছি। আমার পুত্র কন্যা নাই—আজ হইতে তুমি আমার পুত্র-স্থানীয় হইলে। আমি তোমায় অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিব। তুমি কাঁদিও না—বিধাতার মনে যা'ছিল, তা'ই হইয়াছে।"

আমার স্মরণ হয়, আমি ইস্‌মাইলের এই সকল কথা শুনিয়া

তাহার উপর বিশ্বাস করতঃ আমার ঘাড়ের ফুলা ও বেদনা উপশমের জন্য, কোন ঔষধ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

ইস্‌মাইল আমার ঘাড় বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, তৈল মর্দ্দন করতঃ কতকগুলি কি পাতা, গরম করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি কতকটা সুস্থবোধ করিতে লাগিলাম, ইস্‌মাইল আমার নিকট বসিল। তাহার কয়েকজন অনুচরও সেই সময়ে একে একে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য তাহারা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল, শেষে পাঁচজনে মিলিয়া গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার সময় খানিকটা দুধ, আর দুটী ভাত আমাকে আহার করিতে দিল। তা'র পর একটু রাত্রি হইলে এক বাটী চিনির সরবত আনিয়া ইস্‌মাইল বলিল—"খাও, একটু সরবত খাও বেশ ঠাণ্ডা—বেশ ঘুম হ'বে। আমার বোধ হয়, তাহাতে আফিম মিশ্রিত ছিল। সরবত খাইয়া আমি ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে ইস্‌মাইল আমায় ক্রোড়ে করিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল। ধীরে ধীরে অশ্ব চলিতে লাগিল—অনুচরবর্গও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, এই সময়ে গণেশ আমাদিগের সঙ্গে ছিল না। বোধ হয়, থাকিলেও আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। কারণ তাহাকে দেখিলেই আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিত। আমার বিশ্বাস,—সেই আমার পিতা, মাতা, চাঁপা ও অন্যান্য লোকজনের হত্যা, বা সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে, বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

বহুকাল পরে আমি যখন নিজেও একজন প্রসিদ্ধ ঠগী হইয়া উঠিয়াছিলাম, এবং স্বহস্তে শত শত নরহত্যা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না, তখনও গণেশের প্রতি আমার বিষ-দৃষ্টি ও আন্তরিক ঘৃণা যায় নাই। তাহাকে দেখিলেই যেন আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিত। কখন কখনও বিনাকারণে তাহার সহিত বাদ বিসম্বাদ উত্থাপন করিয়া তাহাকে প্রহারের উদ্যোগ করিতাম।

ইস্‌মাইল এবং তাহার সাতজন অনুচর এইরূপে কত দেশ-দেশান্তর পার করিয়া আমায় লইয়া চলিল। তাহাদের কথাবার্ত্তায়

অনুমান করিলাম যে, যে গ্রামে ইস্‌মাইল বাস করে, তথায় তাহার স্ত্রীর নিকট আমাকে রাখিয়া আসিবে।

যাহা ভাবিয়াছিলাম—ঘটিলও তা'ই। ইস্‌মাইল তাহার নিজ-গ্রামে উপস্থিত হইয়া, একটী সুন্দর রমণীর হস্তে আমায় সমর্পণ করিয়া কহিল—"দেখ, আমাদের ছেলে মেয়ে নাই—হইবারও বোধ হয়, আশা নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বালকটীকে আমি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ ইহাকে আনিয়া তোমার নিকটে দিতেছি; তুমি এখন হইতে ইহার মাতা হইলে, নিজ সন্তানের ন্যায় ইহাকে যত্ন করিবে, ও ভালবাসিবে।"

ইস্‌মাইল-পত্নী বোধ হয়, বড় ছেলে ভালবাসিত। সে আমাকে পাইয়া, যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইল। অত্যন্ত পুলকিতচিত্তে, সাগ্রহে আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, বারম্বার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল, এবং আমার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিল।

সেই আদরে আমি অতি সত্বরেই নিজ পিতা, মাতা, পূর্ব্বঘটনা ইত্যাদি ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। শোক-দুঃখ সমুদয়ই এক প্রকার বিস্মৃত হইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

একটি কবিতা।

কবে ভাল বেসেছিলে, কবে হ'ল 'অবসান'?
দু'দিন না যেতে যেতে কেন নিরাশার গান?
এখনো যে ও জীবন তপ্ত-রবি মধ্যাহ্নের;
পড়িতে সাঁঝের ছায়া এখনো যে বাকী ঢের।
এরই মধ্যে ফুরাইল প্রাণের পিপাসা তব,
পড়িল সাঁঝের ছায়া শান্ত-ম্লান-সুনীরব?
লুকাবার এ প্রয়াস—প্রবোধিতে অবোধেরে,
জেনে শুনে এ চাতুরী খেলিলে কিসের তরে?

আজ নয়—বহুদিন আমি ত বেঁধেছি বুক,
কত যত্নে কত কষ্টে ভুলিয়াছি ওই মুখ!
'বাসি' তব দূরে থাক, নূতনেও নাহি সাধ,
স্নে খর প্রবাহ-মুখে আজিকে বেঁধেছি বাঁধ!
যা' আছে তোমারি আছে নাহি তা'য় আকিঞ্চন,
যে-পর সে-পর আমি ভাবিও গো আমরণ।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যমুনার প্রতি।

আপন গরবে উছলে চলেছ
লো যমুনে! কা'র পানে?
কেঁদে কেঁদে সারা রাঙ্গা আঁখি দুটী
কেন লো? কি অভিমানে?
দীঘল নিঃশ্বাস পড়িছে সঘনে
হুতাশে কাঁপিছে কায়,
বিশুষ্ক হ'য়েছে রাঙ্গা মুখখানি,
বিষাদের আভা তায়।
এল-থেল কেশে আবেশে বিভোর
আকুল কুন্তলা বালা,
পাগলিনী যেন, কেন সুকেশিনি!
মরমে কি এত জ্বালা?
সই! তুই ভাই বড়ই অধীরা
বড়ই নিলাজ মেয়ে!

যাহার বিরহে পাগলিনী তুই
সেকি দেখে তোরে চেয়ে?
ফুরায়েছে ভাষা, ভেঙ্গেছে স্বজনি!
আশা-বারিধির বাঁধ।
আর না উদিবে তোর তীরে সই!
নিঠুর সে শ্যামচাঁদ।
আর কিলো শ্যাম তোর তীরে বসি'
ঘন কদম্বের ছায়।
আর কি বাজাবে মোহন-মুরলী
গোপিনী উদাস যায়?
তুই কেঁদে সারা আপনার দুঃখে
কাঁদিতে ক'র না মানা।
আমি কাঁদি ওলো! তোর তীরে বসি
নিয়ে ভাঙ্গা দেহখানা।

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } আষাঢ়, ১৩০১ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

হিন্দু ও মুসলমান।

আজ ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রবল বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে; যে হিন্দু মুসলমান এতকাল সৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, একই ভারতবাসী বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে ইংরাজরাজের রাজত্বে বাস করিয়া আসিতেছিল, আজ বহুকাল পরে তাহাদিগের মনে বিভিন্নতা ভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য আজ আমাদিগের মনে ভারতের ইতিহাসে নবম শতাব্দীর কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উদিত হইতেছে। যখন দুৰ্দ্ধর্ষ পাঠানগণ স্বকীয় পার্ব্বত্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্ণ-প্রসবিনী ভারত-ভূমি লুণ্ঠন করিতে, এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্মে আঘাত করিবার নিমিত্ত, যে প্রকার পরাক্রমের সহিত সমতলক্ষেত্রে আসিয়াছিল, আজ প্রায় সহস্রবৎসর পরে ইংরাজের পদানত হইয়াও, মুসলমানগণ হিন্দুদিগের প্রতি অবিকল না হউক, প্রায় তদনুরূপ ব্যবহার করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ভারতবর্ষের সহিত মুসলমানগণের সংস্রবের প্রথমাবস্থায় তাহারা হিন্দুদিগের প্রতি, বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা অধিকতর অত্যাচার করিয়াছিল।

কিন্তু কালক্রমে আকবর বা জাহাঙ্গীরের রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, আরঙ্গজেব ও অন্যান্য দুই একজন সম্রাট ব্যতীত সকলেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্যস্থাপনে যত্নবান্ ছিলেন,—রাজ্য-সংরক্ষণের নিমিত্তই আকবর প্রভৃতি সম্রাটগণ হিন্দুর সহিত মুসলমানের সম্বন্ধস্থাপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহাদিগের মধ্যে কলহ প্রবর্ত্তিত করাই রাজ্য-সংরক্ষণের প্রধান উপায়; অন্ততঃ কতকগুলি আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ লোক এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এতদ্‌সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের কারণাবলী অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

বোধ করি সকলেই অবগত আছেন, যখন বণিকবেশী ইংরাজগণ, ভারতে শুভ-পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদিগের একহস্তে বাইবেল ধর্ম্মপুস্তক, এবং অপরহস্তে ইংরাজীশিক্ষা ও পাশ্চাত্য-সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল। মিশনরিগণ দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা সহজেই ভারতবাসীকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিতে পারেন নাই। কারণ ভারতবর্ষে এককালে ধর্ম্মজীবনের যে প্রকার সুদক্ষতা-সহ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনয় হইয়া গিয়াছে, এবং হিন্দুগণ যে প্রকারে প্রকৃতধর্ম্মের গূঢ়রহস্য অবগত হইতে পারিয়াছিলেন; এমন ঘটনা অন্য কোনও স্থলে সঙ্ঘটিত হয় নাই। অপরদিকে স্বধর্ম্মনিরত মুসলমানগণ মহম্মদীয় ধর্ম্মের সহিত স্ব স্ব জীবন এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়াছিল যে, খ্রীষ্টধর্ম্মে তাহাদিগের আস্থা-স্থাপনের কোনও আশাই ছিল না। সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা ভারতবাসীকে পরাজিত করিতে পারে নাই। হিন্দুর নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধে নিজ উদ্দেশ্যসাধনে বিফল-মনোরথ হইয়া, অলক্ষ্যে গৌণভাবে অপর উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ভারতবাসীর মন ইংরাজজাতির প্রতি সন্নিবিষ্ট করিবার নিমিত্ত, ইংরাজগণ ভারতবাসীকে ইংরাজী শিক্ষার রসাস্বাদনে যত্নবান্ হয়েন। প্রথমে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই প্রাচীন শিক্ষা বা আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়

নাই; কিন্তু কালক্রমে উভয় সম্প্রদায়ই ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহিনীশক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, বঙ্গদেশই এ সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে; অর্থাৎ বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষার অনুকরণ যতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে, এ প্রকার ভারতের অন্য কোনও দেশে পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্গদেশে হিন্দুবাঙ্গালীগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরাজী শিক্ষা করতঃ পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনুকরণে, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি উন্নতিশীল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, স্ব স্ব পরাক্রম দেখাইতে লাগিল। কিন্তু অপরপক্ষে মুসলমানগণ ইংরাজীশিক্ষার অনাবশ্যকতাবোধে তল্লাভে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া রহিল। প্রথমাবস্থায় এই প্রকার ঔদাসীন্য নিবন্ধন তাহারা হিন্দুদিগের বহুপশ্চাতে পড়িয়া রহিল; সময়ক্রমে তাহারা বহুচেষ্টা করিয়াও এই প্রকার শিক্ষাসম্বন্ধীয় পার্থক্যের হ্রাস করিতে পারে নাই। হিন্দুগণ অদম্য উৎসাহের সহিত ইংরাজীশিক্ষা করিতে লাগিল; সুতরাং বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ-রাজ স্ব-পরিশ্রমের সফলতা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া, পুরস্কারস্বরূপে হিন্দুদিগকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ-সমূহ প্রদান করিতে লাগিলেন; অল্প সময়ের মধ্যেই হিন্দুগণ প্রায় সমুদয় গবর্ণমেণ্ট-অধীনস্থ পদ অধিকার করিয়া ফেলিল। এদিকে মুসলমানগণ শিক্ষাসম্বন্ধে পরাভূত হইয়া, এবং হিন্দুদিগের উন্নতাবস্থা দর্শন করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইল। বিশেষতঃ যখন বিশ্ববিদ্যালয় সৃজিত হইল, তখন হিন্দুগণ সর্ব্বোচ্চস্থানসমূহ অধিকার করাতে, এবং সংখ্যায় হিন্দুগণ অধিক উত্তীর্ণ হওয়াতে, মুসলমানদিগের মনে হিংসাভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে মুসলমানগণের মনের অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন বাঙ্গালীদিগের উচ্চপদ ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তি দর্শন করিয়া সমস্ত য়্যাংলোইণ্ডিয়ান এবং অনেক ইংরাজ বাঙ্গালীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। য়্যাংলোইণ্ডিয়ানগণের বিদ্বেষের প্রথম কারণ এই যে, যখন লর্ডলিটন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হরণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তখন

সমুদয় দেশীয় পত্রিকা তীব্রভাষায় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিল; এবং তখন দেশীয় সংবাদপত্রের প্রায় সকল সম্পাদকই হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদিগের হিন্দুত্ব নিবন্ধন সমুদয় য়্যাংলোইণ্ডিয়ানগণ হিন্দুদিগকে দোষী মনে করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, জাতীয় মহাসমিতি; যদিও জাতীয় মহাসমিতিতে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্ম্মেরই লোক আছেন, কিন্তু সমিতির মধ্যে হিন্দুগণই অধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া, সে স্থলে তাঁহাদিগেরই অধিক প্রভাব; এইজন্য কংগ্রেসে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী সভ্য থাকিলেও, য়্যাংলোইণ্ডিয়ানগণ তাহাকে 'হিন্দু-সমিতি' বলিয়া কল্পনা চক্ষে ধারণা করিয়া থাকেন। তৃতীয় কারণ, সহবাস-সম্মতি আইন লইয়া; ইহাতে হিন্দুগণই অধিকতর উদ্যোগী হইয়া ইহার বিষম প্রতিবাদ করিয়াছিল; সেই প্রতিবাদই গবর্ণমেণ্টের মনে অবিশ্বাসের ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল। চতুর্থ কারণ, জুরিবিভ্রাট লইয়া; ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক থাকিলেও, হিন্দু জুরিগণ ব্রাহ্মণ আসামীগণকে ধর্ম্মভয়ে মুক্তিদান করিয়া থাকেন,—এই মিথ্যাপবাদ দ্বারা সমুদয় হিন্দুজাতির প্রতি আক্রোশ প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এই প্রকার অনেকগুলি কারণবশতঃ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বিরত হইলেন। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের অনেকেই হিন্দুদিগের প্রতি নানাপ্রকার দোষারোপ করিতে লাগিলেন। সে দিন দার্জিলিঙ্গের খ্রীষ্টসভাতেও ছোট লাট সর্ব্বসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, হিন্দুগণ "পৌত্তলিক"। এস্থলে তাঁহার মতের প্রতিবাদ করা যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করি না, হিন্দুমাত্রেই তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতে ত্রুটী করিবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

যাহা হউক, ইংরাজপুরুষগণ হিন্দুদিগের প্রতি যে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল হিন্দুদিগের শত্রুতাচরণ করিলেই চলিবে না। সুতরাং হিন্দুদিগের বিরোধী, মুসলমানগণের পক্ষ গৃহীত হইল। মুসলমানগণকে সাহায্য করার কারণও আছে, হিন্দুগণ নিতান্ত স্পষ্টবাদী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে,

বিশেষতঃ তাহারা যে নিতান্ত "মিথ্যাবাদী" তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে মুসলমানগণ অপেক্ষাকৃত অল্প-শিক্ষিত বলিয়া তাহারা সহজে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে সাহস করে না। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগের অনেকেই কংগ্রেসের বিরোধী, সুতরাং ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বী। তৃতীয়তঃ, তাঁহারা সহবাস-সম্মতি আইন প্রণয়ন সময়ে গবর্ণমেণ্টকে উৎসাহিত করিয়াছিল। চতুর্থতঃ, তাহারা "মিথ্যাবাদী" নহে, কারণ তাঁহারা বঙ্গদেশীয় হিন্দু নহে। পঞ্চমতঃ, তাহারা লর্ড ল্যান্সডাউনের বিদায়কালীন তাঁহার উপযুক্ত বিদায়ী অভিনন্দন দিয়াছিল, কিন্তু হিন্দুগণ তাহা না করিয়া রাজভক্তির (?) পরিচয় দিতে পারে নাই। ষষ্ঠতঃ, ভারতে প্রতিযোগী-পরীক্ষা সম্বন্ধে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত ছিল। এই সমস্ত কারণ, এবং ইহা ভিন্ন অন্যান্য কারণ বশতঃ মুসলমানগণ সহসা যে ইংরাজরাজের কৃপাকটাক্ষে পতিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

কিন্তু মুসলমানগণ যদি কেবল গবর্ণমেণ্টের কৃপা-দৃষ্টি-লাভ করিয়াই, নীরব থাকিত, তাহা হইলে কোনও আপত্তি ছিল না। তাহারা ইংরাজদিগের সামান্যমাত্র কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া, এতদূর বীর্য্যবান্ হইয়া উঠিল যে, অকস্মাৎ তাহাদিগের মনে,—"একহস্তে ইস্‌লামধর্ম্ম ও অপরহস্তে কৃপাণদ্বারা কাফেরকে হত্যা কর" এই মহম্মদীয় আদেশ, তাহাদিগকে আলোড়িত করিয়া তুলিল!—হিন্দুদিগের বিদ্রোহাচরণ করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। ইংরাজদিগের সুশৃঙ্খল-রাজত্বে মুসলমানগণ নবম শতাব্দীর ন্যায় অত্যাচার করিতে সাহসী হইল না বটে, কিন্তু কৌশলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল।

হিন্দুদিগের নিকট গো দেবতাস্বরূপ। তাহারা ইহাকে পবিত্র হইতেও পবিত্রতর বিবেচনা করিয়া, সমাদরপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে। মুসলমানগণ গোবধ করিয়া হিন্দুদিগের ধর্ম্মে ব্যাঘাত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে মুসলমানগণ যে গোবধ করিত না তাহা নহে; তবে সে গোবধের সহিত এ গোবধের বিশেষ

প্রভেদ আছে। মুসলমানগণ গুপ্তভাবে কসাইখানা বা অন্য কোনও বেষ্টিত ভূমিতে গোবধ করিত, তাহাতে হিন্দুগণের আপত্তি করিবার কোনও কারণই ছিল না, এবং ইহাতে তাহারা আপত্তিও করে নাই। কিন্তু মুসলমানগণ যখন দুর্বৃত্ততাচরণ করিবার নিমিত্তই সর্ব্ব-সমক্ষে গোবধ করিয়া, প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া প্রকাশ্যভাবে রক্তাক্ত গোদেহ লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া দেশীয় কোন্ স্বধর্ম্ম-নিরত হিন্দুর মনে না আঘাত লাগিতে পারে? প্রত্যেক সহরে ও পল্লীতে এত-গুলি কসাইখানা এবং বধ্যভূমি থাকিলেও, যদি মুসলমানগণ প্রকাশ্য-স্থানে গোবধ করে, তাহা হইলে তাহারা হিন্দুদিগের মনে আঘাত করিবার জন্য যে চেষ্টিত হয় নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই প্রকার দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, মুসলমানগণ অনেকস্থলে গোবধ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগের সহিত হিন্দুদিগের বিষম সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ কাশীর দাঙ্গা বোধ করি, এক্ষণে পাঠকবর্গের স্মরণপথ হইতে অপসৃত হয় নাই। কেবল যে তাহারা গোবধ করিয়াই ক্ষান্ত হইল তাহা নহে, মুসলমানগণ হিন্দুর দেবমন্দির বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল— এমন ঘটনা সে দিবস কলিকাতা সহরেই সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে। অপর একস্থলে একজন মুসলমান ছদ্মবেশধারণ করিয়া কোনও হিন্দুমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেববিগ্রহ স্পর্শ করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল! গবর্ণমেন্টের নিকট ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা এ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, ইহারই বা কারণ কি? আবার কোনও কোনও হিন্দুদেবমন্দিরে রক্তাক্ত গোমস্তক পতিত দেখা যাইতে লাগিল; ইহা কি হিন্দুর, না মুসলমানের কার্য্য? তাহার পর বিনাকারণে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সহিত বাদ-বিসম্বাদ করিতে আরম্ভ করিল—এ প্রকার ঘটনা সে দিন বোম্বাই সহরে হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার ঘটনা প্রত্যহ যে কত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মুসলমানগণের প্রবল বিদ্বেষাত্মক বিসদৃশ ব্যবহারে এখন হিন্দুগণ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে!

যাহা হউক, মুসলমানদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া, পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট যতদূর বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পরিচয়, এ বৎসর ইদ্‌পর্ব্বোপলক্ষে প্রাপ্ত হইয়াছি। মুসলমানদিগের অত্যাচার আশঙ্কা করিয়া, গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া, সমুদয় ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে, বিদ্রোহ-নিবারণের নিমিত্ত সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া-ছিলেন; এই বিচক্ষণতার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

যাহা হউক, পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দু-মুসল-মানে যে সমস্ত কলহ বিবাদাদি হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলে বিস্মৃত হউন; মুসলমানগণ এতকাল আমাদিগের দেশে বাস করি-তেছে যে, তাহাদিগকে আমরা ইতিপূর্ব্বে বিদেশী বলিয়া ভাবি-তাম না, বা বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতাম না। মহামতি লর্ডরিপণ, ভারতবাসীর হৃদয়ে যে একটী বীজ বপন করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, মুসলমানগণ মূর্খতাবশতঃ তাহাই অকালে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিল। এখনও আমাদিগের মধ্যে জাতীয় মহাসমিতি বর্ত্তমান, সেই মহাসমিতিকে একবার স্মরণ করিয়া কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িকতা বিস্মৃত হউন। যদি স্বদেশের উন্নতি করা বাঞ্ছনীয় হয়, যদি ইংরাজীশিক্ষা ও পাশ্চাত্য-সভ্যতা-প্লাবিত দেশকে, পতনোন্মুখ অবস্থা হইতে আশু রক্ষা করা প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম একতা আবশ্যক। একতাই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়, এই মহাসত্য স্মরণ রাখিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণ স্ব স্ব বিভিন্নতা-ভাব স্মৃতি-পথ হইতে অপসারিত করুন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

দুঃখিনী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(সৌদামিনীর দ্বিতীয় কথা।)

আমাকে আজ ১০।১১ দিন হইল, শান্তিময়ী একটী কথা বলিয়াছে, আমি সে কথা—সেই ভয়ানক কথা, যাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই—সেই কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। সমাজে এমত অধম, নরকের পিশাচ পিশাচী থাকিতে পারে, এ বিশ্বাস আমার এতদিন ছিল না। কাজেই প্রথমে কথাটী শুনিয়া আমার শান্তিময়ীর উপর বিশ্বাস টলিয়াছিল, কিন্তু পরে নানাকারণে সেই শিথিল-বিশ্বাস এখন ক্রমে দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছে। আমার বিমাতা এখন পাপীয়সী! ঘৃণিতা—ইন্দ্রিয়-পরায়ণা—নরকের জীব! পাড়ার হরিদাস বসু তাঁহার গুপ্ত-প্রণয়ী। হতভাগিনী, তাহার জন্য পাগল। সন্তানটী ৩।৪ বৎসরের হইয়াছে, চন্দ্রের ন্যায় সংসারাকাশে শোভা পাইতেছে, কিন্তু হতভাগিনীর নিকটে তাহার আদর নাই। আমি সময়ে সময়ে তাঁহাকে যত্ন আদর করি, সেটাও যেন তিনি ভাল বাসেন না। এরূপ ভাবগতিক আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শান্তির স্বামী চারুবাবু একথা শান্তির মুখ হইতে শুনিয়াছেন। এবং অতঃপর আর শান্তির এ সংসারে থাকা হইবে না, এটাও বলিয়াছেন; শান্তি এ সকল কথা আমাকে সমুদয় সেদিন বলিয়াছে। শান্তির কথা শুনিয়া "আমায় এই পাপপুরীতে একা থাকিতে হইবে" ভাবিয়া, আমার বড় দুঃখ হইল, তৎক্ষণাৎ আমার চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। শান্তিময়ী তাহা দেখিয়া আমাকে অভয়দান করতঃ কহিল, "ভাই! তুমিও যেখানে, আমি সেখানে, এটা নিশ্চয় জানিয়া রাখিও।" আমি এই কথা শুনিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম, আহ্লাদে আমার হৃদয় পূরিয়া গেল।

উক্ত প্রকার কথা শুনিয়া অবধি আমি সর্ব্বদা বড় বিমর্ষভাবে থাকিতাম। একদিন আমি একাকী ঘরে বসিয়া নানাপ্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে সহাস্যবদনে হরলাল মামা সে ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক কহিল, "সৌদামিনি! শান্তি তোমায় ডাক্‌ছে, উপর ঘরে" আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া উপরের ঘরে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখি, শান্তিময়ী সে ঘরে নাই, সম্মুখস্থ কেদারার উপর একখানা চিঠির খামে, উপরে বড় বড় করিয়া **"প্রাণের সৌদামিনী"** এই কথাটী লেখা রহিয়াছে। আমি মনে করিলাম, 'শান্তিময়ী বুঝি ঠাট্টা করিয়া এরূপ লিখিয়া রাখিয়াছে' চিঠি তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে আমার সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। আমি সে কথা কখন শুনিব বিশ্বাস ছিল না, আজ সেই কথায় পরিপূর্ণ পত্র আমায় পাঠ করিতে হইল!

চিঠিতে কাহারও নাম ছিল না, সুতরাং কে লিখিয়াছে কিছু বুঝিতে পারিলাম না। চিঠিখানি শান্তিময়ীকে দেখাইব মনস্থ করিয়া, অন্যমনস্কভাবে সেইখানি হস্তে করতঃ যেমন ঘরের বাহির হইব, এমন সময়ে সহাস্যে হরলাল মামা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, হঠাৎ আমার হস্ত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া, শতখণ্ড করিয়া সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আমার আর তখন বুঝিতে বাকী রহিল না। বুঝিলাম, এ পাপ সংসারে প্রত্যেকের মনই পাপপঙ্কে কলুষিত। আমার বিমাতা, তাঁহার ভ্রাতা, দুইজনই সম-পথের পথিক। জানি না, শান্তিময়ীর চরিত্র কিরূপ! তাহার উপর বিশ্বাস আমার হৃদয় ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন আমি তাহার নিকট এই চিঠির বিষয় বলি, তখন সে যে সমস্ত উত্তর দিয়াছিল, তাহা শ্রবণে, আমার ধারণা হইল যে, শান্তিময়ী পাপময় সংসারে একমাত্র পুণ্যের আধার। সময়ে সময়ে হরলাল মামার সম্মুখ হইতে আমাকে দূরে রাখার কারণও, আমি এতদিনে বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম ত সব; কিন্তু এখন করিব কি? শান্তিময়ী বলিল, সে আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার শ্বশুর বাড়ী লইয়া যাইবে। আমি বিধবা——অসহায়া; চারুবাবু যদিও আমায় স্নেহ করেন বটে,

তত্রচ তাহার চরিত্র আমার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হইতে পারেন, তিনি সাধুপুরুষ, কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে আমার যাওয়া, ভাল দেখায় না। রূপ-যৌবনে, সময়ে সময়ে অনেক সাধুও বিচলিত হন, সুতরাং চারুবাবু যে জিতেন্দ্রিয় হইলেও সে পথের পথিক হইবেন না, তাহা কে বলিল? রূপ-যৌবন এখন আমার পরমশত্রু—পায়ের বেড়ী। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমি ঈশ্বর সমীপে এ সমুদয়ের বিনাশ প্রার্থনা করিতাম, কিন্তু সে প্রার্থনা কেহই শুনিত না। আমি যেমন (রূপ-যৌবন সম্পন্না) তেমনিই আছি।

আজ শান্তিময়ীর স্বামী চারুবাবু আসিয়াছেন, আসিয়াই আমায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে, আমার বড় লজ্জা হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলাম, অবশ্যই শান্তি তাঁহার স্বামীর নিকট আমার ও হরলাল সংক্রান্ত সমুদয় কথা বলিয়াছে। কি করিব? বিশেষ অনুরোধে আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে হইল। তিনি আমাকে সহাস্যবদনে কহিলেন,—

"সৌদামিনি! একটা কথা বলি রাগ কর্‌বে না ত?"

আমি বলিলাম,—"না।"

"মনে কিছু করিও না, আমি তোমাকে ৺দুর্গাপূজার সময় আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি, ইহাতে তোমার মত কি?"

চারুবাবুর এই কথা শুনিয়া আমার বড় ভাবনা হইল, 'কি উত্তর দিব?'—ভাবিলাম, চারুবাবু যে মন্দ স্বভাবের লোক, তাহার এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণই দেখিতে পাই নাই। আর এ বাড়ীতে থাকাই বা কিরূপে সম্ভবে? হরলাল মামা যেরূপ স্বভাবের লোক, তাঁহার নিকটে থাকা আর সর্ব্বস্ব হারাণ একই কথা। থাকিবার মধ্যে এই দুইস্থান আমার আছে। এখন দেখিতে গেলে, এ পরীক্ষিত নরক-তুল্য সংসারে থাকা অপেক্ষা, অজ্ঞাত-চরিত্র চারুবাবুর বাড়ীতে যাওয়া সহস্রবার শ্রেয়ঃ। যেখানে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী শান্তিময়ী যাইবে, আমিও নিশ্চয় সেখানে যাইব। এই স্থির করিয়া উত্তর দিলাম,—"বেশ ত।"

চারুবাবু তা'রপর শান্তিময়ীকে ডাকিতে বলায়, আমি বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, হরলাল মামা তাড়াতাড়ি সেই ঘরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তখন আমার মনে হইল, 'বুঝি হরলাল মামা আমাদের সমস্ত কথা লুকাইয়া শুনিতেছিল' কিন্তু শুনিয়া তাহার আপাততঃ লাভালাভ কিরূপ তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। আমি অনন্যমনে শান্তিময়ীকে ডাকিতে চলিয়া গেলাম।

শান্তিময়ীকে ডাকিয়া, আবার আমি ও শান্তিময়ী উভয়ে, সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। আমার পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হইল যে, ৺পূজার সময় আমি, চারুবাবু ও শান্তিময়ীর সহিত তাঁহাদের বাটীতে যাইব। ক্রমশঃ—

কালের প্রতি।

কাল! শান্তিময় শৈশব নিকুঞ্জের সুখের ছায়া ছাড়িয়া বাল্য ও কৈশোরের পুষ্পিত ও সরল আনন্দমাখা পথ বাহিয়া, নবপল্লবিত যৌবন-কাননের প্রায় মধ্য-সীমায় আসিলাম! এই সময়ের মধ্যেই কত মানবজীবনের কত উন্নতি ও পতন দেখিলাম, কত মনীষিগণের সরস উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিলাম—কিন্তু কই কিছুতেই ত আমি সান্ত্বনা পাই নাই! কেহ ত আমার একবিন্দু অশ্রু মোচন করিতে পারে নাই! কেহই ত আমাকে বলিয়া দেয় নাই, কোথায় গেলে চিরশান্তি পাইব! কোথায় গেলে, এ দাবদগ্ধহৃদয়ের দুর্ব্বিষহ যাতনা সকল নিবিয়া যাইবে! যে দিন হইতে যৌবনদ্বারে প্রবেশ করিয়াছি, সেইদিন হইতেই আজ পর্য্যন্ত একটীদিনও এ 'সুরম্য-সংসারে' না কাঁদিয়া যায় নাই! সেইদিন হইতেই ত ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হৃদয়ের অনন্ত সু-উচ্চ শৈশব-আশা সকল নীরবে কোথায় মিশিয়া, এ হৃদয়কে মহাশূন্য মরুভূসম করিয়া তুলিয়াছে! কেহ নিশ্চয় করিয়া কখনই বলিয়া দেয় নাই, কাহার নিকটে এ বিষাক্ত জীবনলীলার শেষ হইবে। কিন্তু কাল! যে দিন তোমার

প্রজ্জলিত চিতাগ্নির জলন্ত অক্ষর পড়িতে শিখিয়াছি, সেইদিন হইতেই কি জানি, কি দৈবৌষধি-গুণে আমার প্রাণের বেদনাভার একটু উপশমিত হইয়াছে! সেইদিন হইতেই জানিয়াছি যে, এ অনন্ত সংসারে কেহ আমার থাকুক, বা না থাকুক, আমি ধনী হই, আর দুঃখী হই, কিম্বা পথের ভিখারীই হই, আমার বিশুষ্ক পাষাণ-প্রাণকে কেহ মুঞ্জরিত করুক, বা নাই করুক, আমার প্রাণের ব্যথা এ জীবনে কেহ জানুক, বা না জানুক, একদিন না একদিন তোমার ক্রোড়ে আমি অবশ্যই সান্ত্বনা পাইব। সে কোথায়? ওই—শ্মশানে অনন্ত শয়নে! এ নশ্বর জগতে মনুষ্যকে প্রকৃত শিক্ষা দিবার, বা সান্ত্বনা করিবার যদি কিছু থাকে, তবে সে এই শ্মশান! এ জগতে পার্থিব নশ্বরতা ও মানুষিক অসারতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু যদি থাকে, তবে সে এই শ্মশান! যখনই আমি দারিদ্র্য-দুঃখে দগ্ধ ও প্রবলের অত্যাচার-অবিচারে অনুতপ্ত হই, তখনই আমি ছুটিয়া এই শ্মশানে আসি! এখানে আসিয়া দেখি—সকলই মিথ্যা, সার কেবল ধূলা! সে ধূলা কিসের? ঐশ্বর্য্য, দর্প, তেজ, অহঙ্কার সকলই সেই ধূলায়! আর কি? জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না! আরও কত কি। যে প্রিয়জনের বিরহে নিশিদিন কাঁদিয়া বেড়াইতেছি—দেখিলাম, তাহারা সকলেই ইহারই মধ্যে, তাহাদের রূপ-কান্তি, সকলই ইহাতে মিশিয়া গিয়াছে! কে যেন সেই ধূলিরাশি হইতে বলিয়া উঠিল "পাগল! এ সংসারে যাহা কিছু অনুসন্ধান কর, সকলই ইহাতে পাইবে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই এ ধূলায়! ধূলা! ধূলা!! ধূলা!! কেবলই ধূলা! এ জগতে ধূলা ভিন্ন আর কিছুই নাই! যাহার জন্য কাঁদিয়াছ, সেও ধূলা! যাহার জন্য নিশিদিন কাঁদিতেছ, সেও ধূলা! আর বাঁচিয়া থাকিলে, যাহার জন্য এখনও কাঁদিতে হইবে, সেও এই ধূলা! এই ধূলাই মহাকালের সৃষ্টিলীলা!" কি ভয়ানক! প্রাণ চমকিয়া উঠে! নয়নে অন্ধকার দেখি! অস্থির হইয়া কতক্ষণে প্রবাহিনীর পবিত্র নির্জ্জনতীরে আসিয়া দাঁড়াই! সেখানেও যেন সেই এক কথা, নৈশ-নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গাঙ্গিনীর মৃদুল লহরীমালাও

কুলু কুলুতানে সেই অনন্ত পথের গভীরবার্ত্তা বহিয়া ছুটিয়াছে! সকলই একমনে কালের অবশ্যম্ভাবী নিয়মের ও প্রবল প্রতাপের সাক্ষ্য দিতেছে। সকলই যেন অবোধ ও অসার মানবের ক্ষণিক ঐশ্বর্য্য মোহান্ধতাকে অবজ্ঞা ও উপহাস করিয়া, একমনে একটানে কাল-গহ্বরপানে চলিয়া যাইতেছে! নভোপথ বাহিয়া রবিশশীতারা নীরবে কালসাগর পানে চলিয়াছে! চারিদিকেই কেবল অনন্তগতি! কাহারই বিরাম নাই! যে একবার যাইতেছে, সে আর ফিরিতেছে না!—অনন্তকালের কোলে অনন্তকালের জন্য মিশিয়া যাইতেছে! আবার নূতন করিয়া জগৎ সংসারকে, হে কাল! তোমার বিচিত্র-লীলা খেলা দেখাইবার জন্য, কত নব নব রবি শশী গ্রহ উপগ্রহ বিদ্যুদ্বেগে ছুটাছুটি করিতেছে! বিরাট বর্ত্তুলেরও বিরাম নাই! মানবের অজ্ঞাতে কেবলই অবিরাম আপনপথে ছুটিতেছে। চঞ্চল তটিনীরও সেই এক গতি, নীরবে অনন্ত সাগরপানে ছুটিয়াছে! কাহারও জন্য অপেক্ষা নাই! এই দেখি জাহ্নবীর পবিত্র তরঙ্গাভিঘাত আমার পাদমূল স্পর্শ করিয়া চলিতেছে, পরক্ষণেই আবার দেখি, কতদূরে তরঙ্গরাজি মাথা আছাড়িয়া পড়িতেছে! দেখিতে দেখিতে কোথায় অনন্তসাগরে গাঙ্গিনীর পবিত্র সলিলরাশি কতখানি মিশিয়া গেল! আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নীরবে আমার জীবন-নদীর কতখানি অমূল্য সলিলরাশি, হে মহাকাল! তোমার অনন্ত সাগরোচ্ছ্বাসে মিশিয়া যায়! অথচ আমি কিছুই জানিতে পারি না! ধন্য তোমার বিচিত্র লীলা! তোমার গতি বড়ই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম! এইরূপেই ত সকলেরই বিনাশ সাধিত হইতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তবুও মানব আপনাকে অজর ও অমর ভাবিয়া, নিয়তই কত না ঐশ্বর্য্য-মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া, ধরাকে সরা জ্ঞানে, তোমার গতির প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে! ছার শিক্ষা! মিথ্যা আত্মাভিমান! অসার শিক্ষালাভ গঠিত, আত্মাভিমানী মানব কি জানে না:—

নিশির শিশির দোলে প্রভাত সমীরে,
রবি-তাপে কিন্তু পুনঃ মিশে কোথা' ধীরে!

যৌবন-কুসুম-ভাতি জীবন কাননে,
কত দিন থাকে বল ?—নশ্বর ভুবনে।
উঠিলে জলের বিম্ব তটিনী বুকেতে,
তখনি মিশায়ে হায়! কোথা নীরবেতে!
ফুটে ফুল দুলে দুলে খেলে হেসে হেসে,
শুখায় ক্ষণেক পরে মিশে কোথা শেষে!

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

নূতন শতাব্দী আসিয়া, কোথায় আমাদের নূতন আশার নব উদ্যমে উৎসাহান্বিত করিবে, না যাঁহাদের মুখ চাহিয়া আমাদের আশা, যাঁহারা আমাদের ভরসাস্থল, তাঁহাদের হইতে একে একে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, আমাদের সকল আশা, সকল উৎসাহ, আরও ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। চিরদিনই রাত্রির পর প্রভাত হয়, প্রভাত কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকে না; সময় হইলেই সে আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সকল প্রভাত কি একইভাবে আসিয়া দেখা দেয়? সকল প্রভাতই কি সমভাবে সুন্দর—না সম উৎসাহব্যঞ্জক? কোনও প্রভাতের নবীন আলোকে, বহুদিনের সুষুপ্ত ধরণী মুহূর্ত্তের মধ্যে সহসা নব-জীবন-লাভ করিয়া জাগিয়া উঠে, ফলে ফুলে, বৃক্ষ-পত্রে তরুণ অরুণের নবীন কিরণে, নবীন প্রাণ খেলিতে থাকে, যে দিকে চাহিয়া দেখ, সেইদিকই সুন্দর, সেইদিকেই সজীবতা-পূর্ণ নবীনতা বিরাজ করে? মধুর হিল্লোলময়ী প্রভাতবায়ু চৌদিকে কেবল নব উৎসাহই বিলাইয়া বেড়ায়। আবার কোন প্রভাত শুধু কুজ্ঝটিকাময়ী—মেঘাবৃত! সে প্রভাতে হয় ত গোপনে কত ফুল ফুটিয়াছে, কত তরুশাখা নব মুঞ্জরিত হইয়া, নব-জীবন আশায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ না সে কুজ্ঝটিকা অপসারিত হয়, যতক্ষণ না সে মেঘরাশি সরিয়া যায়, ততক্ষণ আর সে সকল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না;

আমরা কেবল সে প্রভাতের নিরাশ-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া উৎসাহ-বিহীন হইয়া পড়ি। আজ বঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীতভাব সমুপস্থিত! ঘোর কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। সেই কুজ্ঝটিকা প্রভাবে কোনও পুষ্পই অলক্ষ্যে বিকশিত হইতেছে না, সমুদয় ম্রিয়মাণ। বঙ্গবাসী আজ রত্নহারা। এ ভয়ানক কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইয়া, কবে যে দিনমণি আকাশে উদিত হইবে, কে বলিতে পারে?

এই সে দিন আমরা বঙ্কিমবাবুকে হারাইয়াছি—সে শোক, সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া শত সহস্র নর-নারীর হৃদয় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! অভাগা বঙ্গবাসী, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য পূর্ণমাত্রায় শোক করিতে অবসর পাই নাই; ইতিমধ্যেই আবার আর একটী প্রিয়-সন্তান বঙ্গমাতার কোল শূন্য করিয়া, বঙ্গবাসীর হৃদয়ে পুনরাঘাত দিয়া চলিয়া গেল, দুর্ব্বল-হৃদয় বঙ্গবাসী আর কত সহ্য করিতে পারে?

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং বঙ্কিমবাবুর জন্য আমরা যতদূর শোকগ্রস্ত হইয়াছি, হয় ত অন্য সময় হইলে ভূদেববাবুর জন্য আমরা এখনকার মত এতদূর কাতর হইতাম না। কিন্তু ব্যথার উপর ব্যথা পাইয়া, ব্যথা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ভূদেববাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয় বা বঙ্কিমবাবুর সহিত সমদরের লোক হউন, আর না হউন, বঙ্গবাসীর উন্নতিকল্পে ইঁহাদের ন্যায় ইনিও যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণের জন্য ইনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, * তাহা পরিত্যাগ করিয়া, শুধু কেবল ইঁহার নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও, আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার জীবন বঙ্গবাসীর একটী আদর্শ জীবন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে, কলিকাতায় হরিতকী বাগানে ভূদেববাবু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত বিশ্বনাথ

* ভূদেববাবু, পিতার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা, এবং জননীর স্মরণার্থ বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

তর্কভূষণ। তর্কভূষণ মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। বলা বাহুল্য, ভূদেববাবুর শৈশব অবস্থায় তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। তাঁহারা সামান্ত গৃহস্থের ন্যায় কলিকাতায় বাস করিতেন। ভূদেববাবুর পিতা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; বাল্যকাল হইতেই পুত্রের বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতিভা দেখিয়া, আর্থিক অভাবস্বত্বেও যথাসময়ে ভূদেববাবুকে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রায় চারি বৎসর পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রশংসার সহিত অধ্যয়ন করেন। অতি অল্পবয়সেই তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া শিক্ষকেরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া তিনি হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। এই সময়ে ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্যে হিন্দুস্কুলই সর্ব্বপ্রধান ছিল, এস্থলে আসিয়াই তিনি সমাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সকল অপেক্ষাশ্রেষ্ঠ হইলেন, এবং উত্তরোত্তর অতি আগ্রহের সহিত ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার আর্থিক অবস্থা এত মন্দ ছিল যে, তিনি যথাসময়ে পুত্রের স্কুলের মাহিয়ানা দিয়া উঠিতে পারিতেন না। এক সময়ে তাঁহার ১৬ মাসের স্কুলের মাহিয়ানা বাকি পড়ে! কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। তিনি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অর্থের সাহায্য করিতেন, এবং এই স্কুলের মাহিয়ানা তিনিই পরিশোধ করিয়া দেন। মধুসূদনের সহিত ভূদেববাবুর বিশেষ বন্ধুতা ছিল, দুইজনেই শ্রেণীর মধ্যে উত্তম বালক ছিলেন। এখন যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্-এ, বি-এর সৃষ্টি হইয়াছে, তখন এখানে তাহা ছিল না, তখনকার ডিগ্রী ছিল, 'জুনিয়ার' এবং 'সিনিয়ার'। "হিন্দু স্কুলেও জুনিয়ার এবং সিনিয়ার পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত পুস্তক পড়ান হইত। ভূদেববাবু এখানে ভর্ত্তি হইয়া, কিছুদিন পরে জুনিয়ার পাশ করিয়া, বৃত্তিপ্রাপ্ত হন, এবং তাহার পর হইতেই স্কুলের মাহিয়ানার জন্য তাঁহাকে আর বিশেষ গোলমালে পড়িতে হয় নাই! হিন্দুস্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া, তিনি কলিকাতায় মাদ্রাসা কলেজের

দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। অতি দক্ষতার সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, তিনি হাবড়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হন। ইহার পর হইতেই ভূদেববাবু কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত হয়েন। এই সময়ে কলিকাতার নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড মাষ্টারির জন্য একটী পরীক্ষা হয়। দেশের অনেক বিদ্বান্ লোকই এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু ভূদেববাবুই অতি প্রশংসার সহিত ইহাতে উত্তীর্ণ হয়েন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি ৩০০৲ শতটাকা বেতনে উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েন। এই শিক্ষকতাকার্য্য নির্ব্বাহের সঙ্গে সঙ্গে ভূদেববাবু স্কুল পাঠোপযোগী কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূদেববাবু নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকের কার্য্য করেন। তৎপরে তিনি স্কুল সমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টার পদপ্রাপ্ত হয়েন। মিঃ মেডিলকট এই সময়ে প্রধান ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। তিনি ভূদেববাবুর কার্য্য-কুশলতা এবং বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তাঁহার সহকারী হইলেও, সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং সর্ব্বদাই তাঁহার প্রশংসা করিতেন। যাহাতে দেশে বিদ্যাশিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়, যাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণে বিদ্যা-শিক্ষা করিবার সুবিধা পায়, ইহাই ভূদেববাবুর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, এবং তিনি এই ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সহকারী ইন্‌স্পেক্টার হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে এডিসনাল ইন্‌স্পেক্টার, এবং বঙ্গের স্কুল সমূহের প্রধান ইন্‌স্পেক্টার পদও প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশেষ সম্মানিত হয়েন। নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকতার পর, তিন চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি এই উন্নতি করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় এবং যত্ন দ্বারা মানুষ যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে, ভূদেববাবুর জীবনীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১। বঙ্গবাসী।
২। বঙ্গ-নিবাসী।
৩। হিতবাদী।
৪। সারস্বত পত্র।
৫। New India.
৬। Queen.
৭। সংবাদ প্রভাকর।
৮। সাহিত্য।
৯। নব্যভারত।
১০। পুরোহিত।
১১। দাসী।
১২। তৃপ্তি।
১৩। সমীরণ।
১৪। জ্যোতিঃ।
১৫। সৎসঙ্গ।
১৬। তত্ত্ববোধ।
১৭। সখা ও সাথী।
১৮। দারোগার দপ্তর।

সমালোচনা।

"বিষাদ-বসন্ত"—শ্রীমতী * * প্রণীত। একখানি অতি ক্ষুদ্র অমিত্রাক্ষরছন্দে লিখিত কবিতা পুস্তিকা। শ্রীমতীর লেখায় প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। শ্রীমতী কেন যে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া, এই পুস্তিকা প্রচারচ্ছলে বাহিরে বাহির হইয়াছেন, বলিতে পারি না। আমরা আশা করি, শ্রীমতী আর কখন এরূপভাবে সাহিত্য সেবা করিতে কষ্ট স্বীকার করিবেন না।

"সৎসঙ্গ"—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ১ম সংখ্যা হইতে ২য় সংখ্যার, কি ছাপা, কি লেখা, উভয় বিষয়েই অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়। সকল বিষয়েই ক্রমোন্নতি প্রার্থনীয়।

"জ্যোতিঃ"—মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী। ১ম সংখ্যা, বৈশাখ। পত্রিকাখানি বেশ হইতেছে। কি ছাপা, কি লেখা, সমস্তই সুন্দর। "জ্যোতিঃ"র জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নব-সহযোগীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } শ্রাবণ, ১৩০১ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

পঞ্চ"ম"কার।

অগাধ হিন্দুশাস্ত্রে নানাপ্রকার উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত; প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক হইলেও, প্রকরণ ও প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন; এমন কি কতকগুলি ঠিক বিপরীত। একে যাহা নিতান্ত অবৈধ বলিতেছে, অপরে তাহাকেই বিধিসিদ্ধ বলে। ভাল করিয়া দেখিলে, দেখা যায়,—উভয়বিধ ক্রিয়াই হিন্দুর শাস্ত্রানুমোদিত। এই প্রকার মতভেদ ও পার্থক্য দেখিয়াই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন— "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"। তা'ই তিনি মহাজন-প্রদর্শিত পথের অনুসরণে পরামর্শ দিয়াছেন।

এক হিন্দুশাস্ত্র হইতেই দেশ, কাল, পাত্র বিশেষে, ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি উদ্ভূত হইয়াছে। সকলই ফলে একই, এবং অনুধাবন করিয়া,—প্রকৃত অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে, পরস্পরের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। তবে কালবশে, যুগধর্ম্মে অনেক প্রণালী লক্ষভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে—কদর্থে বিকৃত হইয়া দূষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সদাচার ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছে; সদ্গুরুর অভাবে ক্রিয়াকাণ্ড কুক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে। পরম পবিত্র শিবোক্ত তন্ত্র শাস্ত্র এই বিকৃতির প্রধান উদাহরণ স্থল। এই মহোপকারী শাক্ত

উপাসনা-প্রণালী, যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইহা যে জনগণের কিদৃশ মঙ্গলকর ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু কালবশে প্রকৃত অর্থ নষ্ট হইয়া, ইহা যে কিরূপ বিকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। এই পরম অশেষ কল্যাণকর শাস্ত্রে যে কত রত্ন নিহিত আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা কঠিন। কিন্তু আজ সেই শাস্ত্রই বীভৎস রসের আকর হইয়া উঠিয়াছে। এখন শাস্ত্রোক্ত "পঞ্চতত্ত্ব", "লতাসাধন", "গুপ্তসাধন", "কাপালিক" প্রভৃতি উপাসনা দেখিলে, ঘৃণায় চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়; আর পুজ্যশাস্ত্রের ঈদৃশ অবস্থাদর্শনে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়।

তন্ত্রে প্রধানতঃ সাত প্রকার উপাসনা-প্রণালী বিধিবদ্ধ আছে; যথা—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধাচার ও কৌলাচার। তন্মধ্যে অদ্য কিঞ্চিৎ বামাচারীর পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ উল্লেখ করিব। পঞ্চতত্ত্ব শব্দে পঞ্চ"ম"কারকে বুঝায়; পঞ্চ"ম"কার এই—

"মদ্যং মাসঞ্চ, মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
"ম"কারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনম্॥"—শ্যামারহস্য।

অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটী লইয়া, পঞ্চ"ম"কার; এই পঞ্চমকার মহাপাপনাশ করে। বামাচারিগণ আরও বলেন;—

"পঞ্চতত্ত্বং খ-পুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারো ভবেৎতত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্॥"

অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ"ম"কার, খ-পুষ্পদ্বারা ফুলযোষিতকে পূজা করিতে হইবে। পঞ্চ"ম"কার যে কি পদার্থ, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। খ-পুষ্প শব্দে তন্ত্রের অর্থানুযায়ী কোন পুষ্পবিশেষ নহে; ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। খ-পুষ্প শব্দে রজস্বলা স্ত্রীর রজঃ বুঝায়। আর কুলযোষিত শব্দে, যে কেবল কুলকামিনীকেই বুঝাইতেছে, তাহা নহে; কুলযোষিত শব্দে—নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতকন্যা, গোপকন্যা, মালাকরকন্যাকে বুঝায়। বামাচারী সাধকগণ এই সকল কুলযোষিত লইয়া, ভৈরবীচক্রে উপবিষ্ট হওত, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ"ম"কারযোগে সাধনা করিতে থাকেন। এরূপও তাঁহাদের

শাস্ত্রে আছে যে, ভৈরবীচক্রে উপস্থিত পুরুষগণই, ওই সকল কুলযোষিতের স্বামিস্বরূপ হইবেন; বিবাহিত স্বামী আর তাহার নিকট স্থান পাইবেন না। এইরূপে এক এক মহাপুরুষ, এক এক কুলযোষিতকে বামে লইয়া, চক্রাকারে উপবিষ্ট হইবেন, এবং —

"সিন্দুর তিলকং ভালে পাণৌচ মদিরাসবং।
কৃত্বা পিবেৎ গুরুধ্যায়ং স্তথা দেবীঞ্চ চিন্ময়ীং॥"

এইরূপে পুনঃ পুনঃ মদ্যপান চলিতে থাকিবে, ক্রমে 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পতিতো ভূতলে'। এই বীভৎস উপাসনা-প্রণালী আর লিখিবার আবশ্যকতা নাই; পাঠকগণ, অবশ্যই ইহার পরিণাম অনুভব করিতে পারিতেছেন।

এইরূপ বীভৎস ও অশ্লীলকাণ্ড যে শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা কখনই বোধ হয় না। প্রকৃত অর্থ নষ্ট হইয়া যে, এরূপ বিকট অর্থে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ "কুলার্ণবের" দ্বিতীয় উল্লাসে, ভগবতী মহাদেবকে বলিতেছেন,—"প্রভো! আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে ত সকল মদ্যপায়ী পাষণ্ডই সিদ্ধপুরুষ হইবে! এবং মাংস ও মৎস্যভোজী হইলেই ত মোক্ষ পাইতে পারিবে!" মহেশ কহিলেন,—"প্রিয়ে! ইহার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমি জনগণকে মদিরাসক্ত করিবার জন্য, এরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করি নাই। পঞ্চ"ম"কারের প্রকৃত অর্থ এই;——

"কুণ্ডল্যা মিলনাদিন্দো স্রবতে যৎ পরামৃতং।
পিবেদ্‌যোগী মহেশানি মহাপানমিদং স্মৃতং॥
পাপপুণ্যং পশুং হত্বা জ্ঞানগড়্গেন শাম্ভবি।
পরমাত্মনি নয়েচ্চিত্তং পলানীতি নিগদ্যতে॥
মনসা সেন্দ্রিয়ং সর্ব্বং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মৎস্যাশী স ভবেদ্‌যোগী মুক্তবন্ধস্তব প্রিয়ে॥
অশেষব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং পরব্রহ্মণ সংনয়েৎ।
পরশক্ত্যাত্মসংযোগ ন বীর্য্যং মৈথুনং মতং॥"

—যোগিনী তন্ত্র; ৬ষ্ঠ পটল।

আমাদের শরীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত স্থানে স্থানে সাতটী পদ্ম আছে,—আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রদল। আধার—পায়ুদেশের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে, স্বাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূলে, মণিপূর—নাভিমূলে, অনাহত—হৃদয়ে, বিশুদ্ধ—কণ্ঠে, আজ্ঞা—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, এবং সর্ব্বোপরি আছেন, সহস্রদল পদ্ম। শরীরস্থ বায়ুরযোগে হুঁংবীজ উচ্চারণ করিয়া, আধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সমস্ত পদ্ম ভেদ করিয়া সহস্রদল পদ্মস্থিত পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করিলে, যে পরমামৃত গলিত হইবে, তাহাই সুধা, সুরা বা মদ্য। যোগী এই মদ্য পান করিয়াই অমর হন। আর পরম শিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনীর সেই সংযোগই মৈথুন, ইহাতেই মানব মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা পাপপুণ্য-রূপ পশু হনন করিয়া, পরমাত্মাতে চিত্তস্থাপন করাই মাংসতত্ব। মনের সহিত সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আত্মাতে যোজনা করাই মৎস্যতত্ব। এই অশেষ ব্রহ্মাণ্ডই পরব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করার নাম, মুদ্রাতত্ব; আর পরশক্তির সহিত কুলকুণ্ডলিনীর যে সংযোগ, তাহাই মৈথুন।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মদ্য মাংসাদি খাইয়া স্ত্রী সম্ভোগ করা, এবং তদানুসঙ্গিক নানাপ্রকার অশ্লীলকাণ্ডের অভিনয়, এই পবিত্র শাস্ত্রের বিধিসিদ্ধ নহে। এদেশে সুরা-পানে শারীরিক ও মানসিক বিলক্ষণ অনিষ্ট হয় বলিয়াই, অশেষ তত্বদর্শী শাস্ত্রকারগণ সুরাপানে পাপের ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও কি স্বদেশীয়, কি বৈদেশিক, সকল চিকিৎসকগণই একবাক্যে ইহার অপকারিতা সপ্রমাণ করিতেছেন; বিশেষতঃ এ-দেশীয়ের পক্ষে পঞ্চ"ম"কারের অধিকাংশ 'ম'কারই যে অশেষ অনিষ্টের নিদান, তাহা আর সপ্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। স্বাস্থ্য-রক্ষাই শাস্ত্রীয় বিধির মূল উদ্দেশ্য, কারণ শরীরের সহিত মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মন ভাল না থাকিলে, তাহার ধর্ম্ম আচরণ কিরূপে হইবে? "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" এই বাক্যই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণের দোহাই দিয়া, এই সকল ব্যভিচারে প্রশ্রয় প্রদান যে, কত অনিষ্টের মূল, তাহা অনেকেই চিন্তা করেন না। মানবহিতের জন্য যে শাসন, তাহাই শাস্ত্র। যাহা আমাদিগকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করে, তাহাকে কখনই শাস্ত্র বলা যায় না।

মদ্যপানসম্বন্ধে আরও "নিরুত্তর তন্ত্রে" ১০ম পটলে স্পষ্টই লিখিত রহিয়াছে ঃ——

সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।

যাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, তিনিই বীর; মদ্যপান করিলে বীর হওয়া যায় না। শাস্ত্রে এরূপ সদর্থ থাকিতে বিকৃত অর্থ ধরিয়া, এরূপ পাপাচারে শরীর ও আত্মার ধ্বংস করা যে কতদূর গর্হিত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। যদি অধুনাতন প্রচলিত অশ্লীল কাণ্ডই এই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হয়, যদি মানবকে সুরাপায়ী করাই ইহার অভিপ্রেত হয়, যদি স্ত্রীসম্ভোগই ইহার প্রদর্শিত সুপথস্বরূপ হয়; তাহা হইলে, এই শাস্ত্রকে দূর হইতে নমস্কার করাই ভাল !!!

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

"কি ?"

ভাই! "কি ?" তুমি আমাদের প্রতি এত নির্দ্দয় কেন? যে সময়ে নিতান্ত শিশু ছিলাম, যে সময়ে ভালমন্দ, আত্ম-পর এ সমস্ত কিছুই জানিতাম না, কিছুই বুঝিতাম না, সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম, সে সময়ে তুমি সর্ব্বদা আমাদের কাছে থাকিতে। যাহা কিছু জানিয়াছি, যাহা কিছু বুঝিয়াছি, সে কেবল তোমারই অনুগ্রহে। বাল্যকালে তোমাকে সঙ্গী পাইয়াছিলাম—তোমার ন্যায় পরমমিত্র পাইয়াছিলাম বলিয়াই, পরমসুখে দিনযাপন করিয়াছি। সে সময়ে তোমার অনুগ্রহেই, প্রতিক্ষণ নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া অনুপম আনন্দ পাইতাম। তখন মনে করিতাম, তুমি চিরদিনই আমাদের সঙ্গী থাকিয়া, আমাদের মনে এইরূপ সুখ

প্রদান করিবে, তা'ই আশা ছিল—তোমার প্রসাদে অভিনব আনন্দ রসের আস্বাদন করিয়াই জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু এই সুদীর্ঘ জীবনপথের কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখি, তুমি আমা-দিগকে ছাড়িয়া গিয়াছ। তা'ই কিছুতেই আর মনে সুখের সঞ্চার হয় না। যাহা দেখি তাহাই যেন নীরস, যে দিকে চাই, সেইদিকই যেন অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয়। অনেকদিন ভাবিয়াছি কেন এমন হইল? এ সংসারে সকলেই সুখী, সকলের মুখই প্রফুল্ল দেখি, কেবল আমিই এত বিষণ্ণ কেন? মনে মনে অনেকবার এ বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছি, কিন্তু কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি, ইহার কারণ কেবল তোমার অভাব। যে দিন হইতে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছ, সেইদিন হইতে আমরা উৎসাহ শূন্য হইয়া পড়িয়াছি, সেইদিন হইতে সুখ যে কি বস্তু, তাহা আর বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমাদের সঙ্গে নাই বলিয়াই, আমরা চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখি। ভাই! তুমি আমাদের বাল্যকালের সঙ্গী, সেই ছেলে বেলা হইতে তোমার সহিত আমাদের সদ্ভাব, সে সময়ে একদণ্ডের জন্যও তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে না, এখন তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে কেন? তা'ই ভাই! জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমাদের প্রতি এত নির্দ্দয় কেন? আমরা তোমার নিকটে এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাদের বাল্য-সুহৃদ্ হইয়াও আমাদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছ? এ বিষয়ে দোষ তোমার, না আমাদের?

না ভাই! দোষ তোমার নহে, আমরাই দোষী বটে। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, আমরাই তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। যে সময়ে বালক ছিলাম, সে সময়ে জ্ঞান ছিল না বটে, কিন্তু জ্ঞানলিপ্সা ছিল, তা'ই তুমি সর্ব্বদা আমাদের সেই জ্ঞান-পিপাসা প্রশমনের উপায় করিয়া আমাদিগকে সুখী করিতে। আমা-দিগকে সকল বিষয়ে বিজ্ঞ করিতে চেষ্টা করিতে। কিন্তু এখন আর আমাদের সে ভাব নাই। এ সংসারের অনেকস্থলেই যে

তোমার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সে কথা আমরা অনেকদিন হইল ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা এখন মনে মনে ভাবি, আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি, আমাদের আর জানিবার—বুঝিবার কিছুই নাই। হৃদয়মন্দিরে সে স্থানে তোমার ও তোমার চিরসঙ্গিনী চেষ্টাদেবীর আসন ছিল, সেইস্থানে এখন বিজ্ঞাভিমান ও তাহার সহচর আলস্য এই দানবদ্বয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বিজ্ঞাভিমানের চাটু-বাক্যে আমরা এতই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি যে, তুমি যে সময়ে কোন নূতন বিষয় আমাদিগকে জানাইতে চাও, তখন তোমার কথায় কর্ণপাত করিতেও আমরা অবসর পাই না। যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহাই আমাদের নিকট অন্ধকারময় প্রতীয়মান হয়। তোমার সাহায্যাভাবে আমাদের দৃষ্টি, সে অন্ধকার ভেদ করিতে পারে না, অগত্যা নিরুপায় হইয়া চেষ্টা বিরহিতের ন্যায় বসিয়া থাকি। কিন্তু পরিশেষে যখন দেখিতে পাই যে, আমরা যে সমস্ত স্থানকে শূন্য ও অন্ধকারময় মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, অন্যান্য লোক, তোমার সাহায্যে সেইস্থান হইতে মহামূল্যে রত্নরাজি আনয়ন করিতেছে, তখন মনোমধ্যে বড়ই নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু হায়! আমরা এতই নরাধম যে, তথাপিও তোমার সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হই না! প্রতি পদে যে এত প্রতারিত হইতেছি, তথাপি আমাদের জ্ঞানের উদ্রেক হয় না! কেবল বিজ্ঞাভিমানের অযথা প্রশংসা-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, আলস্যের পদলেহন করিতে থাকি! আজ ভাই! তোমায় দেখা পাইয়াছি, অনেকদিনের পর অকৃত্রিম সুহৃদ্‌কে নিকটে পাইয়াছি, এবার আর তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।

তুমি যে স্থানে লইয়া যাইতে চাহিবে, যত দুর্গম হউক, সেই-স্থানেই তোমার সহিত যাইতে থাকিব। অনেকবার প্রতারিত হইয়া, এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমার সঙ্গ ব্যতীত কিছুতেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞাভিমানকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিলাম, এস ভাই! এখন হৃদয়-মন্দিরে তোমার আসনে

তুমি উপবেশন কর। আমি তোমার সেবক হইলাম, তুমি এখন দয়া করিয়া এই শুষ্ক হৃদয়ে সুখ-বারি সেচন কর।

ভাই জ্ঞানলিপ্সু মানব! যদি বাস্তবিক জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই পরম সুহৃদ্ "কি"র আশ্রয় গ্রহণ কর। যদি এই জগতের পদার্থ-নিচয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে কখনও এই পরম মিত্র "কি"র সঙ্গ পরিত্যাগ করিও না। এই "কি"কে সঙ্গে লইয়া যেখানে যাইবে, যাহা দেখিবে, তাহাই তোমাকে অনুপম আনন্দ প্রদান করিবে। সে আনন্দের সহিত তুলনায় সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ অতীব অকিঞ্চিৎকর। এই "কি"ই কেবল মনুষ্যের মনুষ্যত্ব প্রদান করিতে পারে। যদি জীবনে এই "কি" ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে—মানুষও পশু, উভয়ই সমান। এই সংসারে কেবল "কি"ই পদার্থের একমাত্র মর্ম্মোদ্ঘাটক। এ সংসারে যত কিছু আবিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, তৎসমুদয়ই এই "কি"র সাহায্যে সঙ্ঘটিত হইয়াছে, সংসারক্ষেত্রে যে সকল মহাত্মা, জন্মগ্রহণ করিয়া, ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপনপূর্ব্বক, এই মর জগতে অমরতালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই "কি"র সেবক ছিলেন। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, কাব্য বল, এ সংসারে যত কিছু আছে, সে সমস্তই কেবল এই "কি"র সেবার ফল। এই "কি"ই এ সংসারে ক্রমোন্নতির মূল। যিনি "কি"কে জীবনের প্রধান সঙ্গী করিয়াছেন, তাঁহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তিনিই কেবল এই সংসারে জগদীশ্বরের অপার করুণা ও অচিন্ত্যশক্তির বিষয় অবগত হইয়া, মর্ত্ত্যধামে থাকিয়াও সুবিমল স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে পারেন। যিনি এই "কি"র সেবক তাঁহার হৃদয়ে যে কত আনন্দ, তাহা ভুক্ত-ভোগীগণই অনুভব করিতে পারেন, অন্য লোকে তাহার বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করিতে পারে না!

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ।

অসাধ ক'রো না।

আমি কি দিব তোমারে ?
তুমি ত চাহ না আমারে!
যদি চরণ পরশি
কখনো দাঁড়াই আসিয়া,
তুমি চাহ না ফিরিয়া
মুকুল হৃদয় দলিয়া!
তবু আমার বলিতে
যাহা এ সংসার মাঝেতে,
আমি অক্ষুব্ধ হৃদয়ে
সঁপিব তোমারে পূজিতে।
যদি সর্ব্বস্ব দিয়াও
পাই হে নিরাশা শুধুই,
তবু পরাণ আমার
ক্ষুব্ধ হবে না কিছুই।
তুমি আমার হইতে
দূরেতে নিবাস যে ঠাঁই,
আমি সে'পূত-আলয়ে
কভুও পশিতে না চাই!
যেন মরণ অবধি
এমনি দূরেতে রহিয়া,
পারি পূজিতে তোমারে
ভাবিতে হৃদয় ভরিয়া।
যে যা' দে'ছিল আমারে
তা' ছাড়া আমারও নিয়েছে!
শুধু এ একটি সাধ
আজিও আমার রয়েছে!
তুমি সে সাধে অসাধ
ক'র না নিদয় হইয়া!
আমি জীবন-মরণ
উহাতে রেখেছি বাঁধিয়া।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠগী জীবনী।

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।)

এই সময়ে আমি বোধ হয়, পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছিলাম। ইহা আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে, সে সময়ের ঘটনাবলী আমার মনে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে! কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম, সেই সময় নির্জ্জনে বসিয়া আমার অতীত জীবনের কাহিনীগুলি একত্র করিতে প্রায়ই চেষ্টা করিতাম। একটী ঘটনা মনে হইলে, তাহার আনুসঙ্গিক অপরাপর

ঘটনাগুলি প্রায়ই মনে আসিত। কারণ চিন্তাস্রোত একবার প্রবাহিত হইলে, তাহা আর থামে না; এবং সুদূর অতীতের ঘটনাচয় যেন নব-কলেবরে সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। এই সময় আর একজন বৃদ্ধ ঠগী আমার সহিত বন্দী ছিল, তাহার কাহিনী শুনিয়াও আমার স্মৃতি অনেক পরিমাণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি প্রায়ই আমার যথাযথ মনে রহিয়াছে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রগুলি যে একেবারে বিস্মিত হইয়াছি, এরূপ নহে। বিশেষতঃ গণেশের বিষয় আমার উত্তমরূপ স্মরণ রহিয়াছে, এবং গণেশও এ সম্বন্ধে আমায় পরে বলিয়াছিল যে, আমার গালা-গালিতে তাহার ক্রোধ এরূপ প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, যদি ইস্‌মাইল আমার পক্ষ না হইতেন, তাহা হইলে সে আমায় তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিত। সে যাহা হউক, এক্ষণে পুনরায় আমার বিষয় বিবৃত করিতেছি।

আমি, ইস্‌মাইল এবং তাহার পত্নীরদ্বারা অতি যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলাম। আমায় দেখিয়া গ্রামবাসীরা অনেক সময় বিস্মিত হইত; এবং পাছে আমি আত্ম-বৃত্তান্ত কাহারও নিকটে বলিয়া ফেলি, সেই ভয়ে, ইস্‌মাইল এবং তাহার স্ত্রী কখন আমায় চক্ষুর অন্তরাল করিত না। আমিও এই সব ঘটনা এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম যে, আমি সকল বিষয় সাজাইয়া কাহাকেও বলিতে পারিতাম না, এবং বলিলেও বোধ হয়, কেহ বিশ্বাস করিত না।

ইস্‌মাইল এই গ্রামে কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই নানাপ্রকার কাপড় সাজাইয়া লইয়া দোকানে বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে, এমন কি আমিও বলিতে পারিতাম যে, তাঁহার মন অস্থির এবং বিবিধ চিন্তায় পূর্ণ। তিনি প্রায় সময়ে সময়ে বাড়ীর কাহাকেও না জানাইয়া কিছুদিন কোথায় চলিয়া যাইতেন, এবং হঠাৎ একদিন বহুবিধ বস্ত্র দ্রব্যাদি লইয়া উপস্থিত হইতেন। সেই সকল কাপড়, এবং জিনিস পত্র বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিত। ক্রমে ক্রমে আমি তাঁহাদের অত্যন্ত স্নেহের

পাত্র হইলাম, এবং ইস্‌মাইল আমাকে যেরূপ ভাল বাসিতেন বোধ হয়, আমার গর্ব্বিত এবং সৎস্বভাব পিতাও আমার প্রতি সেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন না। আমার নূতন মাতাও আমার প্রতি কোন অসদাচরণ করেন নাই, এবং তাঁহার আর সন্তান না থাকায়, তাঁহার যাহা কিছু সমস্ত আমায় দিতেন। আমি সকল সময়েই সুসজ্জিত থাকিতাম, এবং তাঁহাদের নিকট যাহা কিছু চাহিতাম, সকলই পাইতাম।

আমার প্রায় নয় বৎসর বয়সের সময় আমার স্নেহময়ী রক্ষয়িত্রী ইস্‌মাইলের অনুপস্থিতিতে জ্বরবিকারে প্রাণত্যাগ করেন। ইস্‌মাইল যতদিন না ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, ততদিন আমি একটী প্রতিবাসীর বাটীতে ছিলাম। প্রত্যাগত ইস্‌মাইলের, শূন্যগৃহ-দর্শনে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি, আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। আমি তখন বালক, তাঁহাকে আর কি করিয়া সান্ত্বনা করিব? তিনি সময়ে সময়ে আপনিই ক্রন্দন করিতেন আপনিই শান্ত হইতেন।

হায় হতভাগিনী মিরিয়ম! (ইস্‌মাইলের পত্নীর নাম) তোমার পক্ষে মরণই মঙ্গল হইয়াছে। যদি তুমি জীবিতা থাকিতে, তাহা হইলে তোমার অবস্থা এখন কি হইত? একজন বিখ্যাত ঠগীর পত্নী বলিয়া তোমার অপমানের এবং লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না।

মিরিয়ম কখনও জানিত না যে, সে একজন দস্যুদলপতির বনিতা। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ইস্‌মাইল একজন গোছাল ব্যক্তি। সে যাহা ইচ্ছা করিত, তাহাই পাইত, কখনও নিরাশ হইতে হইত না। ইস্‌মাইলের কার্য্য প্রণালী এরূপ গুপ্ত ছিল যে, মিরিয়ম জীবিতা থাকিলেও, ইস্‌মাইল যে দিন ধৃত হইয়াছিল, সেইদিন ভিন্ন জানিতে পারিত না যে, সে একজন নরহন্তার পরিণীতা ভার্য্যা। আমি আমার জীবনের পরবর্ত্তী ৪।৫ বৎসরের মধ্যে বলিবার উপযুক্ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না। সুতরাং সে গুলি বাদ।

ইস্‌মাইল, তাহার পত্নীর মৃত্যুর পর বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, সিন্ধিয়ারাজ্যে মূর্গেনগরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এবং সেইস্থানে

আমি একজন বৃদ্ধের নিকট পার্শীভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখিতে লাগিলাম।

আমি বয়োবৃদ্ধির সহিত বিশেষ সন্ধিগ্ধচিত্ত হওতঃ দেখিতে লাগিলাম যে, রাত্রিযোগে ইস্মাইলের গৃহে কতকগুলি লোক ব'সে, এবং নিবিষ্টচিত্তে কিসের পরামর্শ করে। লোকগুলিকে এবং কি বিষয়ে কথোপকথন হয়, তাহা জানিবার বড় অভিলাষ জন্মিতে লাগিল। একদিন তাহারা আসিবে জানিয়া, গৃহে চুপ করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় শুইয়া রহিলাম, এবং তাহারা সকলে উপস্থিত হইলে আমি আস্তে আস্তে সাবধানে উঠিয়া গৃহের কোণে একটী পরদার পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত হইলাম। তাহাদের জন্য যাহা প্রস্তত হইয়াছিল, তাহারা সেই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া, একত্র বসিয়া এক বিচিত্রভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিল। আমি যদিও হিন্দুস্থানী জানিতাম, এবং এখানে বালকদের সহিত ব্যবহার করিয়া দেশীয়ভাষাও কিছু জ্ঞাত হইয়াছিলাম; তথাপি সেই কথোপকথনের বিন্দুমাত্র আমি বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর ইস্মাইল, আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটস্থ একটী সিন্ধুকের পার্শ্বে উঠিয়া আসিল। আমার অত্যন্ত ভয় হইল। কিন্তু ইস্মাইল, এক মনে সিন্ধুক হইতে একটী বাক্স বাহির করিয়া লইয়া সেই ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে তাহার ডালা খুলিল। আমি জানিতাম যে, ইস্মাইল একজন ধনী ব্যক্তি কিন্তু আজ সে যে সকল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য দ্রব্য বাক্স হইতে বাহির করিল, তাহা কখন আমার কল্পনায়ও আইসে নাই। সেই সকল দ্রব্য বাহির করিয়া সে প্রত্যেকে সমান ভাগ করিয়া দিল, এবং আপনার জন্যও যথেষ্ট পরিমাণ রাখিল। অবশেষে তাহারা হিন্দুস্থানীতে কথা কহিতে লাগিল; আমি ঐ ভাষা বুঝিতাম। তাহাদের মধ্যে একজন দীর্ঘশ্মশ্রুধারী পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি ইস্মাইলকে বলিল;—

"তুমি আমিরকে লইয়া কি করিতে চাও? সে এক্ষণে একজন তরুণ বয়স্ক যুবক হইয়াছে। তাহাকে যদি আমাদের ব্যবসায় প্রবৃত্ত

করিতে চাও, তবে তাহার এই উপযুক্ত সময়। তাহাকে বাড়ীর নিকটে রাখা বড় বিপজ্জনক। সে একদিন তোমার অজ্ঞাতসারে কোন বিষয় জানিয়া পলাইয়া যাইতে পারে?"

ইস্মাইল বলিল;—"তাহার জন্য আমাকে কিছুই চিন্তিত হইতে হইবে না; সে আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, এবং আমি ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। তাহার পিতার নাম * * *" এইখানে ইস্মাইল আমার অবোধ্য-ভাষায় কথা বলিতে লাগিল।

তাহার পর হোসেন নামক এক ব্যক্তি (উহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম; এই লোকই ইস্মাইলের দোকানে কাপড় বিক্রয় করিত) বলিল,—"এ কথায় আমাদের কোন কার্য্য নাই; বালকটী অত্যন্ত চালাক, এবং কার্য্যশীল। তাহাকে যদি এ সময়ই আমাদের দলভুক্ত করা না হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহার দ্বারা আমাদের কথা একদিন প্রকাশ পাইয়া পড়িবে! তদ্ভিন্ন তাহার এখন শিখিবারও বয়স হইয়াছে; এবং যদি শিখাইতেই হয়, তাহা হইলে এখন হইতে আরম্ভ করা উচিত। আমি একটী বালককে প্রতিপালন করিতাম, এবং সে একবার এই কার্য্যের আস্বাদন পাইয়া, এমন পটু হইয়া উঠে যে, আমরা পর্য্যন্তও তাহার সমকক্ষ হইতে পারি নাই।"

ইস্মাইল বলিল,—"তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমিও এ বালকের নিকট অনেক বিষয় প্রত্যাশা করিয়া থাকি। সে একজন সাহসী, এবং বলবান্ বালক, এবং বাল্যকাল হইতে আমি তাহাকে যেরূপ কসরৎ শিখাইয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তাহার মত বলবান্ ব্যক্তি অতি অল্পই আছে। কিন্তু তাহার স্বভাব এত নম্র, এবং সে এত দয়ালু যে, আমার তাহাকে বলিতে ভয় করে, পাছে সে এবিষয়ে অসম্মত হয়।

তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—"এই সব দয়ালুহৃদয় বালক লইয়াই আমাদের কার্য্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাহাদের মন অতি সহজেই পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তাহাদের উপরও বিশেষ নির্ভর করিতে পারা যায়। তাহাকে সমস্ত বিষয় জানিতে দাও, এবং এ কার্য্যের

গৌরব ও স্বর্গ-প্রাপ্তির স্থিরতা, বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই কার্য্যের অন্তিমকাল স্বর্গধাম—যদি তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সে আমাদের দল-ভুক্ত হইতে কথনই অসম্মত হইবে না।”

ইস্‌মাইল বলিল,—“তুমি উপযুক্ত উপায়ই নির্দ্ধারণ করিয়াছ। বালকটী যখনই এক মুহূর্ত্ত সময় পায়, তখনই সেই বৃদ্ধ গণ্ডমূর্খ মোল্লাটার নিকটে যায়, এবং তাহার সমস্ত কোরাণের গল্প শুনিয়া এত চিন্তিত হয় যে, এক এক সময়ে অর্দ্ধ পাগলের মত বসিয়া থাকে। আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি যে, এই বিষয়েই তাহাকে আমাদের দিকে শীঘ্র লওয়াইতে পারা যাইবে।”

হোসেন আলি হাসিতে হাসিতে বলিল;—“যত শীঘ্র হয় ততই ভাল, আমি এই কার্য্যে নূতন ব্রতীদের প্রথম উদ্যম দেখিতে বড় ভালবাসি, যখন তাহার হাতে কাপড় দিয়া বলা যায়——”

বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিল;—“চুপ কর, যদি সে তোমার এই সব কথা শুনিতে পায়, তুমি ত আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিতে যাইতেছ? তাহা হইলে সে হয় ত অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারে! ইস্‌মাইল বলিল, “তাহার কোন ভয় নাই। কিন্তু তোমাদের হাঁটিয়া কি শ্রম বোধ হয় নাই?” আবার বলিল,—“বহুদূর যাইতে হইবে, মনে আছে ত?”

তখন সকলে বলিল,—“চল আমরা ঘুমাইতে যাই। এখানে বড় গরম, বাহিরে ঠাণ্ডায় চল।”—এই বলিয়া তাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিল। আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। ইস্‌মাইল কে? অবশিষ্ট লোকগুলাই বা কাহারা? আমাকে কি কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে?—এই ভাবনায় মস্তক ঘুরিতে লাগিল; আমার সে রাত্রে ঘুম হইল না, আমার যেন জ্বর-বোধ হইল। আমার সমস্ত বিষয় জানিতে এবং ইস্‌মাইলের সহিত মিলিত হইতে এত ইচ্ছা হইল যে, সমস্ত রাত্রে একবারও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। এ পর্য্যন্ত আমি একটী বালকের ন্যায় পালিত হইতেছিলাম; এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে! একটী সর্পের ন্যায় পুরাতন চর্ম্ম ছাড়িয়া নূতন ও

উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইতে হইবে! আমার পিতামাতাই বা কাহারা? আমি কথাবার্ত্তা দ্বারা বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ইস্‌মাইল আমার পিতা নহে। পূর্ব্ববিষয় অবগত হইবার জন্য অনেকক্ষণ ভাবিলাম, কিন্তু কিছু স্মরণ পড়িল না; সকলই যেন অন্ধকারময়। স্নেহময়ী মিরিয়ম ব্যতীত আর আমার কাহারই কথা মনে পড়িত না। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু ভাবিতাম, তাহার কুলকিনারা কিছুই পাইতাম না। আমার শেষ জীবনে বার বৎসর কয়েদের সময়েই সেই সব ঘটনা মনে পড়ে।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

ছিন্ন-তার-বীণা।

ছিন্ন-তার বীণাটী আমার!
কখন ত বাজ নাই,
ম্রীয়মাণ সর্ব্বদাই,
কেন থাক? বল একবার;
ছিন্ন-তার বীণাটী আমার!

বল, কিরূপে ছিঁড়িল তার?
একবার দুইবার,
পরা'তেছি যতবার,
ছিঁড়িতেছে! এ কি ব্যবহার!
ছিন্ন-তার বীণাটী আমার!

ওই চেয়ে দেখ চারিধার,
ভাঁজি' নব সুর তারে,
বাজি'ছে মধুরস্বরে,
তুমি কেন স্তব্ধ অনিবার!
হায়, ছিন্ন-তার বীণাটী আমার!

নাহি কিগো শকতি তোমার?
গাহিয়ে নূতন তানে,
শান্তিবারে জগজনে,
পারিবে কি? কি কহিব আর;—
ছিন্ন-তার বীণাটী আমার!

ঘুচাইতে যাতনা অপার,
সতত আপন মনে,
মিলা'য়ে প্রকৃতি সনে,
গাও গীত খুলি' হৃদি-দ্বার;
কেন—ছিন্ন-তার বীণাটী আমার!

কিন্তু বলি শুন কথা আর,
মধ্যাহ্নে পূরবী ধরি',
হাসা'য়ো না নরনারী,
নিন্দাবাদ ক'রো না কাহার;
ছিন্ন-তার বীণাটী আমার!

শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গেশ্বর।

ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর মান্যবর বেলিসাহেব, বাঙ্গালার মস্‌নদ পরিত্যাগ করত বিদায় গ্রহণ করিলে পর, বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর মহামতি ইলিয়ট বাহাদুর বঙ্গের শাসক-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনি এখন বঙ্গ, বেহার এবং উড়িষ্যায় হর্ত্তাকর্ত্তা। রাজার কর্ত্তব্য অতি মহৎ। সেই কর্ত্তব্য-পালনে বঙ্গেশ্বর সদাই তৎপর। রাজার অধীনে শত সহস্র পরিদর্শক কর্ম্মচারী থাকিলেও, প্রজার অবস্থা, দেশের অবস্থা রাজার স্বচক্ষে দেখা একান্ত আবশ্যক। ইলিয়ট বাহাদুর নিশ্চিন্ত-ভাবে কখন 'বেলভেডিয়ারের' কোমল মস্‌নদে একদিনের জন্যও অবস্থিতি না করিয়া, এই মহাসত্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন কঠোরতা উপেক্ষা করিয়াও, প্রজানিচয়ের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য, সদাই পরিভ্রমণ করিতেছেন। এইরূপ কার্য্য-কুশল শাসনকর্ত্তা, বঙ্গের সিংহাসন, পূর্ব্বে কখন অলঙ্কৃত করেন নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একের কার্য্য-সম্বন্ধে অন্যের বিভিন্ন মত হইতে পারে; কিন্তু মূল উদ্দেশ্য প্রণিধান করত, তবে মতামত প্রকাশ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাহাতে দেশের মঙ্গল, প্রজাকুলের মঙ্গল সংসাধিত হয়, ইহাই যে বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার মূল উদ্দেশ্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে সক্ষম নহেন। বাঙ্গালার উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য, পিতার ন্যায় তাঁহার যত্ন ও আয়াস। যাহাতে ছাত্রগণের দৈহিক উন্নতি হইয়া, তাহারা অমূল্য স্বাস্থ্য-রত্ন সম্ভোগ করিতে পারে, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা। ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার আচরণ, চিরদিন বাঙ্গালার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দেশের আশা ভরসার স্থল, ছাত্রগণের এইরূপ অকৃত্রিম বন্ধু, বাঙ্গালার আর কোন শাসনকর্ত্তাই ছিলেন না।

উপযুক্ত বাঙ্গালীকে উচ্চপদ অর্পণ করিতে তিনি সদাই প্রস্তুত। বাবু কেদারনাথ রায়, জেলায় জজিয়তি করিতেছেন, বাবু বরদাকান্ত

মিত্র সে দিন রংপুরের জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু সূর্য্যকুমার প্রভৃতি অনেকে, জেলার মাজিষ্ট্রেটি করিতেছেন। কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ Inspector General of Registration হইয়াছেন। এইরূপ একাধিক অনুগ্রহপ্রাপ্তি কখনই বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ঘটে নাই। কেবল বৃথা চীৎকার ও অসন্তোষ প্রকাশ করা, হিন্দুর পক্ষে বিশেষ লজ্জাকর—কারণ উহা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন নহে।

ম্যালেরিয়া, বাঙ্গালার প্রধান শত্রু। প্রায় প্রতি পল্লীই এই ব্যাধির প্রকোপে, দিন দিন হীনশ্রী হইতেছে। এই ব্যাধির মূল কারণ নির্দ্ধারণ করত উহার প্রতিবিধানের জন্য তিনি আপন ব্যবস্থাপক সভায় Drainage Billএর অবতারণা করিয়াছেন। ছোটলাট বাহাদুর উক্ত ব্যাধির যে কারণ-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, উহা প্রত্যেক পল্লীনিবাসী অনুমোদন করেন। পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা অবশ্যই ছোটলাটের সহিত একমত হইবেন। যাহাতে উক্ত চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হয়, ইহার জন্য প্রত্যেক পল্লীবাসীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; সামান্য অর্থ ব্যয়ের আশঙ্কায়, কাহারও বিমুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক পল্লীগ্রামে গিয়া দেখ, উহা এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে,—অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ব্যাধি-ভয়ে স্ব-গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আশ্রয় লইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ক্লেশকর দৃশ্য আর কি হইতে পারে? আমরা এমনি অসার হইয়াছি যে, রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য বিবেচনা না করিয়া, উক্ত বিলের বিরুদ্ধে অসার চীৎকার করিতেছি। এইরূপ অহিতাচরণে দেশের মঙ্গল না হইয়া, ক্রমশঃ অমঙ্গল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি অভাবে, যেমন সন্তানের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবে না, রাজ-ভক্তি অভাবে প্রজাকুলের কখনই মঙ্গল হয় না; একথা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর আপন হৃদয়পটে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

শ্রীহরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম কি ?

বর্ত্তমানকালে নগরে, উপনগরে, গ্রামে, পল্লীতে—সর্ব্বত্রই কেমন একটা ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া হুজুক উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে হরিসভা—আর্য্যসভা—কত প্রকারেরই না ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মকর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান—কি শিক্ষা অনুশীলন, কিছুই হয় কি না, তাহার বিচার বোধ হয়, কেহই করিতেছেন না। এখন সর্ব্বত্রই সর্ব্বথা কি যেন একটা হুজুকের হবি! আর নব্যগণের হৃদয়ে নিহিত থাকিয়া, সেই হুজুকে, সকল কর্ম্মই সাধিত হইতেছে! ধর্ম্মকর্ম্মেও হুজুক লাগিয়াছে, তা'ই আমরা অদ্য ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া হাটে, মাঠে, বাজারে, সড়কে পাগলের ন্যায় মাতুনি করিয়া বেড়াইলে, হইবে না। এখন সেই সাধারণ পাগ্লামীর নিরাকরণজন্য, ধর্ম্মের স্বরূপাভাসই প্রয়োজনীয়। সেই স্বরূপাভাসের—গুরূপদেশের সাহায্যে—আলোচনায়—লোকের হৃদয়ে বিকাশ হইলে, এরূপ হুজুকে কর্ম্মেরও নিরাকরণ হইবে। কেন না, কর্ম্মই ধর্ম্মের সাধক; আর ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করিলে—হুজুকে কর্ম্মে—অফল কর্ম্মে—প্রবৃত্তি হইবে না! সুতরাং ধর্ম্ম কি?—ইহার নির্ণয়ে এখন সচেষ্ট হওয়া যাউক। যেমন পুরুষপ্রকৃতির যোগে এই জগতের উৎপত্তি, সেইরূপ প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর তা'ই আমাদিগের প্রচলিত কোন বিষয়ের বিচারে, তাহার অভিধেয়ের—প্রাকৃতিক অর্থের উপলব্ধির প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন। সুতরাং ধর্ম্মের বিচার করিতে, ইহার প্রকৃতি-প্রত্যয়জনিত অর্থের উপলব্ধির প্রয়োজন।

ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। তদুত্তরে কর্ত্তৃবাচ্যে মন্ প্রত্যয়যোগে ধর্ম্মশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে, ধর্ম্মের ব্যাসার্থ হইল, যিনি ধারণ করেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, কি ধারণ করেন?—ইহার উত্তর—বিশ্বজগৎ। এক্ষণে দেখা যাউক, জগতের ধারণ করিতেছেন কে?—বা কোন্ ক্রিয়া?

সবিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, পাঞ্চভৌতিক জড়জগতের ধারণ ও ভূতাতীত অজড় জগতের ধারণ—এই উভয়বিধ কার্য্য একটী সত্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—"সত্যং হি তদ্ভূতহিতং যদেব!"

এক্ষণে দেখা যাউক, সেই সত্য কি? আমাদিগের অজড় জীব, পাঞ্চভৌতিক দেহে শ্বাসক্রিয়াবলম্বনে অবস্থিত। শ্বাসক্রিয়ার অন্তরায় ঘটিলে, জীবেরও স্থিতিসঙ্কট ঘটে—আত্মার ও পাঞ্চভৌতিক দেহের বিচ্ছেদ—পুরুষ প্রকৃতির পার্থক্য—ঘটিয়া থাকে। সুতরাং নিষ্ক্রিয় আত্মার পার্থক্যে জীবের অজড়দেহের ধারণে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং শ্বাসক্রিয়ার সাধনই—রেচক, পূরক, কুম্ভকাদিযোগে প্রাণয়ামাদির—সাধনই এই জীবধারণের প্রধান অবলম্বন। কাজে কাজেই এই আত্মোৎকর্ষবিধায়ক—শ্বাসক্রিয়া—প্রাণয়ামাদিই—ধর্ম্ম!

আর জড়জগৎসম্বন্ধে ভূতহিতকর সত্য—ধর্ম্ম—হইতেছে, যাজ্ঞিকী-ক্রিয়া! হিন্দুদিগের শাস্ত্রে কথিত আছে, হিন্দুরাজগণ রাজ্যের রক্ষার জন্য, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে,—অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, তাহা আদিত্যে উপগত হয়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন—শস্য, এবং শস্য হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর ইহার অবহিতচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, স্থিরতত্ত্ব বুঝিতে বোধ হয়, অনেকেই সমর্থ! কেন না, আদিত্যই যে বৃষ্টির জনক, আর বৃষ্টিই যে শস্য উৎপত্তির কারণ, আর শস্যই যে জীবের স্থিতির কারণ—তাহা ত সকলেই বুঝিতেছেন। তবে হোমাদি যে উক্ত ক্রিয়ার—ভূতহিতকরী ক্রিয়ার—সহায়, এই অন্তস্তত্ত্বের উপলব্ধি করিবার শক্তি আমাদিগের কোথায়? যিনি কখনও জলে নামিয়া সন্তরণশিক্ষা করেন নাই, তিনি জলে না নামিয়া, সন্তরণের কৌশল জানিতে বা বুঝিতে পারেন না! বুঝিতে গেলে, জলে নামিয়া যেমন সন্তরণশিক্ষার প্রথম প্রয়োজন। ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে গেলে, তাহার সাধনের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন।

পূর্ব্বকথিত বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া এক সত্যতত্ত্বমূলা। বাহ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠেয় বলি প্রভৃতির ন্যায় শ্বাসক্রিয়াতেও বলি আহুতি প্রভৃতির সাধন করিতে হয়। বহির্দ্ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত অন্তর্দ্ধর্ম্মানুষ্ঠানের সদৃশ্য সম্বন্ধ যথেষ্ট! সুতরাং ধর্ম্মদ্বারা আত্মহিতের সহিত বিশ্বহিতের অভেদে সাধন হইয়া থাকে।

আত্মা ও বিশ্বের হিতমূলক ধর্ম্মের যথাশক্তি সাধনের জন্য পাত্রাপাত্রভেদও আছে। যোগ-বিয়োগে যাহার অধিকার নাই,—হরণ পূরণের অনুশীলন-চেষ্টা তাহার সাধিত হইবে কিরূপে? কিন্তু অনেক অদূরদর্শী ব্যক্তি বলেন, পাত্রাপাত্রভেদই আমাদিগের অবনতির মূল—সমদর্শনের প্রধান অন্তরায়! ইহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। মৃত্তিকামধ্যে—খনিতলে—মণি থাকে; কিন্তু মণিতে সূর্য্যলোক প্রতিফলিত হয় বলিয়া, মৃৎপিণ্ডেও সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং সমস্থানগত হইলেও, যেমন মৃৎপিণ্ড ও মণির পার্থক্য আছে,—আবার উপযোগিতানুসারে কোনটীই উপেক্ষণীয় নহে, সেইরূপ পাত্রাপাত্রভেদ থাকিলেও, কোন ব্যক্তিই উপেক্ষণীয় নহে! পাত্রাপাত্রভেদে উপদিষ্ট হইলে, উপদেশানুযায়ী কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ক্রমোৎকর্ষ লাভ করিয়া, উত্তরোত্তর উন্নত বংশজাত হইতে পারে। কেন না সুকৃতি বা দুষ্কৃতি লোকের সূক্ষ্মলিঙ্গদেহে সংক্রমিত হইয়া, তবে অপর নবদেহগত হয়। ইহাই বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বরের বিশ্বজনীন কর্ম্মফলের ভোগাভোগ। কিন্তু এখন পাত্রাপাত্রভেদের অন্তরায় ঘটাইয়া, বিলাতী খৃষ্ট শিষ্যদিগের অনুকরণে সভা-সমিতি করিয়া, অনেকে ধর্ম্মসাধনের হুজুক করিতেছেন; শুচি মুচি মিলিয়া এক হইয়া, ধর্ম্ম সাধিতে সযত্ন হইয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ বা অনুশীলন কিংবা সাধন—সকলই নিভৃতসাধ্য! তবে বাহ্যক্রিয়ার সাধনেও পাত্রাপাত্রভেদানুসারে স্বকর্ম্ম সিদ্ধ ও সঞ্চিত করিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও যজমান ও যাজকের মধ্যে এক প্রকার রহসিকার্য্য বটে! সুতরাং হুজুকে ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা দেখিয়া বোধ হয়, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ যেমন একবার জ্বলিয়া উঠে—এই ধর্ম্মসাধনেচ্ছাও সেইরূপ! পাত্রাপাত্রভেদই হইতেছে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিত্তি! সেই ভিত্তির ধ্বংসচেষ্টায় ব্যস্ত হইয়াছেন, অনেক হুজুকপ্রিয় মত্তবাবু। "একটী পণ্ডিত একটী পাগলের সহিত যাইতে যাইতে একটী বাঁশের পোল পার হইবার সময়, পাগলটীকে বলিলেন, দেখ বাবু পোলটী দুলাইও না; দুলাইলে পড়িয়া যাইব। কিন্তু পণ্ডিতের নিষেধ বাক্য শুনিয়া, সেই পাগল আরও জোর করিয়া দুলাইতে লাগিল।"—এইটী যেমন লোক প্রসিদ্ধ,—সেইরূপ অনেক হীনবর্ণগণ সাম্যবাদের দোহাই দিয়া, বেদে অধিকারলাভ করিতে সচেষ্ট;—বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প! কেন না, বেদপাঠ যে তাহাদিগের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বোধ হয়, নিষিদ্ধ না হইলে, তাহাদিগের বেদপাঠপ্রবৃত্তি এত প্রবলা হইত না। কেন না, পুরাণপাঠে লব্ধাধিকার হইয়াও, অনেকের সহিত বৃষ্ণিবংশের কি মান্ধাতার পরিচয়ই নাই। সুতরাং বর্ত্তমান লোকদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া, আমরা সর্ব্বদাই আশঙ্কিত—আতঙ্কিত। সমাজই ধর্ম্মের অবলম্বন! তা'ই আমরা অত্র প্রবন্ধে ধর্ম্ম কি?—ইহার আভাস দিতে দুই একটী সামাজিক ব্যাপারে কটাক্ষ করিলাম। বোধ হয়, ইহাতে অনেকের দৃষ্টি খুলিবে। শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

মনুষ্যকৃত আশ্চর্য্য রচনা।

স্থাবর-জঙ্গম পদার্থের প্রতিমা, মনুষ্য অনায়াসেই নির্ম্মাণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে জীবদ্ভাব প্রস্ফুটিত করিতে পারেন না। মনুষ্য নির্ম্মিত বিহঙ্গ উড়িতে পারে না,—কলনাদও করে না। ভাস্করবিরচিত পরম সুন্দরীর প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাহার স্মিতমুখের বাক্য শুনিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। নিজ রচনার এই সকল ত্রুটী পূরণ করিবার নিমিত্ত, মনুষ্য বহুকাল হইতে প্রয়াস পাইতেছেন, এবং কেহ কেহ কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন, এরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়।

গ্রীষরাজ্যের প্রধান পণ্ডিত প্লেটো ও আরিষ্টটল লিখিয়াছেন যে, ডিডালস্ নামক এক ব্যক্তি এরূপ কৌশলে কতকগুলি নরপুত্তলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা সর্ব্বদাই ধরাতলে পাদবিহার করিত। তাহাদিগকে স্থির রাখিতে হইলে বান্ধিয়া রাখিতে হইত।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডরাজ্যে রজার বেকন নামে এক পণ্ডিত পিত্তলের দ্বারা একটী নরমুণ্ডের প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে এরূপ শিল্পচাতুরী ছিল যে, নির্ম্মিত হওয়ার কিছুকাল পরে ঐ মুণ্ডের বদন হইতে স্বতঃই তিনটী ইংরাজী বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল; সেই তিনটী বাক্যের অর্থ "সময় ছিল, সময় আছে, সময় অতীত হইল"। শ্রুত হওয়া যায়, এই তিনটী কথা কহিয়া, মুণ্ডটি ধরাতলে নিপতিত হইয়া, বিচূর্ণিত হইয়াছিল। এই পণ্ডিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র, আতসি গেলাস এবং বারুদের আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ইউরোপে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আল্‌বর্টস ম্যাগ্‌নস নামে এক পণ্ডিত জর্ম্ম্যাণ রাজ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি পিত্তল দ্বারা একটী নরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে এতদূর সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার গৃহকর্ম্ম সমুদয় সম্পাদিত হইত। শুভগ্রহ-সংযোজনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ম্যাগ্‌নস বহুকাল পরিশ্রম করিয়া সেই প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু যন্ত্রের কোন অজ্ঞাত ত্রুটীবশতঃ সেই কৃত্রিম ভৃত্য সর্ব্বদাই অনেক কথা কহিত। টমাস একুইনাস নামে সেই পণ্ডিতের এক ছাত্র ছিলেন, তিনি একদিন অতি নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতে করিতে ভৃত্যের বাগাড়ম্বরে বিরক্ত হইয়া, রোষভরে লৌহদণ্ডের আঘাতে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন! ইহাতে ম্যাগ্‌নস ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিয়াছিলেন, 'আমার ত্রিশ বৎসরের পরিশ্রম নষ্ট হইল'!

দুইটী বাদ্যযন্ত্র সমান স্বরে বান্ধিয়া একটীতে আঘাত করিলে অপরটী হইতেও স্বর ক্বণিত হয়। সমস্বরের ঈদৃশ প্রাকৃতিক ঘনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, আনেকস নামে গণিতবিদ্যা-বিশারদ এক

ব্যক্তি একটি নরকঙ্কালের প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কঙ্কালটীর হস্তে গিটার নামক একটী বাদ্যযন্ত্র ছিল, গিটার বাজাইবার সময়ে যেরূপে অঙ্গুলি পরিচালিত করিতে হয়, কঙ্কালের অঙ্গুলিগুলি যন্ত্রের গুণে সেইরূপে নড়িতে থাকিত। আর একটী গিটার কঙ্কালের করস্থ গিটারের সহিত সমান স্বরে বান্ধিয়া অন্তরাল হইতে আনেকস স্বয়ং বাজাইতেন, তাহাতে স্বরসমতার ধর্ম্মবশতঃ করের গিটারও শব্দায়মান হইত। লোকের ভ্রম হইত যে, নির্জ্জীব নরকঙ্কালই গিটার বাজাইতেছে। এই রচনা করিয়া শিল্পীকে সাতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। কঙ্কালকে গিটার বাজাইতে দেখিয়া নগরবাসীরা যাদুকর অপবাদ দিয়া তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করে, এবং বিচারে আদেশ হইয়াছিল যে, কঙ্কাল সহ আনেকসকে অনলে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করা হয়। অজ্ঞ-বিচারকের ঈদৃশ কঠিন আদেশ কার্য্যতঃ পালন করা হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। মূর্খের অসাধ্য কার্য্য নাই!

দেহ-ক্ষেত্র। (গান)

ভীম পলাশী—একতালা।

মন! দেহ জমী পতিত রেখ না।
ও তোর মেয়াদ ফুরাইলে, কেড়ে নেবে কালে,
তখন আবাদ করা হ'বে না॥
রিপু আদি তৃণ আছে যা' দেহেতে,
জ্ঞান অস্ত্রে কাটিয়া ফেল না।
পরে তারা নামের দিয়ে বেড়া—নির্ভয়ে আবাদ কর না (মন)।
ফেলে প্রেম অশ্রুধারা, ভক্তিলাঙ্গলেতে,
দেহ জমীন চষিয়া ফেল না—
পরে গুরু-দত্ত বীজ, রোপণ করিয়া,
নয়ন মুদে বসি' থাক না।

যখন ফলিবে ফসল, তোমার দেহ জমীনেতে,
নষ্ট কর্ত্তে কেউ পার্‌বে না।
তখন কাটিয়া ফসল, আনন্দ অন্তরে,
হৃদয় ভাণ্ডারে তুমি রাখ না।
মন স্বরেন বলে তোরে, সময় থাকিতে,
আলস্য কভু কর না।
অসার সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি, সেই অভয়-পদ ভাব না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

সমালোচনা।

"অন্নদামঙ্গল"——আমরা গত শনিবার "ষ্টার রঙ্গমঞ্চে" উক্ত গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। মহাকবি ভারতচন্দ্রের কবিতাবলম্বনে, এই গীতি-নাট্যের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্ত্তা, এখানিকে অভিনয়োপযোগী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে না পারিলেও, ভাঙ্গা সংস্কৃতের গানগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। বিশেষ গিরি-রাণীর গানগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী। মদন ও রতির অভিনয় মন্দ হয় নাই। কৈলাশ-শিখরাসীন মহাদেব কর্ত্তৃক মদন ভস্ম ও কাশী অন্নপূর্ণার মন্দিরস্থ অন্নদার অন্নদান-দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছে।

"সারস্বত প্রসূনাঞ্জলি"—শ্রাবণ—সিতপক্ষ—উত্তরার্দ্ধ। এখানি একখানি পাক্ষিক সমালোচক পত্র। যাবতীয় পত্র-পত্রিকার সমালোচনা ইহার উদ্দেশ্য। এই সংখ্যায় প্রথমেই দুইটী সুললিত সংস্কৃত শ্লোক। কতিপয় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধও এ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। "সাহিত্য তত্ত্ব" ও "চীন-জাপান যুদ্ধ" বেশ হইয়াছে। "আয়ুর্ব্বেদের আদর" প্রবন্ধে প্রকৃত দেশহিতের দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কাগজ যেমন ভাল; ছাপা তেমনই সুন্দর। পত্রখানি সর্ব্বথা নয়নমনোরঞ্জক বটে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নব-সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। ভাদ্র, ১৩০১ সাল। ১০ম সংখ্যা।

কি শিখিব ?

কি শিখিব ?—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে কবি বলিবেন—কাব্য, বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক—ইতিহাস,—এইরূপ বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাদের স্ব স্ব রুচির অনুরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় সকলে মনোনিবেশ করিতে আমায় উপদেশ দিবেন। পাঠক! বল দেখি, এখন আমি কাহার কথাই বা শুনি, আর কাহার কথাই বা অবহেলা করি?

কোনও একটা বিষয় শিখিতে হইলে, প্রথমে সে বিষয়টী কিরূপ, তাহা শিখিলে ফলাফল কেমন হইতে পারে, তৎসমুদয় অবগত হইবার জন্য সেই বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি কবির কথা শুনিতে হয়, তবে চল, কাব্য-জগতে প্রবেশ করি। সেখানে গিয়া দেখি—কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, মিল্‌টন প্রভৃতি মহা মহা কবিগণ, তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিভায় সেইস্থানকে উদ্ভাসিত করিয়া রসিয়া রহিয়াছেন। তাহাদের সেই মনোহর ভাব, সেই-স্থানের শৈত্য ও সৌন্দর্য্যাবলোকনে স্বতঃই বিস্মিত হইতে হয়। চক্ষু আর ফিরে না, পা আর চলে না। এখন বল দেখি, পাঠক! এমন সুন্দর স্থান ছাড়িয়া আমি আর কোথায় যাইব? আবার কি শিখিব?

আমার এই কথা শুনিয়া হয় ত কোন বৈজ্ঞানিক পাঠক, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে হইবারই কথা,—আমার একটা দেখিয়াও স্থির থাকা উচিত নহে। কারণ দুই একটা বিসদৃশ দ্রব্য না দেখিলে, কোন্‌টা উত্তম, কোন্‌টা অধম, এটী কেহই স্থির করিতে পারেন না। সুতরাং আমার বৈজ্ঞানিকের কথানুসারে কার্য্য করা উচিত, চল বৈজ্ঞানিক! তোমার সহিত তোমার বৈজ্ঞানিক সংসার দেখিয়া আসি। আহা! বৈজ্ঞানিক সংসার কি চমৎকার! যে দিকে চাই, চারিদিকে যেন ভৌতিক-কাণ্ডে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে! যাহা পূর্ব্বে লোক স্বপ্নবৎ ভাবিত (আমিও অবশ্য বাদ নাই) আজ আমার সম্মুখে তাহা কার্য্যতঃ সংসাধিত হইতেছে! ১৮০ ক্রোশ দূরের লোক আমার সহিত কথা কহিতেছে, আমি স্পষ্ট তাহার কথা শুনিতেছি, কোথাও কেহ নাই, কে যেন সূতা কাটিতেছে, কাগজ ছাপিতেছে! বল পাঠক! বল, যে স্থানে এই সকল রহস্যময় দ্রব্য সমুদয় নয়ন-মন হরণ করিতেছে, আমি এমন স্থান ছাড়িয়া কোথায় যাই? কি শিখি?

ঐতিহাসিক এইবার প্রশ্ন কর। বল "তুমি ত আচ্ছা লোক হে! যা' দেখ, তাহাতেই মোহিত হও যে দেখ্‌চি! এখন একবার ইতিহাসটা দেখ, তাহার পর কি শিখবে স্থির কর।"—আমিও বলি আচ্ছা তা'ই হউক চল, তোমাদের ঐতিহাসিক জগৎ দেখিয়া আসি। ঐতিহাসিক জগৎ কি বিচিত্র! আহা! আমি এখন কোথায় এলাম? এ কি স্বর্গ? এ যে চারিদিকে বড়লোক, কোথাও রাজা, কোথাও যোদ্ধা, কোথাও বীরাঙ্গনাগণ, কোথাও ধর্ম্মবীর! তাহাদের কি চমৎকার আকৃতি প্রকৃতি! দেশ, প্রজা, সত্য, স্বাধীনতা, ধর্ম্ম, ইহার জন্য ইহারা কত কি না করিয়াছেন! বল পাঠক এই সকল স্বদেশ বৎসল, প্রজারঞ্জক, ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া আমি কোনস্থানে যাইব?—কি শিখিব?

জীবনস্রোত প্রতিনিয়ত তর তর রবে কালসাগরের দিকে চলিয়াছে। সময় যাইতেছে, আমার ত কিছুই শেখা হইতেছে না। সাহিত্য,

বিজ্ঞান, ইতিহাস, সকলই ত আমার চারিদিকে স্ব স্ব মোহিনী-জ্যোতিঃ বিকশিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বল পাঠক আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, তুমি বলিয়া দেও, কোন্‌টী আমার শিক্ষণীয়?

আমায় একটা না একটা ধরিতেই হইবে; নতুবা নিস্তার নাই। সংসারে অবলম্বন বিহীন হইয়া—নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কদাচ সম্ভবপর নহে। কিন্তু সেটী এমন একটা কিছু হওয়া আবশ্যক, যেটী পাইলে আমি তৃপ্তিলাভ করিব; আমার মন সেটীকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে চাহিবে না।

সাহিত্য ধরিলে হয় ত কখন আমার ইতিহাস বা বিজ্ঞানে ইচ্ছা জন্মিতে পারে, ইতিহাস ধরিলে, সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে আমার মন চাহিতে পারে; বিজ্ঞান ধরিলে হয় ত আমার মন ইতিহাস কি সাহিত্য চাহিয়া বসিবে; কিন্তু তাহা হইলে হইবে না। আমার এমন একটী চাই, যাহাতে আমার মন কদাচ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না—তাহাকে লইয়াই থাকিবে। যেটীকে শিখিলে আমি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস একাধারে শিখিতে পাইব—যেটীকে পাইলে আমার আর কিছুই পাইতে ইচ্ছা হইবে না, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বস্রষ্টা, পরাৎপর পরমেশ্বরের চিন্তা আমাদের শিক্ষণীয়। সেই চিন্তা শিক্ষা করিতে পারিলে, মন আর কাহারও চিন্তা করিতে বা অন্য কোনও বিষয় শিখিতে চাহিবে না। কেবল তাহাতেই মিশিয়া থাকিবে। বল পাঠক! আমি কেমন করিয়া সেই চিন্তা করিতে শিখিয়া তৃপ্তি হইব?

রুচিভেদ।

মানবমাত্রেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন, আমার যাহা খাইতে ভাল লাগে, অপরের হয় ত তাহা ভাল লাগে না; একের যাহা পরম উপাদেয় বোধ হয়, অপরে আবার তাহাতেই নাসিকা কুঞ্চিত করে। সুতরাং খাদ্য, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি সকল বিষয়েই ব্যক্তিভেদে রুচিভেদ

দেখা গিয়া থাকে। এইজন্য মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, "ভিন্ন রুচির্হিলোকঃ।"

আবার সমাজসম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম। এক সমাজের যাহা সুরুচি অন্য সমাজের তাহা কুরুচি, একের যাহা করিলে নিন্দিত হইতে হয়, অন্যের তাহা না করা নিন্দনীয়। দক্ষিণ আমেরিকায় ক্রাউনামক একজাতি আছে, তাহার পুরুষগণের মধ্যে যিনি যত দীর্ঘকেশ তিনি ততই সুন্দর ও রাজসভায় তত গণ্যমান্য। পুরুষের সুদীর্ঘকেশ তাহাদের সুরুচি; আবার এমন সমাজ আছে, যাহার পুরুষেরা মস্তকে বা মুখে লোম রাখা অতি অশ্লীল ও কুরুচিব্যঞ্জক মনে করেন; এমন কি তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক ভ্রূ-পর্য্যন্তও উৎপাটিত করিয়া ফেলেন। আমেরিকার আদিম নিবাসিগণের মধ্যে যে রমণীর চক্ষু ক্ষুদ্র, গাত্র পিঙ্গলবর্ণ, নাসিকা স্থূল তিনিই সুন্দরী। আফ্রিকার হটেণ্টস্ জাতির মধ্যে কুব্জা রমণীই পরমাসুন্দরী; ইত্যাদি বিভিন্ন দেশীয়ের রুচি বিভিন্ন বিভিন্ন।

জন্মোৎসব, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবহারেও স্থানভেদে নানা-প্রকার রুচিভেদ দেখা যায়। এই ভিন্নতা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, একের পক্ষে যাহা সু, অন্যের তাহাই কু। সুতরাং সমাজভেদে একই রুচি সু অথবা কু, বিশেষণে বিভূষিত হইয়া থাকে; বাস্তবিক সু-রুচি বা কু-রুচি বলিয়া কোন শব্দই নাই। ইহা কেবল ব্যক্তির বা সমাজগত অনুমোদনমাত্র।

সামাজিক বা ব্যক্তিগত এই রুচিভেদ সংস্কার-মূলক; এই সংস্কার প্রকৃতির সহিত এরূপে মিশ্রিত হইয়া আছে যে, তাহা হঠাৎ উৎ-পাটিত করিতে গেলে, প্রকৃতি পর্য্যন্তও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। সুতরাং তৎসঙ্গে মানসিকবৃত্তিও উৎপ্লুত হইয়া পড়ে, এবং মনের গোলযোগ হইলে অবশ্য দেহেরও গোলযোগ হইয়া থাকে। এইজন্যই আমরা সংস্কার হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, এইজন্যই বলপূর্ব্বক সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে বা সংস্কারের অন্যথাচরণ করিলে মন ও শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে। বাল্যকাল হইতে যাহার যে খাদ্যবস্তু

মন্দ বলিয়া সংস্কার আছে, তাহা বলপূর্ব্বক বা কৌশলে তাহাকে খাওয়াইলে অবশ্যই তাহার মনে ঘৃণা বৃত্তির উদয়, এবং সেই সঙ্গে শরীর রুগ্ন হইবে। কিন্তু সেই বস্তুকেই যাহার ভাল বলিয়া সংস্কার আছে, তাহার শরীর রুগ্ন না হইয়া বরং অধিকতর সুস্থ হইবে। অতএব আমাদের এইরূপ সু-রুচি বা কু-রুচি আমাদের নিজের মন হইতেই উৎপন্ন, ইহা কোন বাহ্যিক কারণ বিশেষ হইতে উৎপন্ন নহে। আর এই সংস্কারই আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার মূলভিত্তি।

এই সংস্কার আবার অভ্যাসবশে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। মনে করুন, কোন দ্রব্য সংস্কারবশতঃ আমার রুচিকর নহে, খাইলে অবশ্যই দেহ রুগ্ন হইবে; কিন্তু অভ্যাসবশে আবার যখন সেই সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইবে, তখন আর সেই বস্তুতে ঘৃণার উদ্রেক হইবে না, সুতরাং দেহেরও কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। কেবল খাদ্যাদি কেন, অন্যান্য বিষয়েও এই নিয়ম। দু' দিন পূর্ব্বে যাহা দেখিতে বা শুনিতে নিতান্ত অশ্লীল ও কুরুচি পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল, এবং শরীর ও মন অবসন্ন হইয়াছিল, অভ্যাসবশে আবার সেই দৃশ্য বা সেই শ্রাব্য পরম রমণীয় ও দেহ মনের তৃপ্তিপ্রদ হইয়া উঠিতেছে।

এইরূপে বিভিন্ন সমাজের সংসর্গে সামাজিক রুচিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে প্রাচীন রুচির পরিমার্জ্জনে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহাই সু-রুচি, আর যাহা আমাদের দৃষ্টিতে মন্দ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই আমরা কু-রুচি বলিয়া থাকি, নতুবা প্রকৃতপক্ষে কি সু, আর কিই বা কু, তাহার কিছুই সংজ্ঞা নাই। যে সময়ে আদম এবং ইভ্ উলঙ্গ থাকিত, যে সময় ব্রীটনজাতি পশুচর্ম্ম পরিহিত হইয়া গাত্রে রং মাখিয়া নৃত্য করিত; তৎকালে তাহা তাহাদের অবশ্যই সুরুচি পূর্ণই ছিল; আমাদের দৃষ্টিতে তাহা এখন কুরুচি হইয়া উঠিয়াছে। সংসারে সকলই পরিবর্ত্তন-শীল, সুতরাং রুচিসম্বন্ধেও কেন না সেই নিয়ম খাটিবে?

এই প্রকার রুচির পরিবর্ত্তন সকল সমাজেই দেখা যায়। এক এক সমাজের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এই পরিবর্ত্তন

উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সামাজিক রীতি-নীতির ছায়া সাহিত্যের বর্ণনায় প্রতিবিম্বিত হয়। সমাজের যখন যে প্রকার রুচি বর্ত্তমান থাকিবে, তৎ তৎকালের লিখিত বর্ণনায় সেই সেই রুচির আভাস পাওয়া যাইবে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের কোন কোন স্থান আমাদের দৃষ্টিতে কুরুচি পূর্ণ হইলেও তৎকালে তাহা অবশ্যই সমাজের অনুমোদিত ছিল, এবং তাহা কু বলিয়া বিবেচিত হইত না। কালিদাস প্রণীত "শকুন্তলাদি" নাটক ও ভারতচন্দ্র প্রণীত "বিদ্যাসুন্দরাদি" কাব্য এখন কু-রুচি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে কালের লোক বর্ত্তমান থাকিলে, বর্ত্তমান প্রচলিত নাটকাদি যে তাঁহাদের দৃষ্টিতে কু-রুচি বলিয়া বোধ হইত না, তাহা কে বলিল? ফলকথা যাহা এক সময়ের কু-রুচি তাহাই অন্য সময়ে সু-রুচি হইয়া উঠে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের আহার, বিহার, পরিচ্ছদ সমস্তই মার্জ্জিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিতে সু-রুচি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সু কি কু, তাহার নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সু অথবা কু সমাজের অনুমোদনে উৎপন্ন। বাস্তবপক্ষে সকলই সু, আবার সকলই কু। তবে ইহা নিশ্চয় যে সমাজস্রোত যখন যে দিকে চলিবে, তখনই সে দিকেই গা' চালিতে সকলেই বাধ্য—অন্যথা সমাজের বিষনয়নে পড়িয়া, সমাজে থাকা দায় হইবে। ইহারই নাম সামাজিক শাসন, এবং এই সামাজিক শাসন যে কল্যাণপ্রদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে জাতির মধ্যে এই সামাজিক শাসন যত শিথিল, সে জাতির অবনতি ততই নিকটবর্ত্তী।

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাসে প্রথম রাতি।

জীবনের একদিন ডুবাইয়ে কাল-জলে,
গেল রবি ম্লানমুখে ধীরে ধীরে অস্তাচলে।
সারাদিন উড়ে উড়ে নীড়ে পাখী ফিরে এল,
জনস্রোত কোলাহল দূরে কোথা' মিশে গেল।
অনন্ত আঁধার-রাশি আবরিল দশধার,
স্থল, জল, নভঃ তা'য় মিশে হ'ল একাকার।
ফুটা'য়ে কড়িকাগুলি ধীরে বায়ু যায় ছুটে,
মেঘে ঢাকা নীলাকাশে ক্রমে কত তারা ফুটে।
বিচ্ছিন্ন জলদ-জাল বায়ুভরে উড়ে যায়,
ফাঁক পেয়ে উঁকি দিয়ে তারাগুলি হেসে চায়।
উজলি' সুদূর নভঃ চপলা চকিতে ধায়,
ধাঁধিয়া নয়ন-ক্ষণে পুনঃ কোথা' মিশে যায়।
শারদ প্রারম্ভ নিশা আলোক আঁধারময়,
গভীর ক্রমেতে যত তত যেন দীপ্ত হয়।
নীরব সুষুপ্তধরা মহাশান্তি চারিধার,
প্রবাসে অভাগা শুধু কাঁদি জেগে অনিবার।
ঘুম নাই, তন্দ্রা আছে—শয়ন কণ্টকময়,
উঠি, হাঁটি, বসি, শুই তবু প্রাণ শান্ত নয়।
মহাশূন্য দগ্ধ প্রাণ কি যে ভাবি ঠিক নাই,
আদি নাই, অন্ত নাই, তবু কেন ভাবি ছাই।
কোথা' প্রাণ, কোথা' দেহ কি যে ল'য়ে এনু চলে,
হাসি সাধ বড় ভুলে কোথায় এসেছি ফেলে।
মুছাইতে অশ্রুধারা কিছু নাহি বর্ত্তমান,
অতীতের স্মৃতিমাত্র সজীব রেখেছে প্রাণ।
কা'র মৃদু-হাসি টুকু কি যেন সুখের পাশ,
প্রিয়জন স্নেহমায়া শিশুর অফুটভাষ।

কোথা বা শৈশব-কুঞ্জ—সুখশান্তি নিকেতন,
অচেনা প্রবাস-প্রান্তে প্রাণ বড় জ্বালাতন।
অনুমাত্র অসুখেতে কে যেন কাছেতে আসি,
শুধাইত কত কথা, কভু কাঁদি কভু হাসি।
উদাস ভগন প্রাণ কাঁদাতে দ্বিগুণ তায়,
সে সুখের স্মৃতিগুলি কেন মনে উঠে হায়!
দু' দিনের হাসি খুসি দু' দিনে সে ফুরায়েছে,
তবে কেন স্মৃতি তা'র ছেঁড়া প্রাণে রয়েগেছে।
সে গুলি ভুলিলে বুঝি পোড়া হৃদে সুখ পাই,
ছিঁড়িতে সে স্মৃতি-সূত্র কিছু কি কোথাও নাই।
সাধ হয় চিরে বুক সে গুলারে দিই ফেলে,
আশা-হীন নির্ব্বাপিত সুখে কেন মরি জ্বলে।
না-না থাক! চিরদিন অতীত(ই) সম্বল মম,
ভাবী কিম্বা বর্ত্তমান হবে না তাহার সম।
তা'ই নিয়ে নাড়া-চাড়া তাতেইত কাঁদি হাসি,
সে সুখ প্রবাহে বুঝি, আজু আমি আছি ভাসি।
যেথা যাই যতদূরে একদিন এ জীবনে,
মিশিব সে অতীতের সাধের স্বজনসনে।
সেই আশে বেঁধে বুক এততেও আছি বেঁচে,
তা' নহিলে সুখ-আশা বহুদিন গেছে ঘুচে॥

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

বঙ্গেশ্বর।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অনেকদিন হইতে, নানাকারণে রাজ্যশাসনের ব্যয় দ্বিগুণিত হইয়াছে। ব্যয় ভার লাঘব করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ দরিদ্র কেরাণীকুলেরদিকে তীব্রকটাক্ষ করিতে বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর

কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারল ও ষ্ট্যাণ্ডিং কৌউন্সেলের বেতন হ্রাস করিবার জন্য, তৎকালীন রাজ-প্রতিনিধির অনুমতির জন্য আবেদন করেন; অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু এই একটী সামান্য কার্য্য, বঙ্গেশ্বর ইলিয়ট বাহাদুরের সৎ-সাহস, উদারতা ও ন্যায়ের প্রতি আস্থার জ্বলন্তভাবে সাক্ষ্য দিতেছে। দরিদ্রের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করতঃ সামান্য ব্যক্তির বেতন হ্রাস না করিয়া, যিনি উর্দ্ধতন-কর্ম্মচারীর বেতনের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, তিনিই যথার্থ প্রজারঞ্জক—তিনি যথার্থ রাজা।

১৮৯২ সালের শেষভাগে জুরি বিজ্ঞাপন লইয়া বঙ্গে মহা হুলস্থূল হইয়াছিল,—নানালোকে নানাকথা বলিয়াছিল। জুরি-প্রথা প্রচলিত, বিচার কার্য্য সাহায্য করিবার জন্য। জুরি-প্রথা মোকদ্দমা বিশেষে বিশেষ ইষ্টকর ও প্রয়োজনীয় নহে; এই সরল ধারণায় বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর কেবলমাত্র কতকগুলি মোকদ্দমা সম্বন্ধে ঐ প্রথা রদকরতঃ আসেশর দ্বারা বিচার প্রথা প্রচলিত করেন। প্রকৃত বিচার হইবে, এই ধারণায় এইরূপ পরিবর্ত্তন অবলম্বিত হয়। রাজার কর্ত্তব্য শত সহস্র। যাঁহার স্কন্ধে রাজ্যভার ন্যস্ত, তিনি যে সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দেন, দেশের, প্রজাকুলের কোন বিষয়ে ইষ্ট হইবে, এই বিষয় চিন্তা করেন, ইহাই মহৎ গুণ। দেশমধ্যে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইল। কমিশন বসিল, স্থির হইল, জুরি-প্রথা অটুট থাকা প্রয়োজন; বঙ্গেশ্বর দ্বিরুক্তি না করিয়া আপন বিজ্ঞাপন রদ করিলেন। বিচারের উন্নতি-কল্পে যিনি সরলান্তঃকরণে কোন আদেশ জারি করেন, একথা বিস্মৃত হইয়া অকারণ নিন্দাবাদ করা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। যিনি রাজা হইয়া রাজ্যের উন্নতিবিধানের জন্য কার্য্য করেন, তাঁহার ভ্রম হইলেও, তিনি পূজনীয়!

বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর চৌকিদারী আইন পাস করিয়া গ্রাম্য চৌকীদারের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন, এবং পল্লীগ্রামবাসীর বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মানুষের আইন কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না; কিন্তু যতদূর সাধ্য, পল্লীগ্রামবাসীর উন্নতিসাধনার্থ উক্ত

আইনে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, এই আইন সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র কথা আছে। বর্ত্তমান আইন পাস হইবার পূর্ব্বে চৌকীদারগণকে না কি কোন কোন উচ্চতর কর্ম্মচারীর নানাকার্য্য করিতে হইত। এখন আদেশ হইয়াছে যে, কোন কর্ম্মচারী চৌকীদারকে আপন কার্য্যে খাটাইতে পারিবে না। প্রত্যেক চৌকীদার সেজন্য বঙ্গেশ্বরকে একান্তমনে আশীর্ব্বাদ করিবে। দরিদ্রের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি, সামান্য কর্ম্মচারীর প্রতি যাঁহার এইরূপ সহৃদয়তা, ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই সকলের একান্ত প্রার্থনা।

বঙ্গের শাসনকর্ত্তার বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর দৃষ্টি আছে। সে দিন প্রকাশ্য সভায় কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "কুরুক্ষেত্র" কাব্যের তিনি প্রচুর প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। উক্ত কাব্যের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি উহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। যিনি রাজার কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যেও বঙ্গের উৎকৃষ্ট কাব্যপাঠে বিমুখ হন না, তাঁহার মানসিক ক্ষমতা কি প্রকার, ক্ষুদ্র বঙ্গবাসীর পক্ষে উহা ধারণা করা নিতান্ত সহজ নহে।

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি শাসনকর্ত্তার দৃষ্টি থাকিলে, উহার উন্নতি হওয়া সম্ভব। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার জন্য কোম্পানি হইতে উপাধি পাইয়াছিলেন, এখন তিনি অনন্তে মিশাইয়াছেন। কবিবর হেমচন্দ্র, এবং নবীনচন্দ্রের প্রতি ঐ প্রকার রাজ-সম্মান দেখিলে, সাধারণ ব্যক্তিগণ সুখী হইবেন। বর্ত্তমান গুণগ্রাহী বঙ্গেশ্বরের সময়ে আমরা উক্ত কবিদ্বয়ের উপাধিলাভ দেখিতে ইচ্ছা করি।

সাধারণ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে ও ইলিয়ট বাহাদুরের বিশেষ দৃষ্টি আছে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যাঁহার উৎকৃষ্ট হইবে, তিনি একখানি স্বর্ণপদক পাইবেন, কিছুদিন হইল, এইরূপ একটী বিজ্ঞাপন বাহির হয়। অনেকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি নানাপ্রকার প্রবন্ধ রচনা করেন। জনৈক ওভারসীয়ার "বরিশাল কামান" (Burishal Gun) সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেন; তিনিই "ইলিয়ট-মেডাল" প্রাপ্ত হইয়াছেন। বরিশাল যে নদীতীরে স্থিত, ঐ নদী হইতে বর্ষাকালে

কামানের শব্দের ন্যায় এক প্রকার শব্দ শুনা যায়। ওভারসীয়ার বাবু উক্ত শব্দের কারণ নির্দ্ধারণ জন্য বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আপন প্রবন্ধ রচনা করেন; বিষয়টী নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী হওয়ায়, ইলিয়ট বাহাদুর উক্ত রচয়িতাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

সে দিনমাত্র মফঃস্বল সম্বন্ধে মিউনিসিপাল বিল আইনে পরিণত হইয়াছে। অনেক শক পর্য্যন্ত উক্ত বিল-সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় তর্ক-বিতর্ক হয়, সভ্যগণ উক্ত বিলসম্বন্ধে বিশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; মফঃস্বলের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। এখন এই আইনের দ্বারা সাধারণের উপকার হইলে, আইন কর্ত্তাগণের পরিশ্রম সফল হয়।

বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর রাজ্যের সমস্ত বিষয় স্বয়ং দেখেন, এবং দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য করেন; তিনি একদিনের জন্যও "বেলভিডিয়ারে" বিনাকার্য্যে অবস্থিতি করেন না। সদাই তিনি মফঃস্বলে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং মফঃস্বলের অবস্থা নিজের চক্ষে দেখিয়া উহার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেছেন। কর্ম্মচারীগণের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি মফঃস্বল সম্বন্ধে, প্রজাগণের অভাব সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। এইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণু শাসনকর্ত্তা বাঙ্গালার অদৃষ্টে কখন ঘটে নাই। মফঃস্বলের অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া সু-শাসনের পক্ষে বিশেষ ইষ্টকর। কোথায় প্রজাগণের কি অভাব; কোথায় কি করিলে সাধারণের উপকার হয়, একথা যাঁহার হৃদয়ে স্পষ্টই জাগরূক রহিয়াছে, তিনিই শাসনকর্ত্তা নামের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।

এইরূপ প্রথা যদি প্রত্যেক শাসনকর্ত্তা অনুসরণ করেন, তবে দেশের বিশেষ উন্নতি ও উপকার হওয়া সম্ভব। মুষ্টিমিত ভারতবাসী "সিভিল সারবিসে" প্রবেশলাভ করিল কি না, ইহাতে সাধারণের তত কিছু যায় আসে না;——দেশের কোন বিশেষ উপকার দর্শে না। যাহাতে প্রজা সাধারণ কোন কষ্ট না পায়, ব্যাধিদ্বারা প্রপীড়িত না হয়, উত্তম পানীয়জলের দ্বারা স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, উদারান্নের জন্য লালায়িত না হয়, অবিবাদে চোর ডাকাইত

হইতে আপন সম্পত্তিরক্ষা করিতে পারে, ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে পরিভ্রমণ দ্বারা তথ্য সংগ্রহকরতঃ যিনি বিধি-বিধান করিবার চেষ্টা করেন, তিনিই বঙ্গের যথার্থ বন্ধু।

শ্রীহরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিহিংসা।

(প্রথম পরিচ্ছেদ।)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশে হীরক চূর্ণের ন্যায় দু’ একটী নক্ষত্র ঝিকি মিকি করিতেছে, দ্বিতীয়ার চাঁদ এখনও উঠে নাই। কিয়ৎকালের জন্য অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। এই ঘোর-অন্ধকারের মধ্যে রাধামতী-তীরস্থ একটী অল্পবিন্যস্ত আম্র কাননের অভ্যন্তরে থাকিয়া, একটী রমণী অদূরবর্ত্তী ঘাট-পানে সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, এবং সমীরণ সঞ্চালিত বৃক্ষ পত্র সমূহের মর্ মর্ ধ্বনিতে কাহার পদ-শব্দ ভাবিয়া যুগপৎ ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইতেছিল। দণ্ডেক কালপরে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া, দ্বিতীয়ার চাঁদ উদয় হইল; ম্লানাপৃথিবী রজত কিরণ-মালায় হাসিয়া উঠিল। সেই আলোকে রমণী দেখিতে পাইল, সে যাহার জন্য এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে, সে একাকী ঘাটের সোপানোপরি উপবেশনকরতঃ চন্দ্রকিরণ-বিধৌত নদী বক্ষের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। রমণী নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, সহসা কোন কথা কহিতে সাহসিনী হইল না।

সোপানোপরি উপবিষ্ট মনুষ্য, রমণীর আগমন জানিতে পারে নাই। সে প্রগাঢ়-অভিনিবেশ-সহকারে প্রকৃতির হৃদয় সম্মোহনকারিণী শোভানিচয় সন্দর্শনকরতঃ এক অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ-রসে অবগাহন করিতেছিল। কালক্ষণ পরে তাহার দৃষ্টি রমণীর প্রতি পতিত হইলে, রমণী একটু আকুঞ্চিতা হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

উপবিষ্ট মনুষ্যটী বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে রমণীরদিকে চাহিয়া কহিল,—“কালি! এমন জন-মানব-শূন্য-স্থানে রাত্রিকালে কি জন্যে আসিয়াছ?”

রমণী কথা কহিতে প্রথমতঃ একটু থতমত খাইল; পরক্ষণেই কম্পিতস্বরে উত্তর করিল,—“শ্রীশবাবু! কাহাকে না বল ত, তোমায় একটী কথা বলি।”

শ্রীশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—“কি কথা কালি?”—রমণী একটী বিদ্যুৎদাম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—“আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমার দণ্ডেককাল অদর্শনও আমার পক্ষে অসহ্য, আমার অবিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির তুমিই একমাত্র উপায়।”

শ্রীশ, কালীর হৃদ্গতভাব বুঝিল; বুঝিয়া দারুণ ঘৃণা বিমিশ্রিত ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে কহিল, “কালি! তুমি যুবতী, আমি যুবক; এতদাবস্থায় তোমার এমন নিঃসঙ্কোচভাবে এখানে থাকা অত্যন্ত বিগর্হিত হইতেছে। রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে ফিরিয়া যাও।”

শ্রীশের কথায় এমন কিছু প্রকাশ পায় নাই, যাহাতে কালীর সযত্নে পোষিত হৃদয়-উদ্যান-জাত আশা-লতা একেবারে নির্ম্মূল হইতে পারে। সুতরাং কালী অপেক্ষাকৃত প্রহৃষ্টমনে এক পা, দু’ পা করিয়া তখনকার মত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শ্রীশ, তদবস্থায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—স্ত্রীলোক কি এত অপদার্থ, এত লজ্জাহীনা যে, যাহার হৃদয় মন তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তেমন পর-পুরুষের সমক্ষেও আপনার অন্তরনিহিত কলুষভাব পরিব্যক্ত করিতে সাহসিনী হয়? যাহাদিগকে দেবীজ্ঞানে হৃদয়িক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া আসিতেছি, তাহারা ঈদৃশী পিশাচিনী! মানব অন্তর কি এমনই পরিচ্ছদ্ম-পরিচ্ছদে আবৃত? পবিত্র প্রণয়-নীর পাপবাসনার পঙ্কিলতায় কি এমনই আবিল? এইরূপ আরও কত চিন্তাতরঙ্গ তাহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া, তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। অনেক রাত্রে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে রাত্রির অবশিষ্টাংশ শান্তিলাভ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চড়কডাঙ্গার চক্রবর্ত্তীরা এককালে খুব বড় মানুষ ছিল। কিন্তু কালের অপ্রতিহত প্রতাপের নিকট কি রাজা, কি প্রজা, সকলকেই একদিন অবনত-শির হইতে হয়। কালে, চক্রবর্ত্তীদের সোণার সংসার প্রায় শ্মশানে পরিণত হইল। একটী দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালক ভিন্ন, সে বংশে বাতি দিতে আর কেহই রহিল না। এই বালকের নাম নলিনীকুমার।

নলিনীর এক বৈমাত্রেয়ী বিধবা ভগিনী ছিলেন। তিনি তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীশকে লইয়া, স্বামীর সংসারেই থাকিতেন। নলিনী এই বিধবা ভগিনীর বিশিষ্টরূপ যত্নে ও চেষ্টায় অবশিষ্ট পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইলেন; এবং কলিকাতায় জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির একমাত্র দুহিতার সহিত পরিণীত হইলেন। নলিনী কলিকাতায় শ্বশুরাশ্রয়ে থাকিয়া, চলন সই গোচের একটু ইংরাজী শিখিয়া, শ্বশুরের সুপারিসে মফঃস্বলে একটী লাভজনক চাকরী পাইয়া ভগিনীর অত্যন্ত দুরবস্থা দেখিয়া, শ্রীশকে আপনার নিকটে রাখিয়া, লেখাপড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

শ্রীশচন্দ্র মাতুলাশ্রয়ে থাকিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার উন্নতি-পথে এক কণ্টকলতার উৎপত্তি হইল। সেই কণ্টকীলতা পূর্ব্ব কথিতা কালীতারা। কালীতারা কায়স্থের কন্যা, নলিনীর স্ত্রীর প্রিয়তমা ও প্রধানাসখী। কালীতারার পিত্রালয় কোথায়—কেহ তাহা জানিত না। নলিনীর শ্বশুর বাড়ীর সন্নিকটে কালীর এক বৃদ্ধা মাসী ছিল, তাহার দ্বারা কালী প্রতিপালিতা হয়। কলিকাতার ভিতরেই কালীর বিবাহ হইয়াছিল; পূর্ব্ব হইতে কালীর চরিত্র দোষ-সংস্পৃষ্ট হওয়ায়, সে বিবাহ সুখের হয় নাই। ক্রমে তাহার চরিত্র ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠে; অবশেষে উপপতির প্ররোচনায় বিষ-প্রয়োগে স্বামীর প্রাণ নষ্ট করে। এই ঘটনার পর, তাহার মাসী তাহাকে পরিচারিকারূপে নলিনীর শ্বশুর বাড়ীতে রাখিয়া দেয়, তখন হইতে নলিনীর স্ত্রীর সহিত তাহার খুব মাথামাখি ভাব জন্মিয়া যায়। কালীর মুহূর্ত্তেক অদর্শনে নলিনীর স্ত্রী না কি জগত-সংসার আঁধা আঁধা দেখেন, এই কারণে কালী তাহার কাছ-ছাড়া হইতে পারিত না, ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইত।

কালীর বয়স ঠিক করা বড় সহজ নয়। তবে তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া, তাহাকে অনেকেরই ষোড়শী যুবতী বলিয়া ভ্রম হইত। কালীর অবয়বের গঠন গোলগাল, এবং গাত্রের রংটী বেশ ফুট্ ফুটে ছিল। সর্ব্বোপরি তাহার আকর্ণ বিস্তৃত পটলচেরা দুইটী চক্ষু ছিল, তাহা যাহার প্রতি বিক্ষিপ্ত হইত, তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইবার উপক্রম হইত। কিন্তু কালী দুশ্চরিত্রা হইলেও, সে যে'-সে' লোকের প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে নিরতিশয় কুণ্ঠিতা ছিল; ভদ্রঘরের সুন্দর নবীনযুবা পুরুষেরাই তাহার একমাত্র বেধ্ব ছিল। তা'ই সে, সকল সৌন্দর্য্যের আধার শ্রীশকে তাহার পাপ-বাসনা বিরতির একমাত্র পুত্তলিজ্ঞানে, তৎপ্রতি ধাবমানা হইল। ইতঃপর, যে উপায়ে তাহার হৃদয়ের কলুষভাব শ্রীশের নিকট ব্যক্ত করে, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নলিনী অদ্য রাত্রিযোগে বাড়ী হইতে চাকরীস্থলে গমন করিবেন। ভৃত্যবর্গ সমুদয় জিনিস-পত্র গুছাইয়া বাঁধিতেছে, বাটীর অপরাপর সকলেই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত। একটী নির্জ্জন কুঠারীর মধ্যে ক্ষীণদীপালোকে শ্রীশচন্দ্র নিজের জামা, কাপড় ও পুস্তকাদি গুছাইয়া রাখিতেছিল, এমত সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পুরঃসর কালীতারা সেই গৃহে প্রবেশ করতঃ, অর্দ্ধোমুক্ত কপাট দুখানি অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল। অর্গলাবদ্ধের অনুচ্চ শব্দ শ্রবণে শ্রীশচন্দ্র চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—'কালী'! বিষমভয়ে ও লজ্জায় তাঁহার সুন্দর হাসি-হাসি মুখখানি রাহুগ্রস্থ পূর্ণশশীর ন্যায় ম্লান হইয়া গেল;

হৃদয় দূর দুর করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব—কাহারও মুখে কথাটী নাই। অতঃপর কালী, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অতি মৃদু-মধুরস্বরে কহিতে লাগিল,—"শ্রীশবাবু! সত্যি ক'রে বল, তুমি আমায় ভালবাস কি না?" শ্রীশের কথা ফুটিল না, নীরব কাষ্ঠপুত্তলিকা-বৎ দাঁড়াইয়া দেয়ালস্থিত একখানি ছবির প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কালী পুনর্ব্বার কহিল, "শ্রীশবাবু! তুমি আমায় পরিত্যাগ করিতে যতই চেষ্টা কর না, আমি তোমারে কখনই ছাড়িব না। তোমার এখানে থাকিতে ভয় হয়, চল, আমরা কোন দূরদেশে চলিয়া যাই। তোমাকে লইয়া আমি শ্মশানেও সুখী হইব। এখন বল, তুমি আমার হ'বে কি না?"

শ্রীশচন্দ্র অধিকক্ষণ নিরুত্তর থাকা যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিল না। বলিল,—"কালি! আমার আশা পরিত্যাগ কর। আমি তোমার উদ্দাম ইন্দ্রিয়-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। আমি গরীবের ছেলে—আমার মাতা অন্নাভাবে যার পর নাই ক্লেশ পাইতেছেন, আমি পরের অর্থ-সাহায্যে কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিতেছি, আমার এই উন্নতিমার্গের তুমি পরিপন্থী হইও না।"

কালী। "দেহে প্রাণ থাকিতে—হৃদয় হইতে তোমার আশা বিসর্জ্জন করা আমার সাধ্যাতীত; আমাকে 'কণ্টক' মনে করিও না। যাহাতে তুমি সুখী হও, তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

শ্রীশের নিরুদ্ধ ঘৃণা ও ক্রোধাবেগ উথলিয়া উঠিল। পূর্ব্বের ন্যায় ধীরতাবলম্বন করিতে না পারিয়া কহিল,—"তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। আমি তোমার পঙ্কিল প্রণয়ের অভিলাষী নই।"

কালী, এরূপ কঠোর কর্কশবাক্যেও কিঞ্চিন্মাত্র রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইল না। সে ভাবিল, এ ছোক্‌রা বড় সেয়ানা, ভাল মানুষেতো করিলে কাজ আদায় হইবে না। সুতরাং যুবতী নারীর যে সমুদয় অব্যর্থবাণ আছে, সেইগুলি শ্রীশের প্রতি প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল। প্রথমতঃ বিদ্যুৎসদৃশ একটী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, তাহাতে শ্রীশের চিত্ত-বিভ্রম ঘটাইতে পারিল না। সর্ব্বশেষে (লিখিতে লজ্জা হয়) সহাস্যবদনে স্ব-শরীরের স্থান বিশেষে উপর লক্ষ্য করিয়া কালী কহিল, দেখ দেখি আমি কেমন সুন্দরী! আমার এমন রূপ, এমন যৌবন, আমি সাধিয়া তোমার নিকট বিকাইতেছি, আর তুমি আমার উপেক্ষা করিতেছ? ছিঃ! তুমি ভারী নির্ব্বোধ।"

ঐশ্বরিকবলে বলবান্ শ্রীশচন্দ্র কিছুতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; শ্রীশ পূর্ব্বাপেক্ষা গভীরতর অবজ্ঞার সহিত কহিল,—"পিশাচিনি! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ'। নহিলে, একথা বাবুকে বলিয়া দিয়া তোর সমুচিত শাস্তি বিধান করিব।"

কালী, আহতকণ্ঠা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সদর্পে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমায় যখন উপেক্ষা করিলে, তখন তোমার কিছুতেই মঙ্গল নাই। আজ হইতে——

"প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা সার।
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।"

এই বলিয়া গর্ গর্ করিতে করিতে বিদ্যুৎবেগে কালী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। শ্রীশ, কালীর সেই কঠোর প্রতিজ্ঞায় ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা করিয়া ম্রিয়মাণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে নলিনী সপরিবারে কর্ম্ম-স্থলে পৌঁছিল। কালামুখী কালীতারা ও তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নানারূপ উপায় পরিচিন্তনে নিরত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কালীতারা নলিনীর স্ত্রীর প্রিয়তমা ও প্রধানা সখী। এই ঘনিষ্ঠতাই কালীর অন্তরস্থিত গূঢ়দুষ্টাভিসন্ধি-কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়স্বরূপ পরিগণিত হইল। একদিন কালীতারা কাঁদিতে কাঁদিতে নলিনীর স্ত্রীর কাছে আসিয়া কহিল, "ভাই গঙ্গাজল! আমার এ পাপ-পুরীতে থাকা হলো না। আমার যা' কিছু তোমার কাছে আছে, দাও, আমি দেশে চলিয়া যাই।"

নলিনীর স্ত্রী। হয়েছে কি? খুলেই বল্‌না ছাই! কালী আরও

ফুক্কারিয়া কাঁদিতে লাগিল। নলিনীর স্ত্রী—কালীর "বহতি বলিত বিলোচন-জলধর-মানন-কমল মুদারং। বিধুমিব বিকট বিধুন্তুদ দন্ত-দলন গলিতামৃতধারং" দেখিয়া একটু মায়া-কান্না কাঁদিলেন। কিছুক্ষণ কান্নাকাটার পর কালসাপিনী কালী কহিল যে, শ্রীশ কি একটা অতি বিশ্রী কথা বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছে। সেইজন্য তাহার লাখ্‌টাকা দামের মান ক্ষয় গিয়াছে।—এই কথা শুনিয়া নলিনীর স্ত্রী কহিল,—"অ্যাঁ! বলিস্ কি? শ্রীশ ত তেমন বদ্‌ছেলে নয়!"

কালী। শ্রীশ ভালই হ'বে। আপনার জনকে কেহ কি মন্দ দেখিয়া থাকে? আমায় কতদিন কত কথা কয়েছে, তা' আমি বাক্যটীও করি নাই। বড় বাড়াবাড়ী দেখে আমার মনে বড় ভয় হলো, পাছে তোমরা জান্‌তে পারিয়া, শেষে আমাকে শুদ্ধ দোষী-কর, তা'ই আজ একথা বল্‌তে এলেম। তোমার সাথে এসে যা'র তা'র কাছে এমন ক'রে অপমানী হইতে হইবে জানিলে, আমি কখনই আসিতাম না। এই বলিয়া কালী কাঁদিতে লাগিল।

নলিনীর স্ত্রী। শ্রীশ এতদূর বদ্ হ'য়ে উঠেছে! ভাগ্যি তুই আজ বল্‌লি, তা'ই সব জান্‌তে পারিলাম? বাবু আফিস থেকে এলে দেখ্‌বি, আজ কি একখানা করি! নচ্ছরটাকে ঝ্যাঁটা পেটা কর্‌ব, তবে ছাড়্‌ব। আমার খেয়ে, আমার পোরে, আমার প্রাণের সইকে ঠাট্টা! মিট্‌মিটে 'সয়তানি' আজ বেরুবে! চুপ কর ভাই! চুপ কর।

ঔষধ ধরিয়াছে বুঝিয়া কালীতারা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। নলিনী পাঁচটার সময়ে বাসায় আসিলেন। শ্রাবণের জল-ভরা মেঘের মত যুবতী গৃহিণীর মুখমণ্ডল ভারাক্রান্ত দেখিয়া, তাঁহার আত্মাপুরুষ শুখাইয়া গেল। গৃহিণী, কর্ত্তাকে দেখিবা-মাত্র আষাঢ়ে মেঘের ন্যায় আপন মনে গুরুগম্ভীর গর্জ্জন করতঃ কর্ত্তার ভয়বিহ্বল-চিত্তে আরও ত্রাস জন্মাইয়া দিলেন। কর্ত্তাও মনে মনে বিষম প্রমাদ গণিলেন। যত গর্জ্জন, তত কিন্তু বর্ষণ হইল না; এটা কর্ত্তার কম সৌভাগ্য নয়। বিশৃঙ্খলা গৃহিণী প্রকৃতি স্বাভাবিকী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, কর্ত্তার পলায়িত সাহস ফিরিয়া আসিল।

তখন তিনি গৃহিণীর বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। গৃহিণীর কথিত আদ্যন্ত বিশ্বাস করিয়া শ্রীশকে গুরুতররূপে প্রহার দিলেন। শ্রীশ বিজাতীয় ঘৃণায় ও অপমানে মাতুলাশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইয়া, রঙ্গপুরে জনৈক শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর নিকটে আসিল; এবং তথায় তাঁহারই উদ্যোগে বিবাহ করিয়া, শ্বশুরের অর্থানুকূল্যে বিদ্যার্জ্জন করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিধির নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠা, ক্ষুদ্র মনুষ্য শক্তির অতীত। শ্রীশচন্দ্র শ্বশুরাশ্রয়ে থাকিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে-ছিল; কিন্তু তাহার এ ধারণা অচিরাৎ বিদূরিত হইল। মানুষ যে দিক হইতে কোন বিপদ্‌পাতের আশঙ্কা করে না, সচরাচর বিপদ সেইদিক হইতেই উপস্থিত হয়। মাসত্রয়-অন্তে নলিনী বদলী হইয়া রঙ্গপুরে সদরে আসিলেন; শ্রীশের দুরদৃষ্টবশতঃ নলিনী, তাঁহারই শ্বশুর মহাশয়ের সীমা-সংলগ্ন অন্য এক বাড়ীভাড়া লইলেন। শ্রীশ সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়া অতিশয় সাবধানে চলাফেরা করিতে লাগিল। কিন্তু অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফিরে; মানুষ সহস্রচেষ্টায়ও তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। কালী এখানে আসিয়াও শ্রীশের প্রতি তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসা-বৃত্তি নিবৃত্ত করিবার কৌশল-উদ্ভাবনে যত্নবতী হইল। এবার সে আশাতিরিক্ত ফলও পাইল।

শ্রীশের স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেও, জ্ঞানানুশীলনের অনুরোধে শ্রীশ তাঁহার সহিত বেশী মিশিত না। এইজন্য অনেকে কাণাকাণি করিত যে, শ্রীশ তাঁহার স্ত্রীকে ভালবাসে না। এই মিথ্যা সন্দেহই শ্রীশের জীবন-নাশের হেতু হইল। কালী শ্রীশের শ্বশুরের বাসাতে প্রত্যহই দুই তিনবার করিয়া আসা-যাওয়া করিত; শ্রীশ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। কালী দুই দশদিনে শ্রীশের স্ত্রীকে এমনই বশ করিয়া ফেলিল যে, সে যাহা বলিত, শ্রীশের স্ত্রী বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাই করিতে প্রস্তুত হইত। একদিন কথায় কথায় শ্রীশের স্ত্রী আক্ষেপ করিয়া কালীতারাকে বলিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে

ভালবাসে না। "এতদিন যে সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, তাহা উপস্থিত হইয়াছে"—এই কয়েকটী কথা আপনা-আপনি কালীর জিহ্বা হইতে স্খলিত হইল। কালী মনে মনে এক ভীষণ মতলব ঠাওরাইল। শ্রীশের স্ত্রী তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিল না সত্য, কিন্তু সে বুঝিল যে, তাঁহার স্বামী তাহাকে ভালবাসে না, এবিষয় কালীকে জানান ভাল হয় নাই।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কালী আবার কহিল, "তোমার সোয়ামী তোমায় ভালবাসে না কেন ?"

শ্রীশের স্ত্রী। বোধ হয়, আমাতে তেমন কোন গুণ নাই।

কালী। আমার কথা শুন ত তোমার স্বামীকে তোমার আঁচল ধরা করিয়া দিতে পারি। শ্রীশের স্ত্রী স্ত্রীজন-সুলভ-চপলতাবশতঃ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল,—"তোমার কথা শুন্‌ব বই কি, কি বল্‌বে বল না ?"

কালী। আমি তোমায় একটী ওষুদ দিব, পানের সঙ্গে খাওয়াইতে হইবে। কেমন পারিবে ত ?

শ্রীশের স্ত্রী। তা' এ আর পারব না ?

স্বকার্য্য উদ্ধারের পথ পরিষ্কার হইল দেখিয়া, কালী এক বিকট হাস্য করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। সেই অমানুষিক হাসিতে শ্রীশের স্ত্রীর কেমন একটু ভয় হইল, কিন্তু স্বামীবশ করার প্রবল ইচ্ছা, সে ভয় শীঘ্রই দূর করিয়া দিল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কালীতারা শ্রীশের স্ত্রীকে একটী শুষ্ক মূল এবং তৎসঙ্গে তদুপযুক্ত উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল। শ্রীশের স্ত্রী নিঃশঙ্কভাবে কালীদত্ত শিকড়টী পানের ভিতরে পূরিয়া স্বামীর হস্তে দিল, শ্রীশ অসন্দিগ্ধচিত্তে পান চিবাইতে চিবাইতে গিয়া শয়ন করিল। প্রভাতে উঠিয়া সকলে দেখিতে পাইল, শ্রীশের প্রাণশূন্য দেহ বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে কালীর দুরভিসন্ধি ব্যক্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু কালীকে সেই হইতে আর পাওয়া গেল না।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠগী জীবনী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মস্‌জিদের ঐ বৃদ্ধ মোল্লাটিকে আমি অতি প্রবীণ ব্যক্তি বলিয়া ভক্তি করিতাম। তাঁহার নিকট হইতে কোরাণের বিষয় সকল অবগত হইয়া, আমার মন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন তিনি আমাকে স্বর্গের সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেন, যখন তাঁহার মুখ হইতে শুনিতে পাইতাম যে, শত শত সুন্দরী, মুক্তা সদৃশ দশন সম্পন্না, নীলমণি-বিনিন্দিত চক্ষু-যুক্তা, সুরভি-বিমল-নিশ্বাস-গ্রহণ-কারিণী, রত্নালয় নিবাসিনী হোরাগণ মহম্মদ ধর্ম্ম বিশ্বাসকারীদের আহ্বান করিবে, তখন আমি ভাবিতাম, যে আমি সেই সমস্ত সম্ভোগ করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এবং সেই সব আমি যখন ইস্‌মাইলের নিকটে বলিতাম, তিনি আমার ন্যায় আহ্লাদিত হইতেন, এবং বলিতেন যে, ঐ ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া তাহার মনোহারিণী বর্ণনাচয় উপভোগ করা তাঁহার কপালে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এরূপ মোল্লাকেও হোসেন অজ্ঞান বলিতেন, এবং তাহা তাহাতেই আমি বুঝিলাম যে, তাহাদের কার্য্য উচ্চতর এবং তাহার পুরস্কারও স্বর্গের বৈভব অপেক্ষা অধিক। কিন্তু সেই সব পুরস্কার কি হইতে পাওয়া যায়, আমার জানিবার বড় ইচ্ছা হইল, এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, ইস্‌মাইল নিজে যদি না বলে, তাহা হইলে আমিই এই কথা পড়িব।

আমার সে রাত্রে ঘুম হইল না। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম যে, ইস্‌মাইল চলিয়া গিয়াছে, সে কিছুদিনের জন্য ফিরিয়া আসিল না। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বহুদিন হইতেই আমার এই বিষয়ে কিছু সন্দেহ হইয়াছিল, এবং এ রহস্য যাহাই হউক না কেন, ইহার সহিত যে প্রকৃত ব্যবসার সংস্রব ছিল, তাহাতে আমার আর কোনই সন্দেহ ছিল না। সে কখনও বস্ত্র ব্যবসায়ী হইতে পারে না, কারণ যে বস্ত্র ব্যবসায়ী তাহার কখন

এরূপ উচ্চ আশা থাকিতে পারে না; তাহা হইলে ব্যবসা ছাড়া ইহার অপর কোন উদ্দেশ্য থাকিবে, যাহা আমার বুদ্ধিতে আসিল না। আমি ইহার কিছু তত্ত্ব পাইবার অভিলাষে ঐ বৃদ্ধ মোল্লার আলয়ে উপস্থিত হইলাম। আজি জুল্লা (ইহাই মোল্লার নাম) তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দয়ালুতার সহিত আমায় অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে, আমার বোধ হয় অসুখ হইয়াছে। কারণ, আমার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক এবং জ্বরাক্রান্ত বলিয়া তাহার বোধ হইয়াছিল। আমি বলিলাম, "আমার একটু অসুখ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে ভাল আছি। এবং বোধ হয়, অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ সুস্থ হইব।" আমি মহম্মদ ধর্ম্ম অনুসারে দৈনিক প্রার্থনা সমাপন করিলাম, এবং সকল কার্য্য শেষ হইলে পর, তাঁহাকে কোরাণ খুলিতে অনুরোধ করিয়া আমার প্রিয়-স্থানগুলি বুঝাইয়া দিতে বলিলাম। ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি চসমা লইয়া আরবভাষায় লিখিত পুস্তকখানি পড়িয়া আমাকে কঠিন কঠিন স্থানের অর্থগুলি বুঝাইয়া দিতে লাগিল। এবং যখন তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি আমার নিকট বহির অপরাংশগুলি লুক্কায়িত রাখিয়াছেন কি না?

তিনি বলিলেন—"বৎস! তোমার নিকট আমি কিছুই গোপন করি নাই, কিন্তু হায় তুমি যদি আমার গুরুর জ্ঞানগর্ভটীকা দেখিতে পাইতে, তবে দেখিতে এই সকল টীকা এত বিস্তৃত যে, কোন কোন স্থানের এক একটী ছত্রব্যাখ্যা করিতে এক একখানি বহি হইয়াছে। এক্ষণে তোমাকে পড়িয়া শুনান ভিন্ন আমার আর কিছুই উপায় নাই, এবং তোমার যতক্ষণ না মুখস্ত হয়, ততক্ষণ আমি তোমায় পড়িয়া শুনাইতে পারি।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি এ বয়স পর্য্যন্ত আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত একটী কথাও শ্রবণ করান নাই? আপনি নিশ্চয়ই আমার নিকট হইতে কিছু লুকাইয়া রাখিতেছেন, আমি বালক বলিয়া তাহা বলিতে সাহস করিতেছেন না।"

ঐ বৃদ্ধটী তখন বলিল, "না. কিছুই রাখি নাই। এক্ষণে আমার

বোধ হয় যে, তুমি বালক হইলেও তোমার বিশ্বাস খুব জ্ঞানী হইয়া গিয়াছে, এবং তুমি অন্যের দ্বারা পরিচালিত হইবে না।

আমি আরও বলিলাম—"মহাশয়! আপনার অনুগ্রহের জন্য আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার কিছু শিখিতে বাকী আছে কি না, ইহা জানিবার জন্যই আপনাকে এইরূপ বলিয়াছিলাম।" আমি তখন বুঝিয়াছিলাম যে, মোল্লা হয় কিছু জানে না, নয় আমাকে বলিতে স্বীকৃত নহে। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়! আপনার অনুমতি অনুসারে আমার কোন ব্যবসা গ্রহণ করা উচিত?"

তিনি বলিলেন,—"তুমি মোল্লার পদগ্রহণ কর, তোমাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে বটে; কিন্তু সময়ক্রমে তুমি এই সব বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবে। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও, জগদীশ্বরের ধর্ম্মপ্রচারক অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কোন উচ্চতর পদ নাই। আমি তোমাকে আরব্যভাষা শিক্ষা দিব, এবং তোমার পিতা যখন দেখিবেন যে, উহাতে তোমার একান্ত মনোনিবেশ হইয়াছে; তখন তোমাকে আর বাধা দিবেন না। বরং তোমার শিক্ষা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তোমায় দিল্লীতে পাঠাইয়া দিবেন।"

আমার মোল্লা হইবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না, সেইজন্য আমি বলিলাম—"আচ্ছা, পরে দেখিব।" আমি জানিতাম যে আজি-জুল্লা অতিকষ্টে দিনপাত করিয়া থাকে, এবং পরের দত্ত-বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করে। ইহা ব্যতীত ইস্‌মাইল, কিম্বা হোসেন, কিম্বা তাহাদের অপর কেহই মোল্লা নহে, এবং আমি তাহাদের দলে অবশ্য মিশিব; ইহাই আমার সঙ্কল্প হইল। আমি তাঁহার নিকট আর যাইতাম না। আমি তাঁহার নিকট, তাঁহার যাহা কিছু অল্পজ্ঞান ছিল, তাহা পাইয়াছি, এবং এক্ষণে তাঁহার নিকট যদি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি, তাহা হইলে তিনি অবশ্য তাহার মত সমর্থনার্থে তর্ক করিবেন। আমি সে সব ভালবাসি না, কাজেই সে পথে আর আমি যাইতাম না।

হায়! তখন মোল্লা হইলাম না কেন? আমার এক্ষণকার অবস্থার

সহিত তুলনায় যে কোন অবস্থাই ভাল বলিয়া বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ইহা আমার অদৃষ্ট, এবং জগদীশ্বরের ইচ্ছা, ইহাতে আমি কখনও অসন্তুষ্ট হইব না।

হায়! আমার অদৃষ্টে যদি ইহাই না লিখিত থাকিত, তাহা হইলে আমার পিতা কি কখন হত হইতেন? আমি কি কখন ঠগী হইতাম। নিশ্চয় কখনই হইতাম না। অদৃষ্টের গতি কে রোধ করিতে পারে? ইহার লিখন কে পরিবর্ত্তন করিতে পারে?

প্রায় একমাস গত হইয়া গেলে, ইস্মাইল হোসেনের সহিত ফিরিয়া আসিল। আমার পিতা (ইস্মাইল) আমার চেহারা খারাপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মোল্লাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাঁহাকেও তাহাই বলিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু আমার কি হইয়াছে? আমার কৌতূহল-বৃত্তি একেবারেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমার রাত্রে ঘুম হইত না, আমার চেহারা বিষণ্ণ হইয়াছিল, এবং কতদিন ভাবিয়াও কোন অন্ত পাইতাম না। এক সময়ে আমি আমার পিতাকে ছাড়িয়া যাইব বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলাম। এমন কি আমার দুইখানি কাপড়, কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ ও পুঁটলী করিয়া বাঁধিয়াছিলাম—কিন্তু যখন আমার আশ্রয় হীনতার কথা মনে পড়িল, আমি আর যাইতে পারিলাম না। বাড়ীতেই থাকিলাম। আমি এই রহস্যের প্রকাশার্থ সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, এবং আমার পিতা ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর পূর্ব্ব হইতে আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখিলাম। আমি অনেক সময় মনে মনে করিতাম যে, হৃদয়ের কথা তাঁহাকে বলি, কিন্তু যখন সুবিধা ঘটিয়া উঠিত, তখন বলিয়া উঠিতে পারিতাম না।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } আশ্বিন, ১৩০১ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্ব।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মার মুখ হইতে এই জাতির সৃষ্টি,—সমাজে ইঁহার কার্য্যও গুরু-দায়িত্ব পূর্ণ। মানবগণের প্রাণের প্রাণ—আত্মার উন্নতি করা, সদুপদেশে সৎপথ প্রদর্শন করা, এবং দেবকার্য্যাদি-দ্বারা জগতের হিত-সাধনই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য; মনু বলেন;——

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণ নাম কল্পয়েৎ॥"

ভোগবিলাসে তিনি বিরত, নিয়ত পারমার্থিক চিন্তায় ও ভগবৎ-প্রেমে বিভোর। এই জন্যই তিনি মান্য-গণ্য, এবং সমাজের শীর্ষ-স্থানাধিকারী; এই জন্যই অপর বর্ণের চক্ষে তিনি দেবতা, এবং পূজ্য ও প্রণম্য। তাঁহার দিব্য-জ্যোতিতে, তপঃপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত; মহারাজাধিরাজও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। এই জন্যই "বর্ণানাম্ ব্রাহ্মণো গুরু" এই বাক্যের সৃষ্টি।

এইরূপ পদমর্য্যাদায় ভূষিত হইয়া, এই জাতি সমাজের নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয় তাঁহার রক্ষক, বৈশ্য তাঁহার ব্যবহার্য্য বস্তুর সরবরাহে নিযুক্ত, শূদ্র তাঁহার ভৃত্য—দাসানুদাস।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণজাতি এই প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু কালে তাঁহার কর্ত্তৃত্বে আঘাত লাগিল, কালে তাঁহার একাধিপত্য সমাজের অসহ্য হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্ব কমিতে আরম্ভ হয়, পরে বৌদ্ধেরা একবারে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া, শাস্ত্রালোচনায় সমানাধিকার প্রবর্ত্তিত করেন। কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের কৃপায় আবার হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় নহে। যাহা একবার গুরুতর আঘাতে জর্জ্জরিত হয়, শত সংস্কার করিলেও আর তাহা ঠিক্ পূর্ব্ববৎ হয় না। যাহাই হউক, তখনও হিন্দুসমাজে এই জাতির কর্ত্তৃত্ব ছিল, রাজার ক্ষমতা অসীম হইলেও সমাজের কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই হস্তগত ছিল। কিন্তু ক্ষমতা-স্থাপন যত কঠিন, ক্ষমতা রক্ষা করা তদপেক্ষা অধিক। প্রভুত্বের অপব্যবহারে কখনই প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না। আবার এই জাতির ক্ষমতার অপব্যবহার আরম্ভ হইল, আবার ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্ব সমাজের অসহ্য হইতে লাগিল, আবার তাঁহার ক্ষমতায় আঘাত পড়িল। এই সময়ে চৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া, সাম্যবাদ প্রচার করিলেন; জাতিভেদ শিথিল হইয়া গেল! সুতরাং এই সময়েই সমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্ব আবার হ্রাস হইতে লাগিল।

এইরূপে ব্যবহার দোষে পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্ব ক্রমশঃই খর্ব্ব হইতে লাগিল। জাতিভেদ-প্রথা ক্রমশঃ শিথিলতর হওয়ায়, ব্যবসা বা বৃত্তিভেদেও ক্রমে গোলযোগ হইয়া পড়িল। জাতি বিশেষের নির্দ্দিষ্ট-জীবিকাবৃত্তি ক্রমে অপর জাতি অবলম্বন করিতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মণও স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, নিষিদ্ধ-বৃত্তি অবলম্বন করিতে লাগিলেন, এবং নিষিদ্ধ ও নিকৃষ্টবৃত্তির সংঘর্ষণে আচারভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। যে সকল বৃত্তি, মন্বাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত ছিল, সেই সকল বৃত্তি-অবলম্বনে ব্রাহ্মণগণ পতিত হইলেন; সুতরাং সমাজে তাঁহাদের মান্য ও ভক্তির হ্রাস হইল। লোকে, মানুষকে ভক্তি করে না—

মানুষের কার্য্যকেই ভক্তি করে, কার্য্য লইয়াই বিচার, সেই কার্য্য-ভার বা কার্য্যের দায়ীত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে, কিসে লোকের ভক্তির উদ্রেক হইবে?

প্রাগুপ্ত কারণেই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্ব খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। সেই ব্রাহ্মণজাতিই আছে, কিন্তু আচারভ্রষ্ট হওয়ায়, বৃত্তির যথেচ্ছাচারে—'বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া'হইয়া গিয়াছেন। যে জাতির প্রতাপে এক সময়ে সমস্ত হিন্দুসমাজ কম্পিত হইত, যাঁহার স্বর্গীয় লাবণ্য ও তেজে মহারাজও নতশীর হইতেন, যিনি পারমার্থিক পথের পথ-প্রদর্শক ছিলেন, আজ তাঁহার দুর্দ্দশা,—আজ তাঁহার অধঃপতন সকলেই স্বচক্ষে অবলোকন করিতেছেন! চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুরু, সমাজের নেতা সেই ব্রাহ্মণজাতিই কদাচারে অগ্রসর। তিনিই যেরূপ আচারভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়াছেন, অন্য কোনজাতি তত হন নাই। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের আচার, ব্যবহার, নিষ্ঠা ও জীবিকাবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিলে, মস্তক ঘূর্ণিত হইতে থাকে, এবং "কলির ব্রাহ্মণ" যে কি পদার্থ—তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয়, তবে আর মঙ্গল কোথায়? তা'ই আজ হিন্দুসমাজ অধঃপাতে যাইতেছে, তা'ই আজ সমাজে যথেচ্ছাচার বৃদ্ধি পাইতেছে, তা'ই আজ নিকৃষ্টজাতিও ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া সমাজে মত চালাইতে সাহসী হইতেছেন, তা'ই আজ বেদাদি শাস্ত্র, ম্লেচ্ছ বা ইতরজাতির পাঠ্য হইয়া দূষিত হইয়া পড়িতেছে।

কোন সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, সমাজ-পতি থাকা প্রয়োজনীয়। সকল কার্য্যেই মস্তক বা কর্ত্তা থাকা চাই; কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ এখন মস্তকশূন্য,—এখন সকলেই কর্ত্তা। সামান্যজাতি হইতে অর্থলোলুপ "কলির ব্রাহ্মণ" পর্য্যন্ত সকলেই সমাজের নেতা হইতে ইচ্ছুক। কলিতে যাহা হইবে বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাহাই হইতেছে; এ ব্যাপার কালধর্ম্ম,—যুগধর্ম্ম বই আর কি?

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

যোধবাই।

[ঐতিহাসিক গল্প]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চিতোর নগরে যুদ্ধের উদ্যোগের বিশেষ ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে; প্রসিদ্ধ ভারত-বিজয়ী মোগলসম্রাট আক্‌বর, চিতোরনগর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শ্রবণ করিয়া, চিতোরের সমুদয় রাজপুত সৈন্যগণ উৎসাহের সহিত অস্ত্র শস্ত্রাদি সংগ্রহ ও অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিতেছে। কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সকলের বদনেই প্রফুল্লতা বিরাজিত। মাতৃভূমির জন্য স্বদেহ বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত সকলেই উৎসুক!

তরুণবয়স্ক যুবকগণ স্নেহময়ী মাতার বা প্রেমময়ী প্রিয়তমার কথা বিস্মৃত হইয়া, নগর রক্ষণোপায় নির্দ্ধারণ করিতেছে, এবং যে দিক হইতে শত্রুগণের আগমনের আশঙ্কা অধিক, সেইদিকে উপযুক্ত সৈন্যসংখ্যা দণ্ডায়মান করিয়া রাখিবার নিমিত্ত পরামর্শ দান করিতেছে। বালকগণ বাল্য-ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া, আপনাদিগের মধ্যে অসি চালনা করিয়া স্ব স্ব নিপুণতা প্রকাশ করিতেছে। রাজপুত যুবতীগণ স্বামীর স্নেহ-মমতা বিস্মৃত হইয়া, মাতৃভূমির মঙ্গল-চিন্তায় দেবালয়ে গমন করিয়া দেবার্চ্চনায় নিযুক্ত হইয়াছে।

সকলেই যেন কি এক নবউদ্যমে উদ্দীপিত হইয়া, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া, স্বদেশের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু এ উৎসাহে একজনমাত্র নীরব! চতুর্দ্দিকের এই প্রফুল্লতার মধ্যে একজনের বদন বিষাদে মলিন ও ভীতিভাবে বিবর্ণ! সে আর কেহ নহে, চিতোরের পাপিষ্ঠ রাণা উদয়সিংহ! আক্‌বরের সহিত তাহার সন্ধি করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাজপুত

সৈন্যগণের দ্বারা প্রতিহত হইবার ভয়ে সে সে ইচ্ছাপ্রকাশ করিতে সাহস করে নাই; আক্‌বরের ভীষণ প্রতাপত্ব তাহার অবিদিত ছিল না।

এই প্রফুল্লতা, উৎসাহ ও নবীনতার মধ্যে উদয়সিংহ বিরস-বদনে কোথায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। যদি সে প্রকৃত রাজপুতই হয়, তবে এই সজীবতা ও উদ্দীপনার দিবস সে মদিরাসক্ত হইয়া কোনস্থানে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে পতিত রহিয়াছে? যোধবাইয়ের বাটীতে।

যোধবাই কে? যোধবাই অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী; রাজপুতানায় অমন অনেক অসূর্য্যম্পশ্যা নিরুপমসুন্দরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যোধবাইয়ের সৌন্দর্য্যের নিকট তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের তুলনাই হয় না। তৎকালে রূপের উপমাদান করিতে হইলে, লোকে যোধ-বাইয়ের নাম করিত।

কিন্তু হায়! যোধবাইয়ের এই অপরূপ সৌন্দর্য্য নিষ্কলঙ্ক ছিল না।

যোধবাইয়ের এত সৌন্দর্য্য, এত সম্পত্তি থাকিলেও তাহার চরিত্র সুবিমল ছিল না; যোধবাই পূর্ব্বে বারবিলাসিনী ছিল; এক্ষণে সে হীনচেতা উদয়সিংহের উপপত্নী!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ দিবা দ্বিপ্রহরে রাজপুত ও মুসলমান সৈন্যগণের মধ্যে ভীষণ-যুদ্ধ হইবে। প্রাতঃকালে গুপ্তচরগণ আসিয়া সংবাদদান করিয়াছে, যে আক্‌বরের সৈন্য শনৈঃ শনৈঃ চিতোরের অভিমুখে আগমন করিতেছে; অনুমান বেলা দ্বিপ্রহরের সময় চিতোরের সম্মুখভাগে আসিয়া উপনীত হইবে।

রাজপুত-সৈন্যগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, রণ-সাজে সজ্জিত হইতে লাগিল। বালকগণ পতাকাধারণ করিয়া, রাজপথের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল; দামামা ও দুন্দুভির ভীষণরোলে চিতোর-নগর শব্দিত হইতে লাগিল; রমণীগণ গাম্ভীর্য্য ও প্রফুল্লতার সহিত স্ব স্ব স্বামী বা আত্মীয়জনকে বর্ম্মাদি পরিচ্ছদ সাদরে পরাইয়া দিতে লাগিল; অল্পবয়স্কা বালিকাগণ কলকণ্ঠে মঙ্গলগীতি গাহিতে লাগিল।

রাজ্যেরমধ্যে এই উৎসব দর্শন করিয়া, কোনও অনভিজ্ঞ অভ্যাগত হয় ত মনে করিতে পারিত যে, রাজ্যে কোনও সুঘটনা সংঘটিত হওয়ায় বোধ হয় এত আনন্দ, এত উৎসাহ!

কিন্তু হায়! আজ চিতোরের অদৃষ্টে যে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহার কথা স্মরণ করিলে হৃদয়স্পন্দিত হয়! আজ উভয়ের মধ্যে যে ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, এবং সেই ভীষণ দাবানলে পতিত হইয়া, কত শতবীর অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া কত অভাগিনীকে স্বামীহীনা, কাহাকেও বা পুত্রহীনা বা কাহাকেও ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনহীনা করিয়া চলিয়া যাইবে; তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? কিন্তু সামান্য প্রাণত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া, রাজপুতের বীরহৃদয় কম্পিত হয় না। স্ত্রী স্বামীহীনা হইবে, বা ভগ্নী ভ্রাতৃহীনা হইবে, বা মাতা পুত্রহীনা হইবে—এই রমণী জনোচিতচিন্তায় রাজপুতের হৃদয় ক্লিষ্ট হয় না; "স্বর্গাদপী গরীয়সী" জন্মভূমির নিকট, অন্যান্য সাংসারিক স্নেহ-বন্ধন রাজপুতের বক্ষে আসিয়া পড়ে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিপ্রহর; দূরে রণদুন্দুভি শ্রুত হইল; সকলেই বুঝিতে পারিল, মুসলমানসৈন্য আগমন করিতেছে। রাজপুতগণ স্বীয় রণবাদ্য করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল।

অল্পকালের মধ্যেই বীরগণ সুসজ্জিত হইল, প্রথমেই অশ্বারোহী সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া কশাঘাত পূর্ব্বক তীব্রবেগে নগরের উত্তর-দিকস্থ সুবিস্তৃত প্রান্তরে গমন করিয়া ব্যূহরচনা করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। তাহাদিগের পশ্চাতে পদাতিক সৈন্যগণ গমন করিয়া, ব্যূহ-দৃঢ়তর করিয়া সুজ্জিত হইয়া রহিল।

কিন্তু এক্ষণে রাণা কোথায়?

সকলেই রাণার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইল। সমুদয় সৈন্য পরিচালক স্বয়ং রাণা উদয়সিংহের অনুপস্থিতিতে কি প্রকারে যুদ্ধ হইতে পারে? সুতরাং তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোককে রাণার সন্ধানে

প্রেরণ করা হইল। বহু অনুসন্ধানের পর, রাণাকে রাজ-প্রাসাদে পাওয়া গেল না; সকলেই বুঝিতে পারিল রাণা কোথায়? কয়েকজন সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ যোধবাইয়ের বাটীতে গমন করিল। সকলেই জানিত রাণা অবসর পাইলেই, এইখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন।

সর্দ্দারগণ তথায় গমন করিয়া দেখিল যে, রাণা মদিরাসেবনে অর্দ্ধ-অচৈতন্য! বহু চেষ্টা করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া, সর্দ্দারগণ তাঁহাকে যুদ্ধে গমন করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমে তিনি তাহাদিগের কথা আদৌ বুঝিতে পারিলেন না; অবশেষে বহু চেষ্টার পর বুঝিতে পারিয়া তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সর্দ্দারগণের প্ররোচনায় নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে বর্ম্মও অস্ত্রাদি প্রদান করা হইল। তিনি টলিতে টলিতে অতিকষ্টে সেই-গুলি পরিধান করিলেন।

কম্পিতচরণে উত্থিত হওতঃ তিনি চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "যোধবাই!—যোধ কোথায়?"

সর্দ্দারগণের মধ্যে সুরজমলসিংহ নামক জনৈক উদ্ধত প্রকৃতি যুবক, রাণার উক্ত আচরণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, খড়্গে হস্তার্পণ করিয়া ভীমনিনাদে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"রাণা! অন্য সময় হইলে হয় ত, সুরজমলকে বিশেষ শাস্তি পাইতে হইত; কিন্তু আজ উদয়সিংহ—সে উদয়সিংহ নহে, আজ সে কুক্কুর অপেক্ষাও, আজ তাহার ব্যবহার কাপুরুষের অপেক্ষাও—শতগুণে নীচ। আজ তাহার কার্য্য, সমস্ত রাজপুত জাতির পক্ষে কলঙ্ক!

সুরজমলের চীৎকারে রাণা চমকিত হইয়া উঠিলেন, অবশেষে স্বীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"হাঁ চল চল"।

রাণা টলিতে টলিতে বাহিরে আসিলেন, সুরজমল সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিল। সে দেখিয়াছিল, পার্শ্বের গৃহের জানালা হইতে পাপীয়সী যোধবাই, তাহাদিগের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ দেখিতেছে। সে ক্রুদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ অসি উন্মুক্ত করিয়া সেই গবাক্ষের অভিমুখে তাহা

আন্দোলিত করতঃ অর্দ্ধোচ্চারিতস্বরে বলিয়া গেল,—"পাপিষ্ঠা শীঘ্রই তোকে ইহসংসার হইতে দূরীভূত করিব ?"

ভয়ে যোধবাই তথা হইতে সরিয়া গেল; সুরজমলের অসি-আস্ফালনও ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা যোধবাই ভিন্ন কেহ দেখিতে বা শুনিতে পায় নাই।

যোধবাইয়ের উপর সুরজমলের ক্রোধের দুইটী কারণ ছিল। প্রথমতঃ সুরজমল তাহার নিকট একদিবস প্রেম-ভিক্ষা করে, কিন্তু গর্ব্বিতা যোধবাই তাহাকে অপমান করিয়া বাটী হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ সুরজমলের ধ্রুববিশ্বাস ছিল যে, যোধবাই রাণার এই শোচনীয় অবস্থার প্রধান কারণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই প্রান্তরে উভয় সৈন্যদলের মধ্যে ভীষণযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে রাজপুত-সৈন্যগণ ভীষণশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল—অনেক মুসলমানসৈন্য বিনষ্ট হইল বটে, কিন্তু আকবরের বিশাল চমু শ্রেণীর নিকট রাজপুত-সৈন্যগণের সংখ্যা অতি সামান্যমাত্র। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহারা মুসলমানগণকে পরাভূত করিতে পারিল না।

উদয়সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণভাব দর্শনে ভীত হইয়া একপার্শ্বে স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন কি সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিবারও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। তিনি একবার যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকাময়ী ভীষণমূর্ত্তি ও পরক্ষণেই যোধবাইয়ের ইন্দীবর সদৃশ মুখখানি স্মরণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইতেছিলেন। তিনি যদি আজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে প্রিয়তমা যোধবাইয়ের অবস্থা কি হইবে—ইহাই চিন্তা করিয়া আকুল হইতেছিলেন। এক একবার ভাবিতেছিলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া যোধবাইকে দর্শন করিয়া আসি'; কিন্তু চতুর্দ্দিকে রাজপুত সর্দ্দারগণকে দেখিয়া সে অভিলাষ পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইতেছিলেন না।

স্বয়ং রাণাকে এই প্রকার ভগ্নোৎসাহের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান

হইয়া থাকিতে দেখিয়া, অধিকাংশ রাজপুত-সৈন্যগণ উৎসাহ-হীন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

রাণার তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই, তিনি একমনে যোধবাইয়ের রূপরাশি ধ্যান করিতেছিলেন। রাণাকে একাকী দর্শন করিয়া মুসলমান-সেনাধ্যক্ষ তাহাকে ধৃত করিল।

রাণা উদয়সিংহ, আকবরের হস্তে বন্দী হইলেন। রাজপুত-সৈন্যগণের মধ্যে হাহাকারধ্বনি হইল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে যথাসময়ে যোধবাইয়ের নিকট, সংগ্রামের পরিণাম সংবাদ গিয়া পৌঁছাইল। যোধবাই অসতী হইলেও সে উদয়সিংহকে আন্তরিক ভালবাসিত। সামান্যা রমণীর ন্যায় তাহার হৃদয় মরুভূমির ন্যায় স্নেহমমতা শূন্য ছিল না; সে পতিতা হইলেও, এই বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াইত যে, সে আজও রাজপুতরমণী। এই গৌরববলেই সে আজ এক মহাকার্য্য সাধনে রত্নবতী হইল।

উদয়সিংহ বন্দী হইয়াছেন, এবং রাজপুত-সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে,—এই সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া যোধবাই ভাবিল, 'যদি রাণা বন্দী হইয়া থাকেন, এবং রাজ্যরক্ষক সৈন্যগণই যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিজয়ী মুসলমানগণ অবিলম্বে স্বাধীন চিতোরনগরকে অধীনতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিবে।' বীরহৃদয়া রাজপুতরমণীর ন্যায় সে একটী দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার কল্পনা করিল। প্রাণপণ শক্তিতে স্বীয় জন্মভূমির উদ্ধারসাধনে যত্ন করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিল।

যোধবাই বহুকাল যে কার্য্য করে নাই, আজ সেই কার্য্য করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। সে এ পর্য্যন্ত দেবমন্দিরে পূজা করা দূরে থাকুক, কখনও দেবমন্দিরে প্রবেশ পর্য্যন্তও করে নাই। আজ একবার শেষবারের নিমিত্ত দেবীকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত—পূজা করিবার নিমিত্ত—জাহ্নবীদেবীর মন্দিরের অভিমুখে চলিল।

যোধবাইয়ের বাটী হইতে জাহ্নবীদেবীর মন্দির বহুদূর নহে। যোধবাই সেই অপরাহ্নকালে নির্জ্জন রাজপথ দিয়া একাকিনী গমন করিতেছে; ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই একজন আহত সৈন্য, প্রাণভয়ে কষ্টের সহিত পলায়ন করিতে দেখা যাইতেছে। কোনও কোনও অট্টালিকার মধ্য হইতে রমণী কণ্ঠনিঃসৃত সকাতর ক্রন্দনধ্বনি কর্ণে আসিয়া লাগিতেছে। কোথাও কোনও বিস্তৃত অট্টালিকাপ্রাঙ্গনে অর্দ্ধপ্রজ্জলিত চিতা—সতী রাজপুত-রমণীগণ স্বামীর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জ্বলন্তচিতায় আরোহণ করিয়া, জহরব্রত উদ্যাপন করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহাদিগের অর্দ্ধ দগ্ধদেহ তাহাদিগের অলৌকিক ও পবিত্রকার্য্যের নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান! কোথা হইতে রাজপুত-ললনার করুণ-সঙ্গীতধ্বনি নিনাদিত হইতেছে—তাহা জহরব্রত উদ্যাপনের শেষ কণ্ঠস্বর! পাপিষ্ঠা যোধবাই, সতীত্বের এই মহাগৌরব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। সে ভাবিল, 'আজ যদি আমি সতী থাকিতাম, আমার যদি স্বামী থাকিত, তাহা হইলে আমিও হাসিতে হাসিতে জ্বলন্তচিতায় ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতাম। কিন্তু আজ উঁহাদিগের ও আমার মধ্যে কত প্রভেদ, কত ব্যবধান!'

ভাবিতে ভাবিতে যোধবাই মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইল। মন্দিরে কেবল একজন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছেনমাত্র, অপরে সকলেই যুদ্ধে গমন করিয়াছে। যোধবাই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অনেকক্ষণ কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা করিল।

যখন বাহিরে আসিল, তখন আর সে যোধবাই নাই। যাহার চক্ষের কটাক্ষমাত্রে কত রাজপুতবীরের হৃদয় টলিয়াছে, আজ তাহার চক্ষু একবারে স্থির ও গম্ভীর কেন? সে হাবভাব কটাক্ষের পরিবর্ত্তে এই পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যের দৃশ্য কেন? যে যোধবাইকে দেখিবার জন্য শত শত লোক উদ্‌গ্রীব থাকিত, তাহাকেই আজ উন্মাদিনীর ন্যায় রাজপথ দিয়া, দ্রুতবেগে দৌড়াইতে দেখিয়াও লোকে কেন আশ্চর্য্যনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে?

যোধবাই দ্রুতবেগে বাটীতে আসিয়া তাড়াতাড়ি দাসীকে বলিল, "বর্ম্ম ও তরবারী লইয়া আয়।" দাসী প্রথমতঃ কর্ত্রীঠাকুরাণীর স্বরের গাম্ভীর্য্য ও এ প্রকার অকস্মাৎ আজ্ঞাশ্রবণে কিছু বুঝিতে পারিল না। মনে করিল, যোধবাই বুঝি অন্য কোনও পরিচ্ছদ চাহিতেছেন এই মনে করিয়া সে তাহার পেশোয়াজ ও জরির জুতা আনিয়া দিল। যোধবাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"শীঘ্র বর্ম্ম ও ঢাল লইয়া আয়, এবং ঘোড়া তৈয়ারি করিতে বল্"। দাসী ভীত হইয়া অবিলম্বে রাণার চর্ম্ম ও তরবারী লইয়া আসিল।

যোধবাই অবিলম্বে বর্ম্ম পরিধান করিয়া সজ্জিতা হইল। কেশ আলুলায়িত করিয়া দিল; একহস্তে ঢাল ও অপর হস্তে বঁড়শা গ্রহণ করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তীব্রকষাঘাতে রণভূমির অভিমুখে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

মাতৃসদৃশা জন্মভূমির নিমিত্ত স্বীয় প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত অদ্য যোধবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যে সমস্ত সৈন্য ভগ্নোৎসাহ হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহারা অকস্মাৎ এক রমণীকে তীব্রবেগে রণক্ষেত্রে আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যোধবাই তাহা-দিগের নিকট আগমন করিয়া, তাহাদিগকে পুনরায় যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতে লাগিল। বীরহৃদয় রাজপুত-সৈন্যগণ আজ পাপিষ্ঠা ও সতীর বিভিন্নতা বিস্মৃত হইয়া, মাতৃভূমির নিমিত্ত যোধ-বাইয়ের তত্বাবধানে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় অবতীর্ণ হইল।

সহসা অশ্বারূঢ়া আলুলায়িত-কুন্তলা বর্ম্ম পরিহিতা এক রমণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শন করিয়া, মুসলমান সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। "জেনানা" কখনও অস্ত্রধারণ করিতে পারে, মুসলমানগণ একথা কখনও বিশ্বাস করিতে পারে না।

যখন তাহারা নিস্তব্ধভাবে বিস্মিতনেত্রে দণ্ডায়মান, তখন যোধবাই

সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া, একেবারে ভীমবেগে মুসলমানগণকে আক্রমণ করিল। রাজপুত-সৈন্যগণ স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য আজ বিস্মৃত হইল যে, তাহাদিগের অধিনায়ক এক রমণী; কেবল তাহাই নহে, সে একজন বারবিলাসিনী!

অকস্মাৎ এই প্রকার আক্রান্ত হওয়াতে, এবং জনৈক রমণীর অলৌকিক যুদ্ধ-ক্ষমতা দেখিয়া মুসলমান সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। এবং মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ বিপদ দেখিয়া সৈন্যগণকে ফিরাইতে বাধ্য হইলেন।

রণপণ্ডিত আক্‌বরসাহ সেইদিবস এক রমণীর নিকট পরাজিত হইলেন!

এক রাজপুত-ললনার দ্বারা সেইদিবস চিতোর রক্ষা হইল! কিন্তু যোধবাইয়ের এই রণ-কুশলতায় একজনের হৃদয় ক্ষোভে ভস্মপ্রায় হইবার উপক্রম হইল, সে আর কেহ নহে—সুরজমল।

অনেকদিবস পরে কোনও সুযোগক্রমে উদয়সিংহ যবন কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। যখন শুনিলেন, যে যোধবাই চিতোর রক্ষা করিয়াছে, তখন আনন্দে তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি তিনি যোধবাইয়ের সহিত দেখা করিতে গেলেন। কিন্তু গিয়া দেখিলেন দ্বাররুদ্ধ! দ্বার খুলিবার নিমিত্ত অনেক সাধনা করিলেন, কিন্তু দ্বার উন্মুক্ত হইল না। একজন দাসী আসিয়া দ্বারের ভিতর হইতে বলিল,—"যোধবাইয়ের সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না"। রাণা লজ্জায় ও ক্রোধে আরক্তিমবদন হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এখন যোধবাইকে দেখিলে, আর চেনা যায় না—তাহার বহুমূল্য পেশোয়াজের পরিবর্ত্তে গৈরিকবসন, এবং অলঙ্কারের স্থলে বিভূতি বর্ত্তমান। স্বদেশের মহাকার্য্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়া, এক নবভাবে তাহার হৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকৃত পাপের নিমিত্ত ভীষণ অনুতাপানলে তাহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে।

ভূমিশয্যায় শয়ন ও দিবারাত্র অশ্রুবর্ষণেই তাহার সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু সুরজমলের সেই প্রতিহিংসা-বৃত্তি আজও নিবৃত্ত হয় নাই। বারবিলাসিনীর দ্বারা চিতোর রক্ষা হইয়াছে, একথা স্মরণ করিতে অনেক রাজপুত সর্দ্দারের হৃদয়ে ক্রোধোদ্রেক হইত।

সুরজমল এই সর্দ্দার দলের নেতা হইল। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, যোধবাইকে ইহসংসার হইতে অপসৃত করিতে হইবে, তাহা না করিলে, রাজ্যের মঙ্গল কখনও হইবে না।

সুরজমল নিজে সে দায়ীত্ব-গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল!

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর; যোধবাই অনেকক্ষণ অবধি অতীত জীবনের দুঃখ-স্মৃতিগুলি স্মরণ করিতে করিতে ক্রন্দন করিল। মা জাহ্নবীকে বার বার কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিল; স্বদেশ-রক্ষার নিমিত্ত সে যে চেষ্টা করিয়াছে—সেকথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; কিন্তু আবার সেই অনুতাপ! বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাহার সমস্ত শরীর কি এক ভয়ানক জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল; পাপের ভয়াবহ পরিণাম ভাবিয়া তাহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—ভয়ে সে মাটীতে পড়িয়া গেল, পড়িয়া গিয়াই চৈতন্য হারাইল। যোধবাইয়ের পক্ষে এ প্রকার ঘটনা কিছু নূতন নহে, প্রত্যহই তাহাকে এই প্রকার জীবন-যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়!

সে, সেই অচৈতন্যাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল,—যেন সে কোন এক অজানা সুরপুরে গমন করিয়াছে—সেখানে কত শান্তি, কত পবিত্রতা! একদিকে সশস্ত্র বীরগণ গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান, অপরদিকে সুন্দরী ললনাগণ সহাস্যমুখে যেন তাহাকে প্রিয়সম্ভাষণ করিতেছে। মধ্যস্থলে এক জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি! তিনি যেন যোধবাইকে সাদরে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি স্বদেশরক্ষা করিয়াছ, অতএব তোমার সমুদয় পাপ বিধৌত হইয়া গেল—এস আমার পার্শ্বে ব'স"। যোধবাইয়ের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইল—সে জীবনে এ প্রকার সুখভোগ করে নাই।

কিন্তু এ গভীর রাত্রে জানালা বহিয়া ও কে উঠিতেছে? আর কেহ নহে, সুরজমল!

সুরজমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিস্তব্ধে যোধবাইয়ের নিকট দাঁড়াইল। তাহার সহাস্যবদন ও অনুপম রূপরাশি দর্শনে বিভোর হইয়া—সে ভস্মাচ্ছাদিত রূপদর্শন করিতে করিতে ভাবিল, 'ফিরিয়া যাই'। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই দন্ত নিষ্পীড়িত করিয়া বলিল—"না, এ পাপীয়সী জীবিত থাকিতে আমি শান্তি পাইব না"। এই কথা বলিয়াই অকস্মাৎ সুতীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া যোধবাইয়ের বক্ষে আমূলবিদ্ধ করিয়া দিল!

যোধবাই আদৌ শব্দ করিল না—তাহার উষ্ণ শোনিত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল! যোধবাই তখন সেই শেষ পথ দেখিতেছিল!

যে চরিত্রহীনা হইলেও একদিন সাহসিকতার সহিত জন্মভূমি রক্ষা করিয়াছিল, বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতায় আজ তাহার এই পরিণাম! যে রাজপুত রমণী একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব-প্রকাশ করিয়া বিজয়ী মুসলমানগণের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল,—সেই বীরহৃদয়া রাজপুত-রমণীর জীবন-নাট্যে এই প্রকারে শেষ যবনিকা পতিত হইল!

যোধবাইয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল; অদ্য সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইল।

* * * * * *

সেই রাত্র হইতে সুরজমলকে আর কেহও দেখিতে পায় নাই। তাহার নিমিত্ত বহু অনুসন্ধান করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোথাও তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

জাগ মা!

(১)

জাগ মা! তাপিতা ভারতজননী,
অধর্ম্ম, পাপেতে, প্লাবিতা ধরণী;
ঘোর ঘনঘটা—নাদিছে অশনি
আর ঘুমায়ো না সংজ্ঞাহীন হ'য়ে;
ইংলণ্ড, ফরাসী, তুরস্ক, জর্ম্মাণ,
নব আমরিক, অস্ত্রিয়, রোমাণ,
উঠিয়া উন্নত উন্নতি-সোপান,
চলিয়াছে সব প্রফুল্ল হৃদয়ে।

(২)

কি কাল রাহুতে গ্রাসিল ভারত,
লাঞ্ছণেয় তা'ই হ'য়ে বুদ্ধি হত,
ছাড়ি' সিংহাসন নির্ব্বোধের মত,
পলাইল দূরে—জীবনের ভয়ে;
ম্লেচ্ছের করেতে ধর্ম্ম সনাতন,
হিন্দু ধর্ম্মসার, পুরাণ, দর্শন,
কত মুনিঋষি—কল্পনার ধন,
একে একে গেল বিলুপ্ত হইয়ে।

(৩)

কবে যে ঘুচিবে যাতনা এ ঘোর,
ছিঁড়িয়া পড়িবে দুর্ব্বহ এ ডোর,
যাতনার নিশা হইবে রে ভোর,
সে আশায় সবে তাকা'য়ে আছে;
হ'বে না হ'বে না সেদিন উদয়,
একতা-বিহীন পরুষ হৃদয়,
ভারত-সন্তান চিরভীতিময়,
হীরক-মুকুট এদের কি সাজে?

(৪)

এরা চায় শুধু নারী—ভালবাসা,
প্রেমের পুতুলি—হৃদয়ের আশা,
কভু নাহি মেটে প্রেমের পিপাসা,
হীনবীর্য্য যত পাপী কুলাঙ্গার;
নিয়তি-লিখন কে খণ্ডিবে বল,
শ্বেত-দ্বীপবাসী ইংরাজ সকল,
সদর্পে করিল ভারত দখল;
(বীরের উচিত এই পুরস্কার)

(৫)

চারিদিকে হেথা ভারত জুড়িয়া,
পূর্ব্বস্মৃতি সবে গেছে রে ভুলিয়া;
পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান আলোক আসিয়া,
ভারত-গগনে উদিত হ'য়েছে;
জাগ মা! জাগ মা!—নয়ন মেলিয়ে,
দেখ একবার, ভারত বেড়িয়ে,
সমাজের গতি লণ্ড-ভণ্ড হ'য়ে,
হ্যাট কোটসহ মিশিয়া গিয়েছে।

(৬)

নাহি আর এবে পৌরাণিক গান,
নাহি সীতাসতী বিখ্যাত পুরাণ;
নাহি বেদব্যাস ধর্ম্মের নিধান,
এবে নবযুগ ভারতবরষে;
হ্যাট্ কোটধারী নব্যবাবু দল,
সমাজে ভাবিয়া—"ড্যাম-রাস্কল্",
গাউন পরা'য়ে "ওয়াইফ" সকল,
গার্ডেন পার্টিতে নাচান হরষে।

(৭)

কলেজের শিক্ষা এ যুগ চলন,
করিল বিকৃত বাঙ্গালী নন্দন!
মাতাপিতা ভুলে, পরের চরণ,
টিপিতে না করে লজ্জা অনুভব;
নূতন ধরম জাগিয়ে উঠেছে,
শ্মশ্রুধারী ভ্রাতা ক্রন্দনে মেতেছে,
এক ব্রহ্ম সার দেবদেবী গেছে,
(এবে)ভগিনীর রাজ্যে ভ্রাতারবিভব।

(৮)

মিশনী করিয়ে অন্দরে গমন,
দেয় ধর্ম্মশিক্ষা—আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান।
যীশু-প্রেমে মাতি কুলবালাগণ,
স্বধর্ম্মে বঞ্চিত বারিকে আশ্রয়;
জাগ মা! জাগ মা! ভারত-জননি!
লুণ্ঠিত হ'ল মা! ধর্ম্ম মহামণি,
কোলে লও তব স্নেহের বাছনি,
বিলম্বে তোমার ঘটিবে প্রলয়।

(৯)

কুলাঙ্গার যত জ্ঞানহারা হ'য়ে,
প্রবেশিয়া অই শৌণ্ডিক-আলয়ে,
হারা'য়ে বিবেক রক্তাক্ত হৃদয়ে,
পুলিসের করে এবে সমর্পিত;
কাণ্ড জ্ঞানহীন ধনিপুত্রদল,
ত্যজি' দারাসুত সংসার সম্বল,
গণিকা-আলয়ে প্রেমেতে বিহ্বল,
রঙ্গ-রসে মত্ত ইয়ার সহিত।

(১০)

মেল আঁখি তব, আর কতকাল,
সহিবে গো মাতঃ! এ দুঃখ ভয়াল?
ঘেরিয়াছে পাপ জলদের জাল,
আর ঘুমায়ো না সংজ্ঞাহীন হ'য়ে;
অই দেখ চেয়ে পুরনারীগণ,
ভুলে গৃহকর্ম্ম সন্তানপালন,
থিয়েটার-গৃহ করিয়া শোভন,
"ফ্যালাসী" দেখায় নির্ভীক হৃদয়ে।

(১১)

বাঙ্গালীর মেয়ে হ'য়ে বিলাসিনী,
গতর নাড়িতে হন কাতরিণী,
পাচক ব্রাহ্মণ—গৃহের গৃহিণী,
না আসে যেদিন,থাকে উপবাসী;
বিলাতীধরণ এরাও শিখেছে,
সীমন্তিনী-শোভা সিন্দুর মুছেছে।
পাউডার-বদনী, "লুকিং গেলাসে",
দেখিছে বদন কিবা হাসি হাসি।

(১২)

নয়ন মুদেছ সাতশ' বরষ,
এ দীর্ঘ ঘুমেও হলে না সন্তোষ?
ঐ দেখ চেয়ে সখী দিশি দশ,
ঘুচাতে এদিন বাড়াইছে কর;
একবার উঠ, কমকণ্ঠ-বোলে,
ডাক মা সন্তানে "বাছা বাছা" বলে,
মাতুক ভারত জাতীয়তা বলে,
বাজাতে বাজনা "ভারতভাস্বর"।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিশ্বনাথ বাবু।

মুসলমান শাসনের তিরোধান ও ইংরাজ শাসনের অভ্যুদয় এই সন্ধিস্থলে, বঙ্গদেশে কিছুকাল কিরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। এই সময়ে এদেশে দস্যুবৃত্তি এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, লোকের ধন-মান রাখা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান শাসনাধীনে, স্থানীয় ভূস্বামীদিগের হস্তে শান্তি রক্ষার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা সেই অক্ষুণ্ণ ক্ষমতাবলে শান্তিভঙ্গ-কারীদিগকে সর্ব্বদা দমনে রাখিতেন,—অপরাধীদিগের প্রতি এরূপ কঠোরদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন যে, তাহারা সহজে কোনরূপ দৌরাত্ম্য করিতে সাহস করিত না। ইংরাজ কোম্পানি দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া, ভূস্বামীদিগের এই ক্ষমতার বিলোপ-সাধন করেন, এবং নূতন পুলিসের সৃষ্টি করিয়া তাহার হস্তে দেশের শান্তিরক্ষার ভারার্পণ করেন। স্থানীয় লোকে ভূস্বামীদিগকে যেরূপ ভয় করিত, তাঁহাকে যেরূপ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া মানিত, নূতন পুলিসকে তাহারা সেরূপ চক্ষে দেখিত না। পুলিসও তখন আপনার ক্ষমতা বলদর্পে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যে চারিদিকে অরাজকতা বিরাজ করিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে! দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, দস্যুদল সংগঠিত হইতে লাগিল। আজ এখানে, কাল সেখানে, চুরি ডাকাইতি হইতে লাগিল। স্থলে রাহাজানী, জলে বোম্বেটেগিরী, রাত্রিতে গৃহস্থের গৃহে লুট তরাজী, বদমায়েস লোকের উপজীবিকায় পরিণত হইল। ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত এমন অনেক লোক, এই সকল দস্যুদিগের অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। ডুমুরদহের বাবুরা এই জন্যই এদেশে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন। "দিনে ডাকাইতি" কথাটা এই সময়ে প্রকৃত পক্ষে সার্থক হইয়াছিল। দস্যুদলের এতদূর সাহস বাড়িয়াছিল যে, অনেক সময়ে তাহারা তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধির কথা গ্রামবাসীদিগকে পত্রদ্বারা বিদিত করিত। যে দিন যে গৃহস্থের

বাড়ীতে পড়িবে, গৃহস্থকে পূর্ব্বে তাহার সংবাদ দিত, এবং তাহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বলিত। গৃহস্থেরা দস্যুদিগের সেই দাবী মিটাইতে না পারিলে, তাহাদিগের দুর্দ্দশার অবধি থাকিত না। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, কোন গৃহস্থের বাটীতে দস্যুরা অর্থলোভে বিফল-মনোরথ হইলে, গৃহস্বামীর প্রতি নৃশংসরূপ অত্যাচার করিত। কাহাকেও বা তপ্ত-তৈল-পূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিত, কাহারও অঙ্গে পাট জড়াইয়া, তাহা তৈল বা ঘৃত-সিক্ত করিয়া আগুণ জ্বালাইয়া দিত। এখনকার দিনে এ সকল কথা অনেকে অসত্য বলিয়া অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু এ সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এমন লোক এখনও দুই একজন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের মুখে সে সময়কার দস্যুদিগের কাহিনী শুনিলে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। নব্য পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা একজন প্রসিদ্ধ দস্যুর বিবরণ এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের পাঁচক্রোশ দূরে আশানগর নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে বিশেবাগ্‌দী নামে একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাইত ছিল। ডাকাইতি করিয়া এরূপ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল যে, ক্রমে সে বিশ্বনাথ বাবু নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনের শেষাবস্থায় বিশ্বনাথের আবির্ভাব হয়। তাহার দলে প্রায় পাঁচ শতজন ডাকাইত থাকিত। তন্মধ্যে নলদা, কৃষ্ণ সর্দ্দার ও সন্ন্যাসী প্রধান ছিল। নলদার এই এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, যে দুই এক ঘণ্টাকাল অক্লেশে জলে ডুবিয়া থাকিতে পারিত। এজন্য তাহাকে কেহ ধরিতে পারিত না। কৃষ্ণ সর্দ্দার ও সন্ন্যাসী লাঠী খেলায় অদ্বিতীয় ছিল। ইহারা দুইজনে লাঠী ধরিয়া দুইশত লোকের মোহাড়া লইতে পারিত। কৃষ্ণ সর্দ্দার এরূপ কৌশলে লাঠী ঘুরাইত, যে দশজন লোক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে, সে লাঠীর আঘাতে সমুদয় লোষ্ট্র প্রত্যাহত করিতে পারিত। এই অকুতোসাহস দস্যুদল লইয়া বিশ্বনাথ নদীয়া যশোহর, চব্বিশপরগণা, বর্দ্ধমান,

হুগলী প্রভৃতি জেলা তোল-পাড় করিয়া তুলিয়াছিল। বিশ্বনাথের দস্যুবৃত্তির দুই একটী কাহিনী এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিশে ডাকাত, ওরফে বিশ্বনাথ বাবুর একবার দুর্গোৎসব করিবার বড়ই বাসনা হয়, সুতরাং অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। কিরূপে এই অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, নলদা, কৃষ্ণসর্দ্দার ও সন্ন্যাসীকে লইয়া তাহার পরামর্শ হইল। পরামর্শে স্থির হইল, কাল্‌নায় বৈদ্যপুরের নন্দীদিগের যে গদী আছে, তাহাই লুণ্ঠন করা হইবে। যেমন পরামর্শ স্থির হইল, আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে বন্দুক ও তরবারী লইয়া অমনি চারিজনে নৌকাযোগে কাল্‌নাযাত্রা করিল। বিশ্বনাথ কাল্‌নায় উপস্থিত হইয়া প্রথমেই তথাকার দারোগাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। দারোগা বিশ্বনাথের ভয়ে কম্পমান—সুতরাং অবিলম্বে তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ দারোগাকে বলিল,—"তুমি আমাকে এই মর্ম্মে এক একরার লিখিয়া দেও, যে নন্দীদিগের এই গদীর লুণ্ঠন তরাজে তুমিও সংলিপ্ত আছ।" দারোগা নিরুপায় হইয়া বিশ্বনাথের হুকুম তামিল করিলেন। বিশ্বনাথ সহচরদিগকে সঙ্গে লইয়া, গদী লুঠিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিল। আশানগরে গিয়া সেই অর্থে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা সমাপন করিল।

অনেকের মুখে শুনা যায় যে, বিশ্বনাথ দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিল বটে; কিন্তু সে হৃদয়হীন ছিল না। লোকের কষ্ট দেখিলে, সে তাহা দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিত। ডাকাইতি করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা অনেক সময়ে গরীব দুঃখীকে দান করিত। দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের উপর সে কখনও অত্যাচার করিত না। তাহার এইরূপ প্রকৃতির প্রমাণস্বরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে,—একবার এক ব্রাহ্মণ কন্যাদায় গ্রস্ত হইয়া, কোন এক জমীদারের নিকট ভিক্ষা করিতে যান। জমীদার ব্রাহ্মণকে তাড়াইয়া দেন। ব্রাহ্মণ বিষণ্নমুখে গৃহে ফিরিতেছে; পথে দেখিল, একজন বাবু পাল্কী চড়িয়া আসিতেছে, ব্রাহ্মণ দাঁড়াইল। পাল্কীর ভিতর তাকাইয়া দেখিল, বিশ্বনাথ বাবু। ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথের প্রকৃতি জানিত, হস্তো-

ত্তলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। বিশ্বনাথ পাল্কী হইতে নামিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল, এবং তিনি কোথায় কি জন্য গিয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিল; ব্রাহ্মণ সমস্ত বলিলেন। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণকে বলিল, "আমার সহিত চলুন"। ব্রাহ্মণ সহজেই সম্মত হইল। উভয়ে গিয়া আবার সেই জমীদারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিবার জন্য জমীদারকে বহু অনুরোধ করিল, কিন্তু জমীদার তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন বিশ্বনাথ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং পাল্কী বাহকদিগকে লইয়া জমীদারের বাড়ী লুঠ করিতে উদ্যত হইল। জমীদার তখন বিশ্বনাথকে চিনিলেন, এবং তদ্দণ্ডে ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিয়া, বিশ্বনাথকে নিরস্ত করিলেন।

বিশ্বনাথ বীরত্বের আদর করিত, দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদি কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিত, সে তাহাকে সম্মান করিত। একবার নদীয়ায় কুড়ুলগাছি গ্রামে একজন ধনীর বাড়ীতে বিশ্বনাথ ডাকাতি করিবেন বলিয়া পত্র গেল। জমীদার ভয়ে আকুল ও যথাসর্ব্বস্ব বিশ্বনাথ লুঠিয়া লইয়া যাইবে ভাবিয়া, বড়ই কাতর হইলেন। তাঁহার এক বিশ্বস্ত গড়ো গোয়ালা ভৃত্য ছিল, সে লাঠী খেলিতে বেশ মজবুত ছিল, কিন্তু সে যে একা বিশ্বনাথের মোহাড়া লইতে পারিবে, ইহা অসম্ভব। তথাপি জমীদার, মনের আবেগে তাহাকে বিশ্বনাথের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। ভৃত্য বলিল—"ভয় নাই, আমার জীবন থাকিতে আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না।" সে এই বলিয়া একগাছি লাঠী লইয়া, বিশ্বনাথের আগমন দিনে গ্রামের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যথাসময়ে বিশ্বনাথ সদলে পাল্কী চড়িয়া গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হইল, পাল্কী আসিবা মাত্র গড়ো পথ আটকাইল। বিশ্বনাথ ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য পাল্কী হইতে নামিলে গড়ো করযোড়ে বলিল,——"গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, একবার আমার সহিত আপনাকে লাঠী খেলিতে হইবে।" বিশ্বনাথ স্বীকৃত হইয়া স্বীয় দলস্থ লোকদিগকে বলিল,—"তোমরা কেহ কিছু করিও না, আমি একা ইহার সহিত

লড়িব।" নিমেষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া লাঠী চালাইয়া বিশ্বনাথ গড়োর কিছু করিতে পারিল না, বেশীর ভাগ নিজে হঠিতে লাগিল। তখন বিশ্বনাথ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, পরিচয়ে প্রকাশ পাইল, বিশ্বনাথ যে ওস্তাদের কাছে লাঠী খেলিতে শিখিয়াছিল, গড়োও তাহারই চেলা। তখন বিশ্বনাথ তাঁহার সহিত কোলাকোলী করিল, এবং বলিল—"ভাই! তুমি বাঁচিয়া থাকিতে আর আমি কুড়ুলগাছি গ্রামে প্রবেশ করিব না।" এই বলিয়া বিশ্বনাথ প্রস্থান করিল।

নদীয়াতে ফ্যাডী (Faddey) সাহেবের এক নীলকুঠী ছিল। নীলের দাদনদিবার জন্য কলিকাতা হইতে ফ্যাডী সাহেবের টাকা যাইত। একবার বিশ্বনাথ সন্ধান পাইল যে, কলিকাতা হইতে সাহেবের নিকট অনেক টাকা আসিয়াছে। সেই রাত্রিতেই বিশ্বনাথ, সাহেবের কুঠীতে ডাকাইতি করিল। কুঠীর বাহিরে কৃষ্ণসর্দ্দার ও সন্ন্যাসী [illegible] করিতেছিল। বিশ্বনাথ একবার ঘাঁটীতে আসিয়া, কৃষ্ণসর্দ্দার প্রভৃতিকে উৎসাহ দিতে লাগিল, তারপর বিকট চীৎকার করিয়া একলম্ফে কুঠীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, লুণ্ঠনকারীদিগকে সাহস দিতে লাগিল। ফ্যাডী সাহেব ও তাহার বিবি এই ব্যাপার দেখিয়া এতদূর ভীত হইলেন যে, তাহাদিগের হাত-পা চলিল না। কুঠীতে শয্যার পার্শ্বে বন্দুক ছিল, সাহেব তাহা ছুঁড়িবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সাহেবের হাত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বন্দুক হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। বিবি ফ্যাডী ধীরে ধীরে পলাইবার চেষ্টা করিলেন, ডাকাইতেরা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিল না—কেন না, তাহারা সহজে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিত না। বিবি পলাইয়া কুঠীর প্রাঙ্গনে যে পুকুর ছিল, তাহাতে চিবুক অবধি জলে ডুবাইয়া "কেলে হাঁড়ি" মাথায় দিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ডাকাইতেরা তাঁহাকে খুঁজিল না, কিন্তু ফ্যাডী সাহেবকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল, এবং আপনাদিগের দলমধ্যে লইয়া গেল। দস্যুরা ফ্যাডী সাহেবের সমস্ত

করিল। বড়ই অসুবিধা দেখিয়া দস্যুদিগের অনেকে পলায়ন করিল, যাহারা পলাইতে পারিল না, সিপাহীরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। বিশ্বনাথ ও তাহার প্রধান অনুচরেরা কোথা দিয়া পলাইল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

সাহেবরা দেখিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সিদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারা বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে চেষ্টিত হইলেন। বিশ্বনাথ কোথায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার সন্ধান আনিবার জন্য গড়ো গোয়ালাদিগকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। একদিন তাহারা সমাচার আনিল যে, নিকটস্থ এক জঙ্গলে বিশ্বনাথ ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর আহারের জন্য রন্ধন করিতেছে। অমনি তাঁহারা সসৈন্যে তথায় যাত্রা করিলেন, এবং জঙ্গল ঘেরিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন; এই ঘটনায় বিশ্বনাথ আদৌ বিচলিত হইল না। বীরপুরুষের ন্যায় সাহেবদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "সাহেব মরিতে ভয় করি না, যাহা বিধিলিপি, তাহা অবশ্যই ঘটিবে।" তাহার পর ফ্যাডী সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিল, "সাহেব! আমিই তোমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, আজি তুমি তাহার প্রতিফল দিলে। ভগবানের নাম করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা প্রতিপালন করিলে ভাল।" অবিলম্বে বিশ্বনাথ ও সহচরদিগকে বিচারার্থে চালান দেওয়া হইল—বিচারে তাহাদিগের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল, এবং নদীতীরে এক মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য দস্যুগণের মনে ভীতির-সঞ্চার করিবার জন্য তাহাদিগের মৃতদেহ কিছুদিনের জন্য রাজ-পথের উপর এক বটবৃক্ষ ঝুলাইয়া রাখা হইল। এইরূপে বিশ্বনাথের জীবনলীলা শেষ হইল। বিশ্বনাথের ন্যায় বঙ্গদেশের অনেক দস্যুর জীবনের এইরূপ পরিণাম ঘটাইয়া ফ্যাডীর ন্যায় কত শত ইংরাজ আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

১ম খণ্ড। } কার্ত্তিক, ১৩০১ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

দুর্গোৎসব—বিজয়া।

বৎসরের মধ্যে তিনটীদিন নির্জ্জীব, নিরুৎসাহ বঙ্গবাসীর মুখে আবার সজীবতার লক্ষণ, কোনও অব্যক্ত সুখে আবার বঙ্গবাসীর সহাস্য-বদন, "সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা"—বঙ্গভূমি, এবে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতা, পদ-দলিতা হইলেও, দু'দিনের জন্য তাহার মুখে হাসি—দেখা দিয়াছিল, আনন্দরোলে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু এ আনন্দ কোথা হইতে আসিয়াছিল? আবার কোথায় মিশাইয়া গেল? মা! ব্রহ্মময়ি! তুই এই কাতর, পদ-দলিত, অন্ন-হীন বঙ্গবাসীর দুঃখ দেখিয়া এই হতভাগ্য দেশে পদার্পণ করিয়াছিলি বলিয়া, সপ্তকোটী হিন্দু দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃতি-সাগরের অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া, অপার আনন্দোচ্ছ্বাসে "মা-মা" রবে আত্মহারা হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল;—তা'ই ভগ্ন-হৃদয় বঙ্গবাসী, এত উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তুই আসিয়াছিলি, আনন্দ উৎসাহে সকলেই মাতিয়াছিল, আর তুই চলিয়া গিয়াছিস্, তোর সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দ উৎসাহ কোথায় মিশিয়া গিয়াছে—এ বঙ্গ আবার যেমন ছিল, তেমনটীতেই পরিণত হইয়াছে। আমরা অজ্ঞান, কিরূপে পূজা করিলে তুই—অচলা হ'স, তাহা আমরা

জানি না। মা! আমাদের সেই জ্ঞান-বর্ত্তি জ্বালিয়া দে মা! যেরূপে আর্য্য ঋষিগণ তোমায় পূজা করিয়াছিলেন, যেরূপে তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়া তোমাকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছিলেন, আমাদের সে ক্ষমতা কোথায় মা? মা ত্রিদিবেশ্বরি! সর্ব্ব জ্ঞান-সম্পদ-সিদ্ধিদাত্রি অশেষ শক্তিশালিনি! বল দেখি মা! তুমিই যদি তোমার দশদিক প্রবাহিনী ভক্তিদ্বারা তাহাদের হৃদয়স্থিত পাপাশুর ধ্বংস না করিতে, তাহা হইলে কি তাহারা তোমার এই মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিত?—এইরূপে তোমরা সেই ভগবৎশক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিতে পারিত?——না, তোমায় অচলা করিয়া ত্রিদিবে ধরিয়া রাখিতে পারিত? মা! করুণাময়ি! আজ তুই গিয়াছিস্, আমরা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি,—মা! আমাদের যাহাতে এরূপ অন্ধকারে নিপতিত না হইতে হয়, যাহাতে আমরা তোকে ধরিয়া রাখিতে পারি, এমন সাধনা আমাদিগকে শিক্ষা দে মা! প্রসন্নময়ি! তুমি নিজে না প্রসন্না হইলে, আমাদের আর উপায় নাই। অজ্ঞান আমরা, সে শিক্ষা আমাদের পক্ষে কদাচ সম্ভবে না।

মা! তুই গিয়াছিস্, সেই বঙ্গবাসী আজ আবার যে আঁধারে আবার সে আঁধারে পতিত। আবার তাহাদের মুখে গাঢ়-দুঃখচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত!—সে আনন্দোল্লাস তাহাদের ছাড়িয়া আজ কোথায় চলিয়া গিয়াছে! এস ভাই বঙ্গবাসি! আজ তোমারও যে দুঃখ, আমারও সেই দুঃখ। এস আজ উভয়ে উভয়ের হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া পরস্পরের হৃদয় শীতল করি। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র।

জল-বিহারী নিকোলাস।

মনুষ্য একাগ্রমনে যে বিষয়ে যত্ন করে, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। প্রকৃতি অনেক কার্য্যে প্রথমে তাহার বাধা জন্মান বটে, কিন্তু যথাযুক্ত সাধনার বলে অবশেষে অবশ্যই তাঁহাকে অনুকুল ও আয়ত্ত হইতে হয়। ভূমণ্ডলে আর কোন প্রাণীর সিদ্ধিলাভের এরূপ ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সিসিলিরাজ্যে ফ্রেডেরিক রাজার সময়ে নিকোলাস নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় জলে অতিবাহিত করিতেন বলিয়া, সকলে তাঁহাকে মৎস্য বলিয়া ডাকিত। সমুদ্র হইতে প্রবাল ও শুক্তি তুলিয়া বিক্রয় করিয়া নিকোলাস জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে জলে বাস করিতে, নিকোলাসের এরূপ পটুতা জন্মিল যে, তিনি কখন কখন চারি পাঁচদিবস অহোরাত্র জলেই যাপন করিতেন। সে সময়ে, অন্যান্য বৃহৎ জলজন্তুর ন্যায়, কাঁচা মৎস্য আহার করিয়াই তিনি ক্ষুন্নিবারণ করিতেন। সমুদ্রের যে সকল স্থান জাহাজের গতিবিধির পক্ষেও ভয়াবহ, নিকোলাস অকুতোভয়ে সন্তরণের দ্বারা সে সকল স্থান পার হইতে পারিতেন। তিনি এক নগর হইতে পত্র লইয়া, সমুদ্রপথে সন্তরণের দ্বারা নগরান্তরে পৌছাইয়া দিতেন। এক সময়ে একখানি জাহাজের নাবিকেরা জাহাজ হইতে জলোপরি একটী বৃহৎ জীবকে দেখিয়া, জলজন্তু অনুমান করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া নিকোলাস গমন করিতেছেন। সেদিবস প্রবলবায়ু বহমান থাকায় সমুদ্র নিতান্ত অশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু জলবিহারী নিকোলাসের তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কার সঞ্চার হয় নাই। নাবিকেরা তাঁহাকে জাহাজে উঠাইয়া লইয়া, গন্তব্যস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইল যে, তিনি ইটালি রাজ্যের কোন এক নগরে লিপিবাহক হইয়া গমন করিতেছেন। তাঁহার নিকট যে সকল পত্র ছিল, নাবিকেরা দেখিল, তৎসমুদয় চর্ম্মাবরণে এরূপ নিবিড়রূপে বিজড়িত যে, তাহাতে কণামাত্র জল প্রবেশ করিতে পারে নাই। নিকোলাস কতিপয় দিবস জাহাজ আরোহণেই চলিলেন, তদনন্তর একদিবস উত্তমরূপে আহারাদি করিয়া নাবিকদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, পুনর্ব্বার সমুদ্রে অবতীর্ণ হওতঃ সন্তরণ অবলম্বনে স্বীয় গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

জলে বাস করিতে নিকোলাসের যে ঈদৃশ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! কিন্তু প্রকৃতি তাঁহার প্রতি সদয়

হইয়া, যে একটী অসম্ভাবনীয় আনুকুল্যের বিধান করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত হইতে হয়। দীর্ঘকাল জলে বাস করিতে করিতে নিকোলাসের করচরণাঙ্গুলির অবকাশমধ্যে চর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া হংস-চরণের ন্যায় অঙ্গুলিগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়াছিল। এইরূপ লিপ্তচর্ম্ম করপদের দ্বারা যে সন্তরণ কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়, তাহা অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসে যাঁহারা মহা মহা ক্লেশ-স্বীকার করেন, প্রকৃতির ঈদৃশ আনুকূল্যের সমাচার তাঁহাদিগের ভরসার কারণ হইতে পারে। শ্বাসপ্রশ্বাস বিষয়েও নিকোলাসের বিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি এক নিশ্বাসে প্রচুর পরিমাণে বায়ু আকর্ষণ করিয়া একঘণ্টা কাল জলমধ্যে অতিবাহিত করিতে পারিতেন।

সিসিলির সমুদ্রে কারিব্‌ডিস (Charybdis) নামে একটী ভয়ানক আবর্ত্ত আছে। তথাকার জল সর্ব্বদাই অস্থিরভাবাপন্ন, এবং জলের মধ্যে পর্ব্বতেরও অধিষ্ঠান আছে। স্থানটী এরূপ ভয়ানক যে, উহা পার হইবার সময়ে নাবিকগণকে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ঐ জলের তলভাগে কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে, সকলেরই মনে আবহমান কাল এই সংস্কার ছিল, কিন্তু কাহার সাধ্য যে, সাক্ষাৎ কালচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান সে জলে নিমগ্ন হইয়া তলভাগের সমাচার আনয়ন করে? নীরনিবাসী নিকোলাসের বিবরণ ক্রমে ক্রমে সিসিলির রাজার কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে রাজসভায় আনিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু স্থলবাসিগণের পক্ষে নিকোলাসের সাক্ষাৎলাভ করা বড় সুলভ বিষয় নহে;—বিস্তর অন্বেষণের পর, রাজদূতেরা তাঁহাকে লইয়া রাজসভায় সমাগত হইল। নিকোলাসকে দেখিয়া রাজার কারিব্‌ডিসের কথা স্মরণ হইল। রাজা তাঁহাকে ঐ জলের তলভাগ দেখিয়া আসিতে আদেশ করায়, নিকোলাস তাহাতে অসম্মত হইলেন। তথাকার জলে যে, নানাপ্রকার প্রাণান্তিক বিপদের সম্ভাবনা আছে, জল-পরীক্ষাপটু নিকোলাস তাহা অবগত ছিলেন, তন্নিমিত্তই তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কিন্তু রাজা-

দিগের কৌতূহল একবার উদ্দীপ্ত হইলে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে;—সহস্র সহস্র জনের প্রাণনষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাচ একজনের নিরর্থক অভিলাষকে অবশ্যই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। রাজা আদেশ করিলেন, ঐ জলে একটী মহামূল্য স্বর্ণপাত্র নিক্ষিপ্ত হউক, নিকোলাস যদ্যপি তাহা উঠাইয়া আনিতে পারেন, তবে পুরস্কারস্বরূপে ঐ পাত্র তাঁহাকে প্রদান করা যাইবে। রাজার আগ্রহ, পুরস্কারের লোভ, বিশেষতঃ সাধারণসমীপে স্বীয় জলনৈপুণ্য প্রদর্শনের লালসা, নিকোলাসকে একবারে বিমোহিত করিয়া তুলিল। তিনি অবশেষে কারিব্‌ডিসে ডুবিতে সম্মত হইলেন। রাজার আদেশানুসারে ঐ উন্মত্ত জলকল্লোলমধ্যে স্বর্ণপাত্র নিক্ষিপ্ত হইল;—অনতিবিলম্বে নিকোলাসও তাহার অনুগামী হইলেন। প্রায় দুইদণ্ড কাল পর্য্যন্ত রাজা, পারিষদ্‌গণ সহ তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন, তথাচ নিকোলাস উঠিলেন না। ইহাতে সকলেরই মনে হইল, নিকোলাসকে আর উঠিতে হইবে না; ইতিমধ্যে রাজার নয়নগোচর হইল, নিকোলাস এক হস্তে স্বর্ণপাত্র ধারণ করিয়া অপর হস্তদ্বারা সন্তরণ করিতে করিতে স্থলাভিমুখে আগমন করিতেছেন। তীরে উঠিবামাত্র সকলেই উচ্চনাদে তাঁহার প্রশংসা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। নিকোলাস অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিয়া, রাজা তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তৎকালে তাঁহাকে বিদায় প্রদান করিলেন। বিশ্রামান্তে সুস্থ হইলে নিকোলাস পুনর্ব্বার রাজসভায় সমানীত হইলেন। রাজা কারিব্‌ডিসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় নিকোলাস কহিলেন, "তথায় যে সকল মহা মহা বিপদ আছে, আমি অগ্রে তাহার অর্দ্ধেক বুঝিতে পারিলেও, এ প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইতাম না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সেইস্থান জলজন্তুগণের পক্ষেও ভয়ানক! প্রথমতঃ, তাহার তলভাগ হইতে সর্ব্বদাই জলরাশি ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বলিত হইতেছে, ঐ জলের বেগসম্বরণ করে কাহার সাধ্য? দ্বিতীয়তঃ, জলমধ্যে যে পর্ব্বত আছে, তাহা দণ্ডাকার সরলভাবে সমুন্নত হইয়া রহিয়াছে, কোনমতে তাহাতেও আশ্রয়লাভের উপায় নাই। তৃতীয়তঃ, সেই

পর্ব্বতের প্রতিরোধে জলের বেগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে এরূপ বলে আঘাত করিতেছে যে, সে আঘাত লাগিলে শরীর চূর্ণ হইয়া যায়। চতুর্থতঃ, জলের মধ্যে অতি বিপুলায়তন প্রবালকানন, তাহার শাখামণ্ডলীর মধ্যগত হইলে নিষ্কৃতিলাভ করা সুকঠিন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তুমি কিরূপে এত সত্বর স্বর্ণপাত্র লইয়া প্রত্যাগমন করিলে?" নিকোলাস কহিলেন,—"ঐ পাত্র, পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে একটী গহ্বরমধ্যে নিপতিত হইয়াছিল,—তলভাগে প্রবেশ করিতে পারে নাই; আমি মজ্জনসময়ে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া গ্রহণান্তে প্রত্যাগমন করিয়াছি।" নিকোলাস তলভাগ পর্য্যন্ত গমন করেন নাই শুনিয়া, রাজার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইল। তলভাগের সমাচার জানিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি নিকোলাসকে আর একবার নিমগ্ন হইতে আদেশ করিলেন। নিকোলাস বারম্বার অনিচ্ছাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, রাজাও বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনুরোধের পোষকতার জন্য রাজা আদেশ করিলেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ আর একটী স্বর্ণপাত্র পুনর্ব্বার জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হউক, তাহাও নিকোলাসকে পুরস্কারস্বরূপে প্রদান করা যাইবে। দরিদ্র নিকোলাস, ধনলোভে পুনর্ব্বার ঐ আবর্ত্তে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর তথা হইতে উত্থান করিতে হইল না! চিরপ্রিয় সমুদ্রগর্ভে তিনি চিরদিনের নিমিত্ত বিশ্রাম করিলেন।

ধন ও যশোলোভে নিকোলাসের ন্যায় কত শত ব্যক্তি যে অসাধ্যসাধনরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। সমুদ্রের তল হইতে স্বর্ণপাত্র আহরণ করিবার লোভে কেবল যে নিকোলাসের জীবনান্ত হইয়াছে এরূপ নহে, অনেকেরই অদৃষ্টে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে।

লতার বিয়ে।

(১)

বনের মাঝারে বনতরু সহ,
বন লতিকার হইবে বিয়ে;
আয়, ফুলবালা আয়লো সকলে,
বরণের ডালা সাজায়ে ল'য়ে।

(২)

সাজা সবে মিলে যতন করিয়ে,
নিকুঞ্জ ভিতরে বাসর ঘর;
আমার সাধের লতিকাসুন্দরী,
জাগিবে বাসরে লইয়া বর।

(৩)

সাধ লো কোকিলা সাধ লো ভ্রমরী,
আপন আপন গলার স্বর;
দেখিব আজিরে, পারিস্ কেমন,
হারা'তে তোদের নূতন বর।

(৪)

গগন শোভিনী তারকা-রাজি লো!
আয় সবে মিলে কাননে আজ;
কানন-বাসিনী লতিকা বালারে,
পরাইয়া দাও রাণীর সাজ।

(৫)

হ'বে রাণী আজি কাননবাসিনী,
কানন নিবাসী তরুরে ল'য়ে;
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়া দু'জনে,
আমোদেতে আজ বিহ্বল হ'য়ে।

(৬)

সকলে মিলিছে এ সুখ উৎসবে,
দেরী কেন কর যামিনী-সতী?
কৌমুদীবসন পরিধান করে,
বরণ কর সে নব দম্পতি।

(৭)

দিগঙ্গনাগণ চারিদিক হ'তে,
কর্‌লো মঙ্গল উলুর ধ্বনি;
দূরে কাদম্বিনী মৃদুল গম্ভীরে,
বাজাও লো শাঁখ তুমিও ধনি!

(৮)

এস হে! এস হে! মলয় সমীর,
লইয়া আইস সুরভী ভার;
লতিকার সনে তরুর বিবাহ,
হেন সুখদিন পাবে না আর!!

(৯)

বিবাহের সভা বসিবে কাননে,
সুনীল গগন-চন্দ্রাতপ নীচে;
তাহার মাঝারে চাঁদের আলোকে,
হ'বে আলোকিত, আঁধার ঘুচে।

(১০)

মানবের শুভ-বিবাহ উৎসবে,
কত গোলমাল কতই ঘটা;
কত বাদ্য-ভাণ্ড কত লোকজন,
কতই শোভার অপূর্ব্ব ছটা।

(১১)
দেখ আজি এই নিবিড় কাননে,
মিলিবে লতিকা তরুর সনে;
এ শুভ-বিবাহ হইবে নির্জ্জনে,
পশিবে না ইহা কাহার কাণে।

(১২)
দু'দিন পরেতে এ নব লতিকা,
প্রেমডোর দিয়া বাঁধিবে নাথে!
জীবনে জীবন মরণে মরণ,
হবে রে তাহার তরুর সাথে।

(১৩)
লতিকার সম পতিপরায়ণা,
সংসার ভিতরে অল্পই আছে;
পতিপ্রেম আজ শেখ্‌লো সকলে,
কানন-বাসিনী—ব্রততী কাছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

দুঃখিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(হরলাল দাদার দ্বিতীয় কথা।)

পূজার সময় সৌদামিনী, শান্তি পোড়ার মুখীর সহিত চারুবাবুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে; আমি যে আশা করিয়াছিলাম, তাহাতে সুতরাং ছাই পড়িয়াছে! ছাই যদিও এখন পড়িয়াছে বটে; কিন্তু সে ছাই যে আমার হৃদ্গত অগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে—একথা কদাচ বিশ্বাস করিবেন না। আমার প্রাণ, যতদিন না আমার দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিবে, ততদিন আমি সেই আশা-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইব।

আজ প্রায় ৮৷১০ দিন সৌদামিনী চলিয়া গিয়াছে; আমি একা আছি। মন সদাসর্ব্বদা বড়ই চঞ্চল, কিছুতেই স্থির হইতে পারি না। একদিন আমাদের ছাদে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার বোধ হইল, পার্শ্বের ছাদে কে যেন চুপি চুপি কি কথা কহিতেছে। মনোযোগপূর্ব্বক শুনিলাম, আমার দিদি অপর ছাদে গমন করতঃ হরিবাবুর সহিত কি কথা কহিতেছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ

দোলায় দুলিতেছিলাম—আজ আমার সে সন্দেহ মিটিল। মন বড় খারাপ হইয়া গেল। ইচ্ছা হইল, এ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু আমি এ স্থান ছাড়িয়া গেলে, সৌদামিনীকে কোথায় পাইব?——সৌদামিনী যে আমাকে দুশ্ছেদ্য মোহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে!

এইরূপে দিন কাটাইতেছি, আমার চক্ষে প্রায়ই দিদির পাপ-চরিত্র চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া ক্রমে অসহ্য করিয়া তুলিতেছে। শেষে ঠিক করিলাম, চারুবাবুর বাড়ী যাই। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার নিকট থাকিব; সেখানে আমার সৌদামিনীকেও দেখিতে পাইব, আর এ সংসার হইতেও দূরে থাকা হইবে।

পরদিন প্রত্যূষে চারুবাবুর বাড়ীতে গেলাম। যথাসময়ে চারু-বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলে, চারুবাবু আমাকে দেখিয়া স্বীয় মনোগত বিরক্তিভাব গোপন করতঃ আমাকে আমাদের কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহার যথাযথ উত্তর দিলাম, তৎপরে চারুবাবুকে বলিলাম, আমি এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি, দু'দিন আপনাদের এখানে থাকিয়া যাইব। চারুবাবু, বুঝিলাম, অনিচ্ছা-স্বত্বেও সম্মতি দিলেন।

এখন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। একই বাড়ীতে আছি, কিন্তু বাড়ীর ভিতর যাওয়া আমার নিষেধ হইয়াছে,—আমি যা'র জন্য এতদূর আসিয়াছি, তাহাকে আমি একটীবারও দেখিতে পাই না। যাহা হউক, এরূপ অবস্থায় সেখানে থাকা ভাল বিবেচনা করিলাম না। কথামত দু'দিন পাঁচদিন থাকিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। আবার যে দুঃখ যন্ত্রণা সেই দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে রহিলাম।

৪৷৫ মাস কাটিয়া গেল, একদিন পত্র আসিল, সৌদামিনীর বড় অসুখ করিয়াছে; চারুবাবুদের দেশে ভাল চিকিৎসক না থাকায়, আমাদের এখানে আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে—শুনিয়া আমি সন্তুষ্টও হইলাম, দুঃখিত হইলাম,—সন্তুষ্টির কারণ সৌদামিনীর আগমন দুঃখের কারণ—তাহার ব্যায়ারাম।

সৌদামিনী রুগ্ন-শয্যায় শায়িতা। তাহার শরীর অসুস্থ হইলেও, তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও পলায় নাই। আমি একদিন তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছি, বসিয়া বসিয়া তাহার রূপ-সমুদ্রে অবগাহন করিতেছি, এমন সময় বোধ হইল, পার্শ্বের গৃহে কে যেন ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। পূর্ব্বের ঘটনা অবধি আমি সদাসর্ব্বদা সতর্ক থাকিতাম, সুতরাং সেই কথাগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহা অতি ভয়ানক আমার প্রাণের প্রাণ হৃদয়সর্ব্বস্ব সৌদামিনীর জীবন নাশের পরামর্শ! আমি বড়ই বিচলিত হইলাম। আপাততঃ কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঔষধের সহিত সৌদামিনীকে বিষ প্রদত্ত হইবে! ওঃ কি ভয়ানক পরামর্শ! আমি যদি সৌদামিনীকে ঔষধ খাইতে নিষেধ করি, তবে আমার কথা কে শুনিবে? আমি একথা শান্তিকে বলিব বলিয়া মনস্থ করিলাম। আবার ভাবিলাম, শান্তিকে বলিলে শান্তি ইহার কি করিবে? চারুবাবুকে সংবাদ না দিলে কোনও ফল হইবে না। শেষে স্থির করিলাম, দিদির চরিত্র ও গুণের কথা, উভয়কেই জানাইয়া দিব। কিন্তু অদ্য উপায় কি? শুনিলাম, অদ্য হইতেই ঔষধের ব্যবস্থা হইবে! একেই আমাকে সকলে সন্দেহ করে, তাহাতে আমি কখনও সৌদামিনীর নিকট বসিয়া থাকিতে পারিব না। সৌদামিনী—আমার প্রাণের সৌদামিনী বোধ হয়, এবার আর রক্ষা পায় না। হৃদয়ের অদম্য উচ্ছ্বাসে আমি শান্তির নিকট গমন করতঃ, যথাযথ সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলাম। যে শান্তি আমায় কদাচ বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ, কিন্তু আজ আমার কথা শুনিয়া বিশ্বাসের বিশিষ্টচিহ্ন দেখাইয়া কহিল,—"দাদা! এখন উপায় কি? তুমি একটা বাড়ী ঠিক করিয়া আইস, আমরা অদ্যই পশ্চিমে যাইব বলিয়া চলিয়া যাইব।" এই সঙ্গে একবার 'তাঁ'কে' খবর দেও, তিনিও আসিয়া পড়ুন।" আমি তাহার কথামত কার্য্য করিতে আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম, আনন্দ—সৌদামিনীর জীবন রক্ষা হইবে, ও ভবিষ্যতে তাহাকে পাইবার আশায়।

আমি বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর, পটলডাঙ্গায় একটী বাড়ী স্থির করিয়া, চারুবাবুকে খবর দিতে চলিলাম। পরমেশ্বরের কৃপায় পথেই চারুবাবুর সহিত দেখা হইল। তাহাকে সমুদয় বলায় তিনিও কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া, তাড়াতাড়ি আমার সহিত আমাদের বাটীতে চলিলেন। আমার মনে এখন আহ্লাদ ধরে না।

[ক্রমশঃ]

অবস্থা ও মানুষ।

মানুষ অবস্থার দাস। মানুষ শুধু অবস্থার দাস বলিলে, যথেষ্ট বলা হইল না। কতকগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা বা ঘটনা বৈচিত্র্যের সমষ্টি—মনুষ্য-জীবন। এক কথায় অবস্থা মানুষের জীবন-গতি নিয়ামক। অবস্থার উপর মানুষের কোনই কর্তৃত্ব বা বল নাই; ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মানুষকে অবস্থার নিকটে নত-শির হইতে হয়। মনুষ্য যতই শক্তি-সম্পন্ন হউক; সহস্র চেষ্টা করিয়াও, অবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারে না। অবস্থা বিশেষে মানুষ—পশু ও দেবতা। যেমন অবস্থা, মানুষকে সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে উত্তোলিত করিতে পারে, তেমনি অধঃপাতে লইয়া যাইতেও পারে; উন্নতিচিকীর্ষা সকলের হৃদয়েই বলবতী; কিন্তু ইহাসত্ত্বেও মনুষ্যকে অবস্থার অনুগত হইয়া চলিতে হয়। সে স্রোত অধোগতিরদিকে প্রবহমান হইলেও, তাহাতে অঙ্গ ঢালিয়া দেওয়া ব্যতিরেকে, ঠিক থাকিবার কোন সম্ভাবিত উপায় নাই। সংবেষ্টিত অবস্থার ক্ষমতা, মানবজীবনের উপর অপরিসীম, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রুপার্টগডুইন, কাপ্তেন ওয়েষ্টফোর্ডকে হত্যা করিয়া, স্বীয় অবস্থার আমূল সংস্কারে সচেষ্ট হইয়াও, সফল কাম হইতে পারিল না। অবস্থা তাহাকে উত্তরোত্তর মানব-জীবনের অতি নগণ্য নিম্নস্তরের দিকে পরিচালিত করিতে থাকিল। ক্লডিয়াস্ একবার নরহত্যা করিয়াও, যখন নিষ্কণ্টক ও সুখী হইতে পারিল

না, তখন আবার ঘৃণিত উপায়ে হ্যাম্‌লেটকে স্বীয় পথ হইতে অপসরণ করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিল; কারণ হ্যাম্‌লেট তাহার সুখবর্ত্মের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু উভয়ের চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অবস্থার উপর কর্তৃত্ব না থাকায় এই পরিণাম। রূপার্টগডুইন এবং ক্লডিয়াস্ যেরূপ অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের ঐরূপ না করাই অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। পথের ধূলি-কণা-সদৃশ উপেক্ষিত দরিদ্রব্যক্তি, আর জগৎ-পূজিত মহামান্য সম্রাট্, উভয়েই অবস্থার ক্রীড়নক। কে বলিতে পারে, আজিকার সম্রাট্, কাল পথের ভিখারী হইবে না? অবস্থা বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা, অসীম জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যেরও ক্ষমতার অতীত। যাহারা মনুষ্যকে দূরদর্শী, ভবিষ্যতের গুরু প্রভৃতি আখ্যায় প্রখ্যাত করেন, তাহারা নিশ্চিতই ভ্রান্ত। সংবেষ্টিত অবস্থা মনুষ্যের দৃষ্টিকে গণ্ডীর ভিতরে এমনিভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখে যে, তাহার ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান থাকিলেও, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যের ভবিষ্যৎ-চিন্তা থাকিলে, অহরহ অসংখ্য বিপ্লব-বহ্নি, উৎগীরিত হইয়া, জগৎ সংসারের এতাধিক অমঙ্গল বা অপকার সংসাধন করিত না। ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ-লুই রাজ-কোষশূন্য দেখিয়া, করের উপর কর স্থাপনকরতঃ প্রকৃতিবর্গকে উত্যক্ত করা রাজোচিত ধর্ম্ম নয়, ইহা একবারেই যে বুঝিতেন না, একথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না; কিন্তু বুঝিলে কি হয়, তখনকার অবস্থা তাঁহাকে প্রজাবর্গের গগনভেদী কাতর আর্ত্তনাদে বধির করিয়া রাখিয়াছিল। তা'ই ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত। ফ্রান্সের সে সময়কার চারিদিকের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহাতে রাষ্ট্রবিপ্লব-রূপ একটা ভয়ানক সংঘর্ষণ বা অবস্থা বিপর্য্যের সংঘটন কিছু অসম্ভব বোধ হয় না, বরং হওয়াই অবশ্যম্ভব। এই ভয়াবহ রাষ্ট্রবিপ্লব, কতকগুলিন ছোট খাট অবস্থারই এক মহান্ ফল বা পরিণাম। ইহারই ফলে ভল্‌টেয়ার, রুসো, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং অন্যান্য প্রধান ও অপ্রধান ব্যক্তি। অবস্থা চির-ফল প্রসবিতা।

সকল অবস্থাতেই নূন্যাধিক পরিমাণে ফল-লাভ হয়; তবে অবস্থার তারতম্যানুসারে সে ফল কখন ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। মনুষ্য-জীবনের অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিভ্রমণ অপরিহার্য্য। কিন্তু তা'ই বলিয়া কোন্ অবস্থান্তে কোন্ অবস্থার উৎপত্তি বা সংঘটন, এ জ্ঞান কাহার নাই; যে একটুখানি আছে, তাহাও কল্পনা-প্রসূত। জগতের লয়োৎপত্তি সমুদয়ই অবস্থা পরম্পরার কার্য্য। নেপোলিয়ন কি কেশুথ্‌কে দুরাকাঙ্ক্ষা বা রক্ত-পিপাসু হিংস্রজন্তু বলা কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নেপোলিয়ন এবং কেশুথ দু'টি বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ফল। তাহারা যে অবস্থায় যেরূপকার্য্য করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় তুমি আমি কিরূপ করিতাম, কে বলিতে পারে?

সমালোচক অপেক্ষা সমালোচিত ব্যক্তির গৌরব অনেক অধিক। মানুষের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আশারও বৃদ্ধি। ইহা স্বাভাবিক। অবস্থা যেভাবে পরিচালনা করে, মনুষ্য সেইভাবেই চালিত হয়; এজন্য অমুক ভাল, অমুক মন্দ, এ কথার কোনই অর্থ নাই। অনুকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া, যে নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। এরূপ নিস্পৃহ বা নির্লিপ্ত লোকের সংখ্যা এই কার্য্যময় জগতে এত স্বল্প যে, তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দেহ হয়।

বিদ্যাসাগর, জনসন্, গোল্ডস্মিথ, হানিম্যান, ওয়াসিংটন, ওয়েলিংটন, ম্যাট্‌সিনি, রায়েঞ্জী, থিওডোর-পার্কার ও লুথার প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে, কতকগুলিন পৃথক্ পৃথক্ অবস্থার ফল। এ সকল হইল বড়লোকের কথা। তুমি আমি, রামু, শ্যামু, প্রত্যেকেই এইরূপ অবস্থার একটা ফল। অবস্থা বিশেষে তুমি, আমি যে বড় হইতে পারিব না, এমন কোন কথা নাই। উন্নতি ও পতনে, কেবল সময় ও অপেক্ষা চাই।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেষ কথা।

এ কঠোর মহীতে,
আমি এসেছি শুধু সহিতে,
আর মরমের ব্যথা, লুকায়ে মরমে,
প্রেমের আগুণে দহিতে।
যাও যাও সখি, যাও যাও চলি,
এসোনাক কাছে 'আহা উহু' বলি;
বাজেনি ত প্রাণে ভাঙ্গিতে হৃদয়,
আছে ত মরমে সুখ সমুদয়?
সেই হরিণ-নয়নে মধুর হিল্লোল,
কঠিন হর্ষের কোমল কল্লোল!
তা'ই যেন থাকে, সুখ নিয়ে থাক,
হেসে ভাঙ্গা প্রাণ আর ভেঙনাক,
আমি কাঁদিয়া জীবন করিব সারা,
আর স্নেহ শূন্যরূপে হ'ব না হারা;
তুমি বুঝিলে না কেন সই,
আমি ত রূপের ভিখারী নই!
আমি প্রাণ চাই, আমি প্রেম চাই,
সে নিধি তোমাতে নাই,
দু'দিনের রূপ নিয়ে সুখে থাক,
হেসে ভাঙ্গা প্রাণ আর ভেঙনাক।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

বাঁশরী (গান)।

কেন বাজে বাঁশরী?
বাঁশী শুনে, প্রাণ না মানে,
বল কি করি।
বাঁশরী তোর পাশে ধরি,
দিও না আর দাগাদারি,
আমি যে কুলনারী,
তোর জ্বালা কি সইতে পারি?
কেন বাজে বাঁশরী?
তুই যখন ঐ কদমতলে,
বাজিস্ রাধা রাধা বলে,
আমারও মন অমনি টলে,
কেমনে পরাণ ধরি।
কেন বাজে বাঁশরী?
বাঁশরী—তোর লাজ নাই,
রাধা রাধা বলিস্ তাই,
রাধারে তুই পাবি নাই,
সে যে রে কুলনারী।
কেন বাজে বাঁশরী?

শ্রীভূতনাথ মিত্র।

অস্তগামী তারা।

[১]
কোথাযাও, কোথাযাও, তারকানিচয়!
থাম একবার;
গগনের কোলে মরি,
সারানিশি খেলা করি',
ঢলিয়া পড়িছ যেন ঘুমে আঁখিভার!

[২]
কেজানে কি প্রেম-শিক্ষা প্রদান ধরায়,
ওহে তারাহার!
প্রকৃতি শিয়রে বসি',
নিরখি' সৌন্দর্য্য রাশি,
প্রচার' কি পূত প্রেম পরমপিতার?

[৩]
প্রাণভরা হাসিটুকু ফুটিবে আবার,
ঊষার অধরে;
সরল হাসিটী তা'র,
পার না সহিতে আর,
তাই কি মিশিতে চাও, সুনীলঅম্বরে?

[৪]
অথবা প্রণয়ে কা'র হইয়ে নিরাশ
মরমে ম'রেছ।
সে কারণে ম্লানবেশে,
ডুবে ডুবে, ভেসে ভেসে,
আকাশের প্রান্তে তাই সরিয়া যেতেছ।

[৫]
কেন বা নির্ব্বাণপ্রায় হইতেছ তারা,
পশ্চিম গগনে?
পাণ্ডুবর্ণ কেন হেন,
বিষাদে বিবর্ণ যেন,
মিশে যাও শূন্যপ্রাণে অনন্তের সনে!

[৬]
আবার উঠিবে তারা রূপরাশি লয়ে,
পূরব আকাশে;
আবার নবীনরঙ্গে,
মাতিবে প্রেমিক সঙ্গে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া আসি আপন আবাসে!

[৭]
নিতি নিতি এইরূপে দেখা দিবে আসি
রজনী সময়ে!
যুঁতি ফুল সম ফুটি',
এদিক ওদিক ছুটি;
ভ্রমিবে আকাশপটে প্রফুল্লিত হ'য়ে।

কিন্তু— [৮]
অভাগার ভাগ্যে পুনঃ আসিবেনা লয়ে
সুখের পাশরা;
আর না আঁধার প্রাণে,
উজল আলোক-দানে,
জাগাইবে পূর্ব্ব সুখ আশা বুকভরা!

শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

ভারত বান্ধব——মাসিকপত্র, আশ্বিন, ২য় সংখ্যা। কানাই-লাল দে এণ্ড কোং কর্ত্তৃক নিমতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

এক বৎসর পরে "ভারত-বান্ধব" আবার একখানি ডিমাই সংবাদ-পত্রের আকারে দেখা দিয়াছে। এবার ইহাতে ইহার যে লেখকগণের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়-গণের নাম দৃষ্ট হইল। কিন্তু বর্ত্তমান সংখ্যায় তালিকাভুক্ত লেখক-গণের একজনেরও লেখা দেখিতে পাইলাম না। না পাইলেও, লেখা মন্দ হয় নাই। অনেকগুলি আমোদজনক প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নবসহযোগীর কলেবর, তালিকার লেখকগণের লেখায় পরিপূরিত দেখিলে, সন্তুষ্ট হইব।

ঠগী-কাহিনী——১ম ও ২য় খণ্ড। কর্ণেল মেডোস টেলার প্রণীত, "Confessions of a Thug" নামক গ্রন্থাবলম্বনে স্বনাম প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত, ও সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকাগার হইতে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে কালীপূজক ঠগী সম্প্রদায়ের উপদ্রবের কথা কে না অবগত আছেন? সেই দলের আমির আলি নামক একজন ঠগী, যে ৭১৯টী নরহত্যা ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, সেই ভয়ানক দস্যুর আত্ম-কাহিনীই "ঠগী-কাহিনী"। সুতরাং পুস্তকখানির নাম শুনিলেই, আগাগোড়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। আবার পড়িতে আরম্ভ করিলে,—প্রিয়নাথ বাবুর লেখার এমনি গুণ যে, শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। আমরা ঠগী-জীবনী পাঠ করিয়া, লেখকের লিপি-কুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

পঞ্চস্তোত্র——মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বিরচিত পাঁচটী স্তোত্র,—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

পুস্তক খানিতে, শঙ্করাচার্য্যের জীবনী, ও নিরঞ্জনাষ্টক, অন্নপূর্ণা, হরি, শিবাপরাধ ক্ষমা-প্রার্থনা যমুনাষ্টক—এই পঞ্চ-স্তোত্রের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্গানুবাদে আমরা লেখককে সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না।

দারোগার দপ্তর বেশ চলিতেছে। আসর বেশ জমকাল আছে। মাঝে দু'এক আসর একটু নরম গিয়াছিল, কিন্তু এখন আবার গরম।

অভিনয় সমালোচনা।

চন্দ্রশেখর——আমরা গত ২৭শে অক্টোবর "ষ্টার রঙ্গমঞ্চে" উক্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। স্বর্গগত রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "চন্দ্রশেখর" খানিকে, রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ সুযোগ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় নাটকাকারে পরিণত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চন্দ্র-শেখরের গল্পাংশ, বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞ বোধ হয়, কোনও মহাশয়েরই অবিদিত নাই। অভিনয় দেখিয়া যত আমোদ উপভোগ করা যায়, পুস্তকপাঠে ততটা আমোদ ভোগ কদাচ ঘটিয়া উঠে না। কোন পুস্তককে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে গেলে, প্রথমতঃ সেই পুস্তকা-স্থিত চরিত্রগুলির বিকাশ বজায় রাখাই নাটককারের প্রধান কর্ত্তব্য। অনেকেই কিন্তু এই কর্ত্তব্যটী ভুলিয়া গিয়া, বইখানিকে একেবারে মাটী করিয়া ফেলেন। অমৃতবাবু কিন্তু এবিষয়ে যথেষ্ট গুণপনা দেখাইয়াছেন। সুতরাং এস্থলে আমরা পুস্তক পাঠাপেক্ষা অভিনয় দর্শনে অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছি! অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের যোগ্যতায়, দৃশ্যপটের সুন্দরতায়, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যে, দর্শকমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অভি-নেতাদিগের মধ্যে, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, লরেন্স ফষ্টর, নবাব কাশেম আলিখাঁ, প্রভৃতির অভিনয় বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। গন্ধগোকুল বিশ্বাস অমৃতবাবুর নূতন সৃষ্টি; তাহার অভিনয়ও নূতন ধরণের। সাবেক

[illegible] গ্রন্থে বুঙ্কা বাবুর [illegible] ছবি। নায়কের [illegible] দৃষ্টান্ত। মোসাহেবীর একশেষ। অভিনয়ক্ষেত্রে রামচরণ অতি সুন্দর হইয়াছিল; রামচরণের বিদ্রূপাত্মক বাক্যগুলি অতি সুন্দর। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তির অভিনয়ও নিন্দনীয় নহে। অভিনেত্রীগণের মধ্যে শৈবলিনী, দলনী, সুন্দরীর অভিনয় প্রশংসাযোগ্য। শৈবলিনীর পাগ্‌লামীতে বেশ স্বাভাবিকত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দলনীর অভিনয়ে সকলেই সন্তুষ্ট। তাহার সঙ্গীতের মধুরতায়, ভাবের নম্রতায়, তেজের গর্ব্বতায়, মনের দৃঢ়তায়, স্বামীসেবার সদিচ্ছায়—সাধারণের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় নিহিত। সুন্দরীর অভিনয় বেশ। কিন্তু স্বামী শ্রীনাথের সম্মুখে তাহার গানটী কদাচ আমাদের অনুমোদনীয় হইতে পারে না, এবং গায়িকার দোষে গানটী ভালও লাগিল না। দৃশ্যপটের মধ্যে "ভীমা-পুষ্করিণী" "বজরার কামরা"—"গুরগান্‌খাঁর কক্ষ"—"গঙ্গাবক্ষ"—"রণস্থল" প্রভৃতি কয়েকখানি বিশেষ নয়ন-মন-রঞ্জক হইয়াছে। কুল্‌সমের শেষের অভিনয় মন্দ নহে। ফষ্টরের শেষ অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও স্বাভাবিক। চন্দ্রশেখরের ত কথাই নাই। তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় কৃত্রিমতাশূন্য ও সুন্দর। প্রতাপের অভিনয়—চলন, বলন, ধারণ-ধরণ সমুদয় মনোহর। শেষ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার কথাগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী। অভিনয়দর্শনে আমরা বলিতে পারি,—যে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষগণ, "চন্দ্রশেখর"কে প্রথম শ্রেণীর অভিনয়ে পরিণত করিবার জন্য যত্ন ও অর্থব্যয় করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। অভিনয়ে তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে—যত্ন ও অর্থ-ব্যয় সার্থক হইয়াছে। আমরা সাধারণকে একবার "চন্দ্রশেখর" দেখিতে অনুরোধ করি।

Prof. Jensen's Magic.—আমরা গত ১০ই নভেম্বর শনিবার এমারেল্ড থিয়েটারে প্রফেসার জেন্‌সেনের ঐন্দ্রজালিক অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রফেসারের হস্তকৌশল ও অভিনয়ে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, "Black Art"এর অভিন[illegible] না হইয়া থাকিতে পারি নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রফে[illegible] প্রার্থনা [illegible]।